এগ্রোবেসড ফুড-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

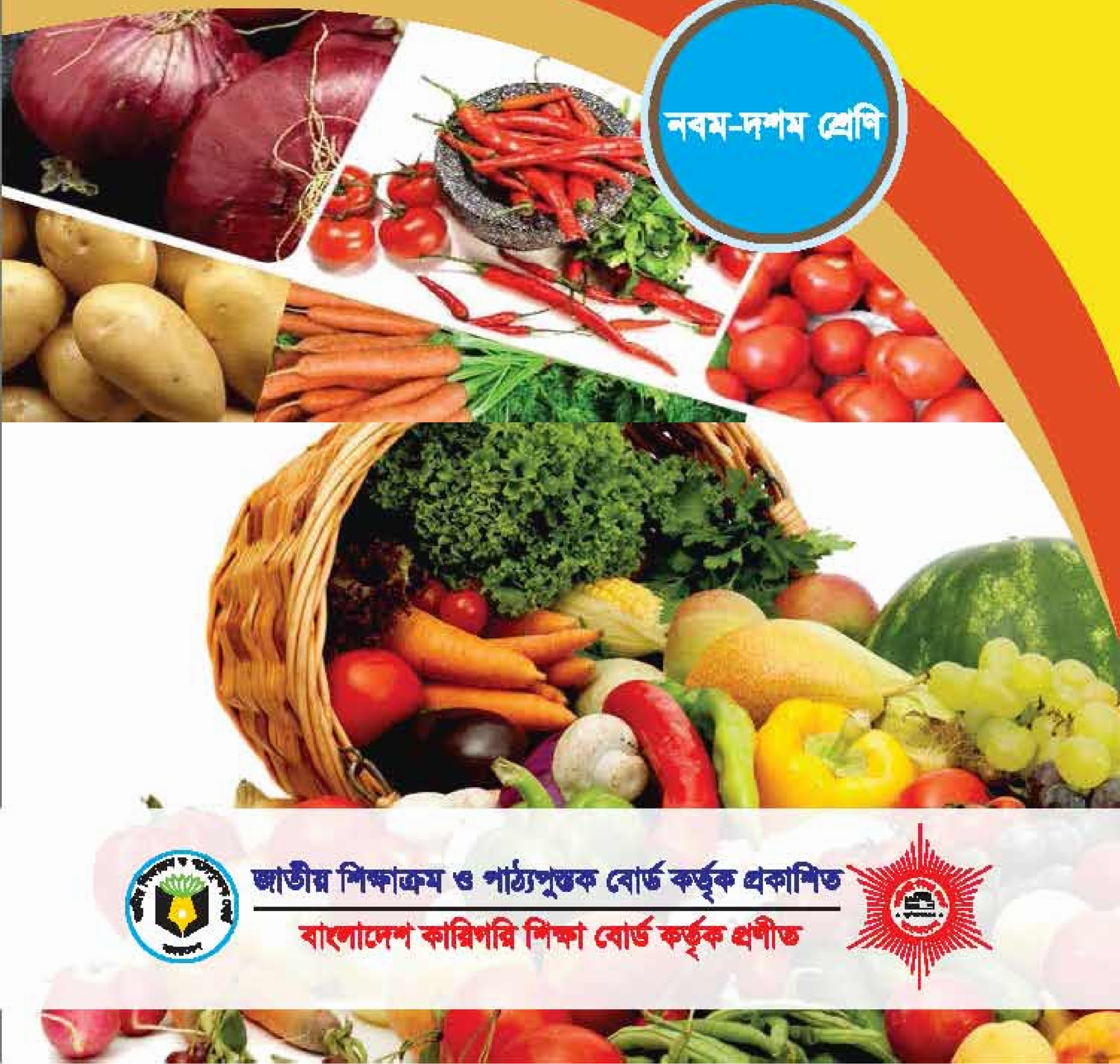

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম বক্তব্য রাখেন 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম ভাষণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন - 'বাংলাদেশের মতো যেই সব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেবল তাহাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে, মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি ।'

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

এগ্রোবেসড ফুড-১
Agrobased Food-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

রচনায়

কৃষিবিদ মোঃ মোসারফ হোসেন
এম.এসসি,এজি (উদ্যানতত্ত্ব), এম.এড. বিসিএস (কৃষি)
পরিচালক (অব.) খামার বাড়ী, ঢাকা

সম্পাদনায়

কৃষিবিদ এম.এ.বি. ছিদ্দিক
বি.এসসি. এজি (অনার্স), এম.এস. বি.সি.এস. কৃষি
প্রাক্তন অধ্যক্ষ এ.টি. আই. ফরিদপুর ও বেগমগঞ্জ নোয়াখালী।
অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

পরিমার্জনায়

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম
ফুডটেক্নোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

১ম পত্র		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	কৃষি ফসল, খাদ্য ও পুষ্টি	১–৩০
অধ্যায় ২	ধানের পুষ্টি, জাত, ব্যবহার, সংরক্ষণ, সিদ্ধকরণ ও মিলিং	৩১–৫০
অধ্যায় ৩	ধান থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য	৫১–৬৬
অধ্যায় ৪	ডাল ফসলের জাত, পুষ্টি, সংরক্ষণ ও মিলিং	৬৭–৭৯
অধ্যায় ৫	ডাল থেকে উৎপাদিত খাদ্য	৮০–৯২
অধ্যায় ৬	তেল বীজের জাত, পুষ্টি, সংরক্ষণ ও মিলিং	৯৩–১০৮
অধ্যায় ৭	তেলবীজ থেকে উৎপাদিত খাদ্য	১০৯–১১৩
অধ্যায় ৮	সয়াবিনের পুষ্টি ও বিভিন্ন সয়া খাদ্য	১১৪–১২৬
অধ্যায় ৯	আলুর জাত, পুষ্টি, সংরক্ষন ও পোকামাকড় দমন	১২৭–১৩৫
অধ্যায় ১০	আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য	১৩৬–১৪২
অধ্যায় ১১	মিষ্টি আলুর জাত, পুষ্টি ও বিভিন্ন খাদ্য	১৪৩–১৫১
	ব্যবহারিক (১ম পত্র)	১৫২–১৭৬

২য় পত্র		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	গমের জাত, মৌসুম, পুষ্টি, সংরক্ষণ ও মিলিং	১৭৭–১৮৬
অধ্যায় ২	গম থেকে খাদ্য উৎপাদন	১৮৭–২০২
অধ্যায় ৩	ভুট্টার জাত, মৌসুম, পুষ্টিমান, সংরক্ষণ, পোকামাকড় ও মিলিং	২০৩–২১৫
অধ্যায় ৪	ভুট্টা থেকে বিভিন্ন খাদ্য	২১৬–২২৩
অধ্যায় ৫	আখের পুষ্টি, রস নিষ্কাশন, গুড় ও চিনি উৎপাদন	২২৪–২৩২
অধ্যায় ৬	মশলার পরিচিতি, পুষ্টি, সংরক্ষণ, মিলিং ও ব্যবহার	২৩৩–২৫০
অধ্যায় ৭	মাশরুমের পরিচিতি, জাত, পুষ্টি, ভেষজমূল্য ও সংরক্ষণ	২৫১–২৬৩
অধ্যায় ৮	মাশরুম থেকে উৎপাদিত খাদ্য	২৬৪–২৬৯
অধ্যায় ৯	তালের পুষ্টি ও তাল থেকে খাদ্য উৎপাদন	২৭০–২৭৬
অধ্যায় ১০	নারিকেলের পুষ্টিমান ও খাদ্যদ্রব্য	২৭৭–২৮৪
অধ্যায় ১১	নারিকেল সহযোগে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য	২৮৫–২৯১
	ব্যবহারিক (২য় পত্র)	২৯২–৩১২

(১ম পত্র)

প্রথম অধ্যায়

কৃষি ফসল, খাদ্য ও পুষ্টি

ভূমিকাঃ খাদ্য জীবের জন্য অপরিহার্য। শরীরের ক্ষয়পূরণ, স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং কর্মশক্তির জন্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। খাদ্যের প্রধান উৎস হলো কৃষি। প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র পানি ও লবণই বাহির থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। অপরাপর সকল খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় কৃষির ওপর। কৃষি বলতে আমরা কৃষির ৪টি উপখাত বুঝে থাকি। এ খাতগুলো হলো–

(ক) ফসল উপখাত
(খ) প্রাণী সম্পদ উপখাত
(গ) বনজ সম্পদ উপখাত
(ঘ) মৎস্য সম্পদ উপখাত।

উপরোক্ত ৪টি উপখাত থেকে আমরা খাদ্যের সব উপাদানগুলো পেয়ে থাকি। ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার, বাজরা, চীনা, কাউন ইত্যাদি প্রধানত শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। অল্প পরিমাণ, আমিষ, খনিজ লবন এবং ভিটামিনও এসব খাদ্যে পাওয়া যায়। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধে আছে আমিষ ও তেল জাতীয় খাদ্য। টাটকা শাক-সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, সহজলভ্য আমিষ এবং খনিজ লবণ। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল সরবরাহ করে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও বিবিধ খাদ্য উপাদান। সরিষা, তিল, রাই, সয়াবিন, সূর্যমূখী, চীনাবাদাম, রেড়ি প্রভৃতি গাছের বীজ থেকে স্নেহজাতীয় উপাদান পাওয়া যায়। ডালডা, বনস্পতি, মার্জারিন প্রভৃতি কৃত্রিম ঘি ও মাখনের উৎসও উদ্ভিজ্জ তেল। আখ, বীট, তাল, খেজুর থেকে শর্করা পাওয়া যায়। চা গাছের পাতা এবং কোকো ও কফির বীজ থেকে তৈরি করা হয় উত্তম পানীয়। কচি নারিকেলের পানি একটি সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট পানীয়। খাদ্যদ্রব্যকে মুখরোচক ও সুস্বাদু করার জন্য ব্যবহার হয় পেঁয়াজ রসুন, হলুদ, মরিচ, আদা, ধনিয়া, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজ বা গাছের অংশ। মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি সরবরাহ করে শরীরের জন্য অপরিহার্য প্রোটিন বা আমিষ। বনজ সম্পদ থেকে আমরা পাই ফলমূল, জ্বালানি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি।

কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ

সাধারণত সমগ্র কৃষি ফসলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. উৎপাদন ক্ষেত্র ও পদ্ধতি ভেদে ফসলের শ্রেণিবিভাগ
২. মৌসুমভেদে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ
৩. ব্যবহারভেদে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ

১.১ উৎপাদন ক্ষেত্র ও পদ্ধতিভেদে ফসলের শ্রেণিবিভাগ

উৎপাদন ক্ষেত্রভেদে : উৎপাদন ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য ও পরিচর্যার উপর নির্ভর করে কৃষি ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) মাঠফসল বা কৃষিতাত্ত্বিক ফসল।
(খ) বাগান ফসল বা উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল।

(ক) মাঠ ফসল : যে সমস্ত ফসল বা শস্যকে একসাথে বড় এবং বিস্তীর্ণ মাঠে চাষাবাদ করা হয় এবং প্রতিটি গাছকে এককভাবে যত্ন নেওয়া হয় না, তাকে মাঠ ফসল বলে। যেমন– ধান, গম, ডাল, ভুট্টা, আখ, আলু ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে ফসলের যত্ন নেওয়া হয়। জমিতে প্রতিটি গাছের জন্য আলাদাভাবে ও নিখুঁতভাবে যত্ন নেওয়া হয় না।

(খ) বাগান বা উদ্যান ফসল : সাধারণত যে সমস্ত ফসলের প্রতিটি গাছকে রোপণ বা বপনের সময় থেকে কর্তন বা ফসল সংগ্রহ করা পর্যন্ত পৃথকভাবে যত্ন নেওয়া হয় তাকে উদ্যান ফসল বলে। যেমন– আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, পেঁপে, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি। উদ্যান ফসলের প্রতিটি চারা গাছের বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয় এবং খুব সতর্কতার সাথে জমি প্রস্তুত করা হয়।

চিত্র : মাঠফসল ও উদ্যানফসল

উৎপাদন পদ্ধতিভেদে : উৎপাদন পদ্ধতিভেদে কৃষি ফসলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– (ক) বৃষ্টি নির্ভর ফসল ও (খ) আর্দ্র বা সেচ প্রাপ্ত ফসল।

(ক) বৃষ্টিনির্ভর বা শুষ্ক ফসল : যে সকল ফসলে সেচের জন্য প্রাকৃতিকভাবে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে চাষ করা হয় সে ফসলকে বৃষ্টিনির্ভর বা শুষ্ক ফসল বলে। যেমন– আউশ ও আমন ধান, গম, ডালশস্য, সরিষা, তিল, পাট, ভুট্টা, চিনা, কাউন ইত্যাদি। বার্ষিক বৃষ্টিপাত যেখানে ৫০০ মিলিমিটার সেসব এলাকায় এ ফসল ভালো জন্মে।

(খ) আর্দ্র বা সেচ প্রাপ্ত ফসল : যে সকল ফসল বা শস্য সেচ ছাড়া চাষাবাদ করা যায় না সেগুলোকে সেচ প্রাপ্ত ফসল বলে। এ সকল ফসল আবাদে কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। যেমন– উচ্চ ফলনশীল ধান, বোরো ধান, আলু, শীতকালীন সবজি যেমন– টমেটো, ঢেঁড়স, মরিচ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগোম ইত্যাদি। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭৬০ মিলিমিটারের বেশি এবং যেখানে পানি আটকিয়ে সেচ দেওয়া যায়, সেখানে এ ফসল ভালো হয়। এ ধরনের কৃষিকাজ ব্যয়বহুল। এ জন্য গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ বসিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে সেচকাজ করা হয়। তাছাড়া খাল, বিল, নদী নালার পানি সেচের মাধ্যমেও ফসল উৎপাদন করা হয়।

১.২ মৌসুমভিত্তিক কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ

কৃষি ফসলসমূহকে চাষাবাদের কাল বা মৌসুমভিত্তিক (Season) দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– রবি ফসল ও খরিপ ফসল

রবি ফসল : যে সকল ফসল বছরের অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে চাষ করা হয় সেগুলোকে রবি ফসল (Rabi Crops) বলে। যেমন– গম, যব, আলু, ডাল ফসল, তেল ফসল, শীতকালীন সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি।

খরিপ ফসল : যে সকল ফসল বছরের এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে চাষাবাদ করা হয় তাদেরকে খরিপ ফসল (Kharif Crops) বলে। যেমন– ধান, ভুট্টা, পাট, জোয়ার ও বাজরা, তিল, তিসি গ্রীষ্মকালীন সবজি ইত্যাদি। খরিপ মৌসুমকে আবার দু ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–খরিফ–১ ও খরিফ–২ মৌসুম।

খরিফ–১ মৌসুম : যে মৌসুমের সময় সীমা এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বিস্তৃত থেকে তাকে খরিপ–১ মৌসুম বা গ্রীষ্মকালীন মৌসুম বলে। এ মৌসুমে উৎপন্ন ফসলগুলোকে খরিফ –১ শস্য বলে। যেমন– আউশ ধান, পাট, কাউন, ভুট্টা, তিল, মিষ্টি কুমড়া, কচু ও ঝিঙ্গা ইত্যাদি।

খরিফ–২ মৌসুম : যে মৌসুমের সময়সীমা জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে খরিফ–২ মৌসুম বা বর্ষা মৌসুম বলে। যেমন– আমন ধান, ভুট্টা, মাষকলাই, বর্ষাকালীন সবজি ইত্যাদি।

এছাড়া কিছু ফসল ও শাক-সবজি আছে যেগুলো উভয় মৌসুমেই বা সারা বছর চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। এদেরকে বারোমাসী ফসল বলে। যেমন- কলা, পেঁপে ইত্যাদি। আধুনিক চাষাবাদ কলাকৌশলের মাধ্যমে বর্তমানে সারাবছর সবধরনের ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে।

১.৩ ব্যবহারভেদে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিন্যাস :

এক্ষেত্রে সাধারণত ফসলের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে ফসলগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এভাবে শ্রেণিবিভাগ করা ফসলগুলোর মধ্যে নিম্নের শ্রেণিগুলোই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–

১) দানা জাতীয় শস্য (Cereals) : ল্যাটিন শব্দ সিরিস অর্থ শস্যের দেবী (Ciris) হতে Cereals নামকরণ করা হয়েছে। আমাদের প্রধান দানা ফসলগুলো এই শ্রেণিতে পড়ে। এগুলো Gramineae বা ঘাস জাতীয় ফসলের অন্তর্ভূক্ত। এই শস্যগুলোর মধ্যে আমাদের শরীরে শক্তিবর্ধক ও তাপরক্ষক শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমানে থাকে। তাছাড়া প্রোটিন, চর্বি, খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিন জাতীয় খাদ্য উপাদানও অল্প পরিমাণে থাকে। ধান, গম, যব, ভুট্টা, চিনা, কাউন ইত্যাদি দানা জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

২) ডাল জাতীয় শস্য (Pulses) : ছোলা, মসূর, মুগ, মটরশুঁটি, মাষকলাই, শিম, অড়হর প্রভৃতি উপাদান ডালজাতীয় শস্যের অন্তর্ভূক্ত। ডাল জাতীয় শস্যে প্রচুর পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান থাকায় চাল বা রুটির সাথে ডাল মিশিয়ে খেলে তা শুধু মুখরোচকই হয় না, বরং সুষম খাদ্যও হয়। অধিকাংশ ডাল জাতীয় শস্যের শিকড়ে গুটি বা Nodule থাকে। এই গুটিগুলোতে এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়া বাস করে যারা বাতাস হতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে গাছকে সরবরাহ করে। এই জাতীয় ফসল চাষে মাটি উর্বর হয় এবং পরবর্তী ফসলের উপকার করে। ডাল জাতীয় ফসলকে লিগুম (legume) ফসল ও বলা হয়।

৩) তেলবীজ (Oils) : কিছু কিছু শস্যের দানায় তেল সঞ্চিত থাকে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তেলবীজ ভালো জন্মে। আমাদের দেশে দৈনন্দিন রান্নার কাজে এবং গ্লিসারিন, সাবান, বার্নিস প্রভৃতি শিল্পের চাহিদা মেটাতে তৈলের প্রয়োজন। স্নেহ জাতীয় খাদ্য হিসেবে তেল আমাদের দেহের জন্য অপরিহার্য। সরিষা, নারিকেল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, তিল ইত্যাদি প্রধান তেল ফসল।

২০২২

৪) চিনি ফসল (Sugar Crops) : এ জাতীয় ফসলের মধ্যে আঁখ (Sugar Cane) ও বীটই প্রধান। চিনি ও গুড় প্রস্তুতের জন্য আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে আঁখের চাষ হয়ে থাকে। বীট আমাদের দেশে সবজি হিসেবেই ব্যবহার হয় কিন্তু শীতপ্রধান দেশে চিনি উৎপাদনের জন্য বীটের চাষ হয়। তাছাড়া তাল ও খেজুর গাছ হতে রস সংগ্রহ করে কিছু পরিমাণ গুড় বা অপরিশোধিত লাল চিনি তৈরি করা হয় ।

৫) আঁশ বা তন্তুজাতীয় ফসল (Fibre crops) : সুতা, বস্ত্র, দড়ি, চট, বস্তা, মাদুর ইত্যাদি জিনিস তৈরির জন্য এ জাতীয় ফসলের চাষ করা হয়। তুলা, পাট, মেস্তা, শণ, তিসি প্রভৃতি আঁশ জাতীয় ফসলের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে তুলা ও পাট বহুল ব্যবহৃত।

৬) নেশা বা মাদকদ্রব্য ফসল (Narcotics) : এ ফসলগুলো সাময়িক উত্তেজনা, আরাম, উৎসাহ সৃষ্টিকারী নেশা ও মাদকতা জাতীয় ফসল যেমন– তামাক, আফিম, ভাঙ, গাঁজা প্রভৃতি। তামাকের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে বর্তমানে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

৭) সবজি জাতীয় ফসল (Vegetables) : আলু, বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, মূলা, শালগম, গাজর, মিষ্টি আলু প্রভৃতি সবজি জাতীয় ফসলের অন্তর্ভুক্ত। শাক-সবজি কেবল অর্থকরী ফসলই নয়, মানুষের খাদ্যে এগুলো প্রচুর পুষ্টি জোগায়। শাক–সবজিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ রয়েছে যা মানুষের শরীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখে।

৮) পানীয় ফসল (Beverages) : পানীয় দ্রব্য বলতে সাধারণত পান করা হয় এরূপ খাদ্যকে বুঝায়। এ ফসলগুলো হচ্ছে চা ও কফি।

৯) পশু খাদ্য (Fodder Crops) : পশুর খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য যে সমস্ত ফসল আবাদ করা হয় তাকে পশুখাদ্য ফসল বলে। যেমন– নেপিয়ার ঘাস, ইপিল– ইপিল, ভুট্টা, গো-মটর (Cow Pea) জোয়ার, কলাই, সরগম ইত্যাদি পশু খাদ্যের উদাহরণ।

১০) সবুজ সার জাতীয় ফসল (Green Manure Crops) : ধৈঞ্চা, বরবটি, শিম, কলাই, ফেলন, অড়হর, শন পাট ইত্যাদি সবুজ সার জাতীয় ফসল। এ সকল গাছের পাতা ও ডাটা কেটে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়াকে সবুজ সার বলে। সাধারণত শিকড়ে গুটি উৎপন্নকারী ডাল জাতীয় ফসলই সবুজ সারের জন্য উত্তম। বীজ বপনের ২ মাস পর অর্থাৎ গাছে ফুল আসার পূর্বেই কেটে চাষ ও মই দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে জমিতে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের আধিক্য বাড়ে।

১১) মসলা জাতীয় ফসল (Spices crops) : খাদ্য সুস্বাদু, সুগন্ধী ও খাদ্য সংরক্ষণের কাজের জন্য যে সকল ফসল ব্যবহার করা হয় তাদেরকে মসলা ফসল বলে। যেমন– পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ধনিয়া, লবঙ্গ, দারুচিনি, জিরা, তেজপাতা ইত্যাদি। খাদ্যে মসলার ব্যবহারে ফসলের বাজে গন্ধ দূর হয়ে খাদ্য সুস্বাদু ও সুগন্ধী হয়।

১২) ফল ও বাগিচার ফসল (Plantation crops) : স্থায়ী ফল বাগান ও বাগিচার চাষ করার জন্য বহু বর্ষজীবী ফসলের চাষ হয়। যেমন– আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি এ জাতীয় ফল।

১.৪ পুষ্ট, অপুষ্ট দানা ও অপদ্রব্য :

নিষিক্ত পরিপক্ব ডিম্বকোষকে বীজ বলে। তবে কৃষি বিজ্ঞানের দিক হতে বিচার করলে বীজের সংগা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। গাছের যে কোন অংগ যেমন– ডাল, মূল, পাতা, কুঁড়ি, শিকড় ইত্যাদি যার দ্বারাই এর বংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব তাকেই কৃষিবীজ বলে। যেমন– আঁখের টুকরা, কাটা আলু, পাথরকুচির পাতা, কাঁকরোলের শিকড় ইত্যাদি।

ভালো বীজ : ভালো বীজের নিম্নের বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়–

(ক) ভালোবীজ উন্নত জাতের হবে।
(খ) ভালো বীজে অন্য কোনো বীজের মিশ্রণ থাকবে না।
(গ) ভালো বীজ পোকা খাওয়া এবং রোগাক্রান্ত হবে না।
(ঘ) ভালো বীজ নতুন, ঝকঝকে ও দুর্গন্ধমুক্ত হবে।
(ঙ) ভালো বীজের অংঙ্কুরোদগম ক্ষমতা উচ্চ মানের হবে।
(চ) ভালো বীজ সুপরিপক্ব, পুষ্ট, নিটোল ও সবই এক আকারে হবে।

চিত্র: পুষ্ট বীজ ও অপুষ্ট বীজ

ভালো গুণসম্পন্ন বীজকে পুষ্ট বীজ বলে। বীজ ফসল চাষ করে কেটে মাড়াই করলেই পুষ্ট বা ভালো বীজ পাওয়া যায় না। কারণ সদ্য মাড়াই করা বীজের মধ্যে খড়কুটা, ভাঙ্গা দানা, ছোট দানা, অন্য ফসলের বীজ, অন্য জাতের বীজ, আগাছার বীজ, পোকা, পোকা খাওয়া বীজ ও বিভিন্ন অপদ্রব্য থাকতে পারে। বীজের লট থেকে এ সকল অপদ্রব্য ও অপুষ্ট দানা কে বের করা ও পুষ্ট বীজ সংরক্ষনের জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়। যেমন–

ক) বীজ শুকানো
খ) বীজ পরিষ্কারকরণ
গ) বীজ সংরক্ষণ
ঘ) বীজ শোধন
ঙ) বীজ মোড়কীকরণ

উপরোক্ত সকল কাজকে একত্রে বীজ প্রক্রিয়াজাত করণ (Seed Processing) বলে।

বীজ পরিষ্কারকরণ : বীজ মাড়াই করার পর বীজ লটে পুষ্ট বীজ ছাড়াও অপুষ্ট বীজ, অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য এবং অপদ্রব্য থাকে। এগুলো নিম্নরূপ–

২০২২

ক) অপুষ্ট বীজ যেমন–

১) ভাঙা বীজ, থেঁতলানো বীজ, ফাটা, চ্যাপ্টা বীজ ইত্যাদি

২) অস্বাভাবিক বীজ।

খ) অপদ্রব্য

১) খড়কুটা, ছাল, খোসা, ডাল পাতা ইত্যাদি।

২) ধুলা, বালি, পাথর, নুড়ি, মরা পোকা, ইঁদুরের বিষ্ঠা ইত্যাদি।

উপরোক্ত অপুষ্ট, ভাঙা বীজ ও অপদ্রব্য নিম্নের তিনটি ধাপে পরিষ্কার করা যায়–

ক) প্রাথমিক পরিষ্কার: প্রি ক্লিনার নামক যন্ত্র দ্বারা বীজের প্রাথমিক খড়কুটা, ধূলাবালি পরিষ্কার করা হয়।

খ) চূড়ান্ত পরিষ্কার: ফসলের মূল বীজ অপেক্ষা ছোট এবং বড় আকারের বীজ বের করে ফেলা চূড়ান্ত পরিষ্কার করার প্রধান কাজ। এ কাজের যন্ত্রের নাম এয়ারক্রিন ক্লিনার।

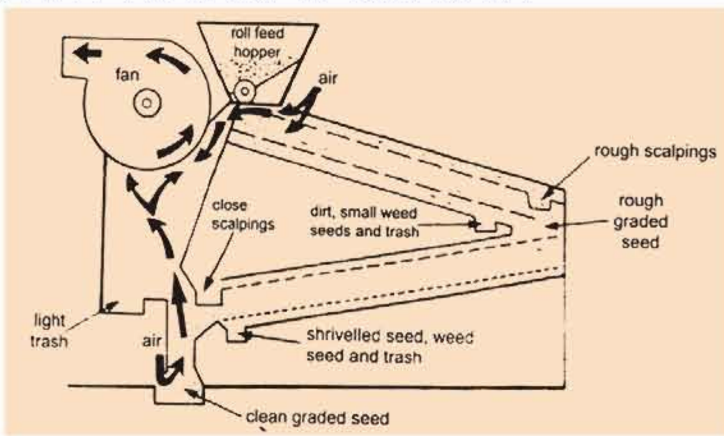

চিত্র: এয়ারক্লিন ক্লিনার

গ) বিশেষ পরিষ্কার: বিভিন্ন অপদ্রব্য পরিষ্কার করে এয়ার ক্রিন ক্লিনার। কিন্তু ছোট বড় বীজ, বিভিন্ন রঙের বীজ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার হয়–

১) ইন্ডেটেন্ড সিলিন্ডার– দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে বীজ পৃথক করে।

২) স্পাইরাল সেপারেটর– চ্যাপ্টা ও খোলা বীজ আলাদা করে।

৩) ইলেট্রিক কালার সর্টার– এ যন্ত্র রং দেখে বীজ আলাদা করে।

৪) গ্রাভিটি সেপারেটর– বিভিন্ন ওজনের বীজ আলাদা করা যায়

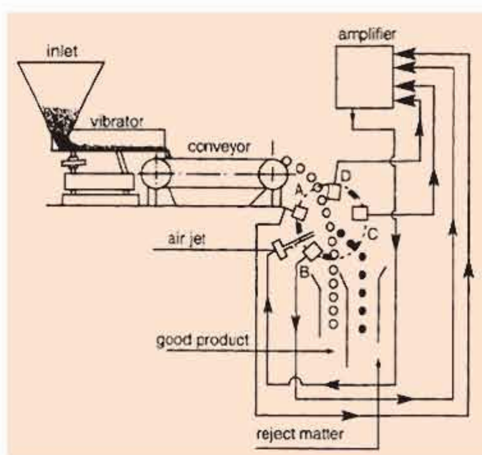

চিত্র: ইলেট্রিক কালার সর্টার

২০২২

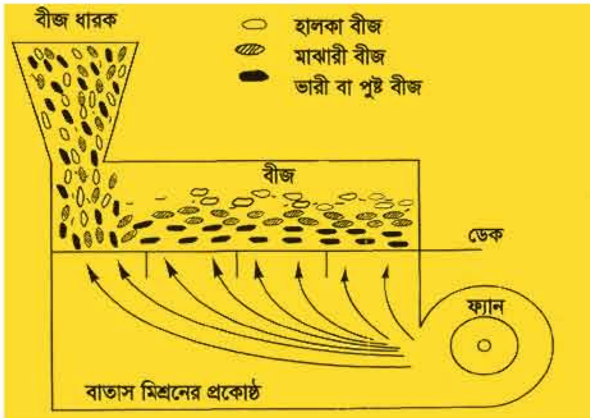

চিত্রঃ গ্রাভিটি সেপারেটর

১.৫ খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য : মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী যা খেয়ে জীবন ধারণ করে তাকেই খাদ্য বলে। যা খেলে শরীর সুস্থ ও কার্যক্ষম থাকে তাকেই খাদ্য বলে। শরীরের সুস্থতা বলতে আমরা সাধারণত শরীর ঠিকমতো বৃদ্ধি, কাজ করার সময় শক্তি পাওয়া এবং শরীরের কোনো অসুখ না থাকা এগুলোকে বুঝায়।

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যই প্রধান। খাদ্য ছাড়া আমাদের বাঁচা সম্ভব নয়। খাদ্য খেলে তৃপ্তি পাওয়া যায়। খাদ্য গ্রহণের পর পরিপাকতন্ত্রে খাদ্য হজম হয়। খাদ্যনালীতে পুষ্টি উপাদানসমূহ শোষিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পৌছে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়।

পুষ্টি : যে প্রক্রিয়া দ্বারা জীব দেহে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও পরিশোষিত হয়ে সমস্ত দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে ও দেহের বৃদ্ধি রক্ষণাবেক্ষণ ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে তাকেই পরিপুষ্টি বা পুষ্টি বলে। অর্থাৎ পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খাদ্য শরীর বৃদ্ধি ক্ষয় পূরণ ও শক্তি উৎপাদন করে।

এগ্রোবেসড খাদ্য : ইংরেজি Agriculture অর্থ কৃষি এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে Agro বা এগ্রো। এগ্রোবেসড খাদ্য বলতে কৃষিভিত্তিক খাদ্যকে বুঝায়। কৃষি বা কৃষি খাত বলতে ফসল, পশু, পাখি, মৎস্য ও বন উপখাতকে একত্রে বুঝানো হয়ে থাকে। তাই ফসল, পশু, পাখি, মৎস্য ও বন থেকে উৎপাদিত খাওয়ার উপযোগী দ্রব্য সহযোগে প্রস্তুতকৃত সকল প্রকার খাদ্যকে এগ্রোবেসড খাদ্য বলে।

১.৬ খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ :

খাদ্যকে দুইভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

যথা: (ক) উদ্ভিদ ও প্রাণিজ উৎসের ওপর ভিত্তি করে।

(খ) শরীরে কাজের উপর ভিত্তি করে।

(ক) উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীর উৎসের ওপর ভিত্তি করে খাদ্যকে নিম্নের ছক অনুযায়ী ভাগ করা যায়-

উদ্ভিদ থেকে	**প্রাণী থেকে**
১. শস্য এবং শস্যজাত খাদ্য	১. মাংস ও মাংসজাতীয় খাদ্য
২. চিনি এবং চিনিজাত খাদ্য	২. ডিম ও ডিমজাত খাদ্য
৩. সবজি এবং সবজিজাত খাদ্য	৩. মাছ ও মাছজাত খাদ্য
৪. ফল এবং ফলজাত খাদ্য	৪. দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য
৫. ডাল এবং লিগুয়েমস	
৬. তেলবীজ	
৭. চা, কফি এবং কোকো	
৮. মসলা জাতীয়	

শরীরের কাজের ওপর ভিত্তি করে খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. শক্তিবর্ধক খাদ্য : শর্করার বা শ্বেতসার (Carbohydrate)- যথা : চাল, গম, আলু চিনি, মধু, গুড়, ভুট্টা, কচু ইত্যাদি। স্নেহ বা চর্বি জাতীয় (Fat) যথা : তেল, চর্বি, ঘি ইত্যাদি।

২. দেহ বর্ধক খাদ্য : প্রোটিন বা আমিষ ও কিছু খনিজ লবণ (যথা-মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, শিমের বিচি ইত্যাদি)

৩. রোগ প্রতিরোধক খাদ্য : ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ ও পনি (যথা : ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি)। তবে কোনো কোনো খাদ্য একাধিক কাজ করে থাকে এবং অনেক সময় অবস্থা বিশেষে এক শ্রেণির খাদ্যের কাজও করে থাকে। তাছাড়া যে কোনো একটি খাদ্যের কাজ অন্যান্য খাদ্যের কাজের পরিপূরক হতে পারে।

১। শক্তিবর্ধক খাদ্য : যে সকল খাদ্য শরীরের তাপ বজায় রাখে, শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্ম যেমন- পরিপাক ক্রিয়া, শ্বসন ক্রিয়া, রেচন ক্রিয়া ইত্যাদি এবং দৈনন্দিন কাজের জন্য শক্তি বা ক্যালরি জোগান দেয়, সেগুলোকে শক্তি বর্ধক খাদ্য বলে। স্বেতসার বা শর্করা ও স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য হতে আমাদের শরীর তাপ ও শক্তি পেয়ে থাকে। শক্তি ব্যতীত কোনো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাপ ও শক্তির অভাবে শরীর দুর্বল হয় ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং শরীর রোগাক্রান্ত হয়ে যায়।

শক্তি বর্ধক

(ক) শস্য জাতীয় খাদ্য : চাল, চিড়া, মুড়ি, খৈ, আটা, কেক, বিস্কুট, সুজি, সেমাই, সাগু, বার্লি, চিনা, কাউন, জব, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি।

(খ) মূল জাতীয় খাদ্য : আলু, মিষ্টি আলু, কচু, কাসাভা ইত্যাদি।

(গ) মিষ্টি জাতীয় খাদ্য : গুড়, চিনি, মধু, মিছরি ইত্যাদি।

(ঘ) ফল জাতীয় খাদ্য : কলা, খেজুর, আম, কাঁঠাল, পেপে, পেয়ারা, লিচু ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেল-

(ক) উদ্ভিজ্জ-সরিষা, সয়াবিন, নারিকেল, পাম, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, তিল, র‍্যাপসিড, তুলার বীচি, ভুট্টা।
(খ) প্রাণিজ - ঘি, মাখন, ছানা, পনির, ডিমের কুসুম, চর্বি।

২। দেহবর্ধক খাদ্য : যে সকল খাদ্যদ্রব্য প্রধানত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন, বৃদ্ধি এবং ক্ষয়পূরণের কাজ করে থাকে, সেগুলোকে দেহবর্ধক খাদ্য বলে। এ সকল খাদ্য শরীরের কাঠামো অর্থাৎ হাড়, রক্ত ও ত্বক তৈরি করে থাকে। এছাড়া শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের কাজও করে থাকে। জন্মের পর থেকে একটি শিশুর শরীর বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে তার শরীরে বৃদ্ধি হার কমে যায়। দেহের অন্যান্য জৈবিকক্রিয়া বিপাকক্রিয়া চলতে থাকে। দেহের ভিতর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্র, মস্তিষ্ক সব সময় কাজ করতে থাকে। একইভাবে দৈনিক হাঁটা চলা, কাজকর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি কায়িক শ্রমের জন্য আমাদের দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উক্ত ক্ষয় পূরণের জন্য দেহবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

দেহবর্ধক খাদ্যের উদাহরণ–

ক) উদ্ভিজ্জ উৎস- সকল প্রকার ডাল, বাদাম, মটরশুঁটি, সয়াবিন, শিমের বীচি ইত্যাদি।
খ) প্রাণিজ উৎস- দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা ইত্যাদি।

৩। রোগ প্রতিরোধক খাদ্য : যে সকল খাদ্যদ্রব্য শরীরকে বিভিন্ন রোগবালাই থেকে রক্ষা করে এবং রোগাক্রান্ত হলে সহজে শরীর সুস্থ করে তোলে, সেসব খাদ্যকে রোগ প্রতিরোধক খাদ্য বলে। সাধারণত ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থসমূহ রোগ প্রতিরোধক খাদ্য হিসেবে কাজ করে। এসকল খাদ্যের অভাবে শরীরে নানা রকম অসুখ যেমন– রাতকানা, বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট, এনিমিয়া, গলগণ্ড ইত্যাদি হয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধক খাদ্যের উদাহরণ–

ক) উদ্ভিজ্জ উৎস- সব ধরনের শাকসবজি, ফল, ডাল তৈলবীজ, চিনাবাদাম।
খ) প্রাণিজ উৎস- ডিম, দুধ, মাংস, পনির, ঘি, মাখন, দই, কলিজা, মাছের তেল ইত্যাদি।

১.৭ খাদ্যের উপাদান ও কাজ :

আমরা শরীর সুস্থ রাখার জন্য যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে থাকি তাতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উপাদান থাকে। অধিকাংশ খাদ্যেই এক বা একাধিক খাদ্য উপাদান থাকে। খাদ্যে যে উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে তাকে সে উপাদানযুক্ত খাদ্য বলা হয়। খাদ্যের উপাদানগুলোকে সাধারণত ছয়ভাগে ভাগ করা যায় যথা–

১. শ্বেতসার বা শর্করা (Carbohydrate)
২. আমিষ (Protein)
৩. স্নেহ বা চর্বি (Fat)
৪. খনিজ লবণ (Minerals)
৫. খাদ্যপ্রাণ (Vitamin)
৬. পানি (Water)

১. শ্বেতসার বা শর্করা : শ্বেতসার মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন (C, H, O) সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার জৈব যৌগ যা সকল প্রকার উদ্ভিদে পাওয়া যায়। শর্করার স্বাদ মিষ্টি বা মিষ্টিহীন এবং রং সাদা। উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপন্ন হয়, যা দাহ্য হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড, পানি ও শক্তি (ক্যালরি) উৎপন্ন হয়। শর্করা প্রধানত তিন প্রকার, যথা- মনোস্যাকারাইড, ডাই স্যাকারাইড ও পলি স্যাকারাইড। প্রায় সব ধরনের শর্করাই পানিতে দ্রবণীয়।

সেলুলোজ (আঁশ) শর্করার একটি অপাচ্য ধরন যা ধান, গম, যব ও শাক-সবজির উপরের খোসা বা বাকলে পাওয়া যায়। এই সেলুলোজ মানুষের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।

শর্করার কাজ–

(ক) শর্করার প্রধান কাজ হচ্ছে শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। (১ গ্রাম শর্করা হতে ৪ ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়)।

(খ) শর্করা স্বল্প আমিষ যুক্ত খাদ্যকে (Low Protein diet) তাপ উৎপাদানের কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়।

(গ) কিছু শর্করা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অন্ত্রের স্বাভাবিক সংকোচন ত্বরান্বিত করে। যেমন– সেলুলোজ ও পেকটিন।

(ঘ) কিছু শর্করা রক্তের কোলেস্টরলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

(ঙ) অতিরিক্ত শর্করা শরীরে গ্রাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।

(চ) দেহকে কিটোসিস নামক রোগ হতে রক্ষা করে।

শর্করার উৎস : চাল, আটা, আলু, কচু, কলা, গুড়, চিনি, মধু, কাসাভা, ভুট্টা, আম, খেজুর, নারিকেল, কাজুবাদাম, বেল, সরিষা, আতা, পেঁপে, চালতা ইত্যাদি।

২. আমিষ : আমিষ হচ্ছে নাইট্রোজেন জাতীয় একপ্রকার জটিল জৈব উপাদান। কোষের প্রোটোপ্লাজমের প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোটিন। তাই প্রোটিনকে জীবকোষের প্রাণ বলা হয়। প্রোটিন খাওয়ার পর তা ভেঙে এমাইনো এসিডে পরিণত হয়। প্রোটিনে প্রায় ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিড থাকে। সবচেয়ে উন্নতমানের আমিষ হচ্ছে প্রাণিজ আমিষ।

আমিষের কাজ

(ক) প্রধান এবং প্রথম কাজ হলো– দেহ গঠন, বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ।

(খ) খাদ্যের পরিপাক ও বিপাক ক্রিয়াকে যে সকল এনজাইম প্রভাবিত করে তা প্রোটিন থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন : পেপসিন, ট্রিপসিন ইত্যাদি।

(গ) আমিষ জাতীয় খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে এন্টিবডি ও এন্টিজেন পদার্থ তৈরি হয় যা আমিষ হতে উৎপন্ন হয়। এরা দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

(ঘ) রক্তের হিমোগ্লোবিন নামক আমিষ বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছ দেয়।

(ঙ) আমিষও তাপশক্তি উৎপাদন করে (১ গ্রাম আমিষ থেকে প্রায় ৪ ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়)। পর্যাপ্ত শর্করা ও স্নেহের অভাব হলে আমিষ ভেঙে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। ২০২২

(চ) আমিষের অভাবে শরীরের কোষ থেকে পানি বের হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জমে শ্বেত রোগ (Edema) হয়।

আমিষের উৎপত্তি : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, চিনা বাদাম, মাশরুম, শিমের বিচি ইত্যাদি।

৩. স্নেহ বা চর্বি : তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে স্নেহ পদার্থ বলে ইংরেজিতে একে Fat বা Lipid বলা হয়। এ খাদ্য সবচেয়ে বেশি তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে। স্নেহ জাতীয় খাদ্য ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল দ্বারা গঠিত। কোনো কোনো উদ্ভিদ বীজে ও বাদামে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পাওয়া যায় যেমন- জলপাইয়ের তেল, নারিকেলের তেল, সরিষার তেল, সয়াবিন ও বাদাম তেল ইত্যাদি। শরীরের জন্য প্রানিজ তেল অপেক্ষা উদ্ভিদ তেল বেশি প্রয়োজন। প্রাণিজ তেল যেমন- ঘি, মাখন, চর্বিযুক্ত মাংস ইত্যাদি খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

স্নেহ জাতীয় পদার্থের কাজ :

(ক) স্নেহ জাতীয় খাদ্য থেকে সবচেয়ে বেশি তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয় (১ গ্রাম স্নেহ থেকে ৯ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়)।

(খ) স্নেহ জাতীয় খাদ্য তাপ কুপরিবাহী বলে দেহকে গরম রাখে।

(গ) এ খাদ্যে ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে পাওয়া যায়।

(ঘ) উদ্ভিদ তেলের অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড ত্বক ও কোষের সুস্থতা রক্ষা করে।

(ঙ) খাদ্যে স্নেহ জাতীয় পদার্থের ব্যবহারের ফলে সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়।

স্নেহ জাতীয় খাদ্যের উৎস :

সয়াবিন, সরিষা, তিল সূর্যমুখী বীজ, চিনাবাদাম, নারিকেল, পাম, তুলা বীজ, ডালডা, মার্জারিন, ঘি, মাখন, চর্বি, মাছের তেল, ডিম ইত্যাদি।

৪. খনিজ লবণ : দেহের অন্যতম উপাদান হচ্ছে খনিজ লবণ। যদিও দেহে প্রায় ৯৬% জৈব পদার্থ ও বাকি ৪% অজৈব পদার্থ বা খনিজ লবণ, তবুও এই অল্প পরিমাণ খনিজ লবণ দেহের কাঠামো গঠন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খনিজ লবণের মধ্যে যেগুলো বেশি পরিমাণে প্রয়োজন সেগুলোকে Macro minerals এবং যেগুলো কম পরিমাণে ব্যবহার হয় সেগুলোকে Trace element বলে। তবে শরীরে প্রায় ২০টি লবণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রয়োজনীয় খনিজ লবণগুলো হচ্ছে- (১) ক্যালসিয়াম (২) পটাশিয়াম (৩) সোডিয়াম (৪) লৌহ (৫) ম্যাগনেসিয়াম (৬) ম্যাঙ্গানিজ (৭) দস্তা (৮) তামা (৯) লিথিয়াম (১০) ফসফরাস (১১) গন্ধক (১২) ক্লোরিন (১৩) বেরিয়াম (১৪) আয়োডিন (১৫) সিলিকন (১৬) ফ্লোরিন ইত্যাদি। এর মধ্যে ১০টি দ্বারা শরীরের ক্ষারীয় এবং ৬টি দ্বারা শরীরের অম্লভাব বজায় থাকে।

ক্ষার জাতীয় লবণ : ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা, লিথিয়াম ও বেরিয়াম।

অম্ল জাতীয় লবণ : ফসফরাস, গন্ধক, ক্লোরিন, আয়োডিন, সিলিকন ও ফ্লোরিন।

খনিজ লবণের কাজ

১) ক্যালসিয়াম

ক) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড় ও দাঁত গঠন করে এবং মজবুত করে।
খ) প্রতিটি জীবকোষ গঠনে এর প্রয়োজন।
গ) এটি রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদান।

ডিম

দুধ

ফুলকপি

ঢেড়স

মসুরের ডাল

মুগ ডাল

সয়াবিন

বরবটি

মাছ

চিত্র : ক্যালসিয়াম খাদ্যের উৎস

লৌহ :

(ক) রক্তের লাল অংশ ও হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে।
(খ) হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে বিভিন্ন কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে।
(গ) কিছু এনজাইম বা জারক রস গঠনে লৌহের প্রয়োজন।

লৌহ জাতীয় খাদ্যের উৎস : কচুশাক, লালশাক, আলু, পুদিনা পাতা, শশা, শালগম, করলা, মুলা, ডাল, পেঁয়াজ, তরমুজ, মটরশুঁটি, খেজুর, যকৃৎ, মাংস, ডিম, গুড়, তেঁতুল, চিংড়ি, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি।

আয়োডিন :

(ক) আয়োডিন শরীরের থাইরক্সিন নামক হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে।
(খ) থাইরক্সিন দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সরাসরি প্রভাবিত করে।
(গ) গর্ভবতী মায়ের জন্য আয়োডিন খুবই প্রয়োজন, অন্যথায় প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নিতে পারে।

আয়োডিন জাতীয় খাদ্যের উৎস : বিভিন্ন শাকসবজি , সামুদ্রিক মাছ (তাজা ও শুঁটকি), শামুক, ছাগলের দুধ, শেওলা, মাছের তেল ইত্যাদি।

ভিটামিন : শর্করা, আমিষ স্নেহ পদার্থ ছাড়াও কিছু কিছু জৈব উপাদান সুস্থতা ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়। এগুলোকে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বলে। বেরিবেরি ও স্কার্ভি রোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন আবিষ্কার হয়েছে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা যেমন- অসবার্ন, মেন্ডেল, ম্যাককলাম ও ডেভিস প্রমাণ করেন যে, লেবুতে স্কার্ভি প্রতিরোধক ভিটামিন- সি, মাখন ও চর্বিতে ভিটামিন-এ, দুধ, গম ও চালের কুঁড়ায় ভিটামিন বি পাওয়া যায়। খাদ্যে ভিটামিন খুবই অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে ভিটামিন দুই প্রকার। যেমন (১) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন : ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে (২) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন : ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি।

ভিটামিনের কাজ :

ভিটামিন এ :

(ক) চোখ সুস্থ রাখে ও স্বল্প আলোতে দেখার ক্ষমতাকে রক্ষা করে।
(খ) অস্থিকোষ ও দাঁতের গঠনকে প্রভাবিত করে।
(গ) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

উৎস : সয়াবিন, চাল, ভুট্টা, লালশাক, পালংশাক, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, পাকা আম, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

চিত্র : ভিটামিন 'এ' খাদ্যের উৎস

২০২১

ভিটামিন ডি এর কাজ :

(ক) শরীরের অন্ত্র ও কিডনি হতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে সাহায্য করে।
(খ) শরীরের হাড় ও দাঁত সুগঠিত ও মজবুত করে।
(গ) শিশুদের রিকেট ও বয়স্কদের অস্টিওম্যালেসিয়া (Osteomalacia) রোগ প্রতিরোধ করে।

উৎস : ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, যকৃৎ ও তৈলাক্ত মাছ। সাধারণত উদ্ভিজ্জ উৎসে ভিটামিন ডি নেই।

মাছের তেল

মাখন

ডিম

দুধ

সূর্যের আলো

চিত্র: ভিটামিন 'ডি' এর উৎস।

ভিটামিন ই এর কাজ :

(ক) কোষের ঝিল্লি গঠন করে।
(খ) ক্যারোটিন বিপাকে সহায়তা করে।
(গ) গর্ভপাত প্রবণতা কমিয়ে দেয়।

উৎসঃ উদ্ভিজ্জ তেল (বাদাম, ভুট্টা, সূর্যমুখী, সয়াবিন, পাম, নারিকেল) ভিটামিন ই এর উৎকৃষ্ট উৎস। দুধ, মাখন ডিমে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

অংঙ্কুরিত ছোলা

সূর্যমুখী তেল

মটরশুঁটি

পাম তেল

চিত্র: ভিটামিন 'ই' খাদ্যের উৎস

ভিটামিন কে এর কাজ :

(ক) রক্ত জমাটকরণ কাজে সহায়তা করে।

উৎস : লেটুস, বাধাকঁপি, ফুলকপি, গাজর, মটরশুঁটি, ডাল, দুধ, ডিম, মাছ মাংস ইত্যাদি।

ফুল কপি

বাধাঁ কপি

পালং

মাংস

ডিম

চিত্র : ভিটামিন 'কে' এর উৎস

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স: ভিটামিন বি একটি একক ভিটামিন নয়। প্রায় ৮ প্রকার বি ভিটামিনকে একত্রে বি-কমপ্লেক্স বলা হয়। এগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা গুণ ও কাজ আছে। এগুলো হলো- (১) ভিটামিন বি$_{১}$ (২) ভিটামিন বি$_{২}$ (৩) নায়াসিন (বি$_{৫}$) (৪) পিরিডক্সিন (বি$_{৬}$) (৫) পেন্টোথেনিক এসিড (৬) বায়োটিন (৭) ফলিক এসিড ও (৮) ভিটামিন বি$_{১২}$ ।

ভিটামিন বি$_{১}$ (থায়ামিন) এর কাজ :

(১) বেরিবেরি রোগ প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।
(২) শর্করা জাতীয় খাদ্য বিপাকে সহায়তা করে।
(৩) পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা রক্ষা করে।

উৎস: ঢেঁকিছাঁটা চাল, বাদাম, গম, মটরশুঁটি, মাছ, ডিম, যকৃৎ ইত্যাদি।

ঢেঁকিছাটা চাল

মটরশুঁটি

কলিজা

আটা ও গম

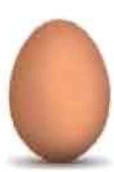
ডিম

দুধ

ছোট মাছ

চিত্র: ভিটামিন 'বি$_{১}$' এর উৎস

ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লেভিন) এর কাজ :

(১) কোষকলার শ্বসন ও বিপাক কাজে সহায়তা করে।
(২) ত্বকের সৌন্দর্য ও সজীবতা রক্ষা করে।
(৩) চোখ ও স্নায়ুর সুস্থতা রক্ষা করে।

উৎস: ঢেঁকিছাঁটা সিদ্ধচাল, ডাল, ভুট্টা, বাদাম, অঙ্কুরিত শস্য দানা, মটরশুঁটি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি।

চিত্র: ভিটামিন 'বি২' এর উৎস।

নায়াসিন বা নিকোটেনিক এসিড :

(১) নায়াসিন শর্করা, আমিষ ও স্নেহ থেকে শক্তি উৎপাদন শ্বসন কাজে সহায়তা করে।
(২) সুস্থ ত্বক, অন্ত্র ও স্নায়ুর জন্য নায়াসিন প্রয়োজন।

উৎস: ডাল, বাদাম, ভুট্টা, তেলবীজ, ছোলা, মাছ, মাংস ও যকৃৎ ইত্যাদি।

পিরিডক্সিনের কাজ :

(১) আমিষ বিপাকে এনজাইমের সহায়তা করে।
(২) বাড়ন্ত শিশুর বর্ধনে সহায়তা করে।

উৎস: ঈস্ট, চালের কুঁড়া, গম, ছোলা, বাদাম, সবুজ শাক, মাছ, মাংস, ও যকৃৎ ইত্যাদি।

ফলিক এসিড :

(১) কোষ বিভাজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
(২) রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে।

উৎস: বাদাম, ছোলা, ডাল, চাল, আটা, সবুজ শাকসবজি, কলিজা, বৃক্ক, মাছ ও মাংস ইত্যাদি।

ভিটামিন বি১২:

(১) রক্তের লোহিত কণিকা গঠন করে।
(২) স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ক্ষুধা বৃদ্ধিতে প্রভাবিত করে।

উৎস: একমাত্র উৎস প্রাণিজ খাদ্য যেমন- যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি।

ভিটামিন সি :

(১) এটি কোলাজেন নামক আমিষ তৈরি করে হাড়, তরুণাস্থি ও ত্বকের রক্ষণাবেক্ষণ করে।
(২) রক্তের বিশুদ্ধতা ও রক্ত গঠনে সহায়তা করে।
(৩) ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকাতে সাহায্য করে।
(৪) এটি জারন প্রতিরোধক বা এন্টি অক্সিডেন্ট (Anti oxidant) হিসেবে কাজ করে।

উৎস: সব রকম টাটকা ফল ও সবজি, আমলকী, পেয়ারা, কুল, কামরাঙ্গা, আমড়া, আনারস, জাম্বুরা, লেবু কাঁচামরিচ ইত্যাদি। টিনজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে ভিটামিন সি থাকে না।

চিত্রঃ ভিটামিন 'সি' এর উৎস।

৬. পানি : আম, কাঁঠাল, ডাব, তরমুজ, পেঁপে, আনারস, জাম্বুরা, আঁখ বিভিন্ন প্রকার ফল ও সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে। মানব দেহের প্রায় ৬৩% পানি। শরীরে পানির ঘাটতি হলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

পানির কাজ :

(১) পানি পরিপাক ও পরিশোষণে সাহায্য করে।
(২) বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ নিষ্কাশণ করে।
(৩) দেহ থেকে ঘাম নিরসন ও বাষ্পীভবনের দ্বারা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে।

উৎস : খাবার পানি. চা, দুধ, কফি, সবজি ও ফল থেকে প্রাপ্ত পানি।

সুষম খাদ্য : আমাদের পেট খালি থাকলে ক্ষুধা অনুভব করি এবং তখন খাওয়ার প্রয়োজন হয়। ক্ষুধা লাগলে পেট ভরে খেয়ে ক্ষুধা দূর করাই উদ্দেশ্য নয়, খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো পরিমিত পরিমাণে শরীরে সরবরাহ নিশ্চিত করা। পুষ্টি উপদানগুলো হলো আমিষ, শর্করা, স্নেহ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি।

দেহে যে ছয়টি পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন তা তিন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। একজন লোকের দেহের স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য বিভিন্ন উপাদান বহুল যেসব খাদ্যসামগ্রী পরিমাণমতো প্রয়োজন হয় তাকে সুষম খাদ্য বলে। সুষম খাদ্য দেহে শক্তি জোগানো ছাড়াও দেহের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দান করে। সুতরাং মাছ-ডাল, ভাত-রুটি, শাকসবজি, ফল এসব বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য নিয়েই খাবার সুষম হয়। যেসব শর্ত পালনের ফলে খাবার সুষম হয় তা নিম্নরূপ-

(১) প্রতি বেলায় খাবারে তিন শ্রেণীর খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিতকরণ।

(২) প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্য নির্ধারিত পরিমাণে (পেশা অনুযায়ী) পরিবেশন করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহে নিশ্চিতকরণ।

(৩) খাদ্য প্রস্তুতে সতর্কতা অবলম্বন করে খাদ্য উপাদানের অপচয় রোধ।

(৪) দৈনিক মোট ক্যালরির ৬০-৭০% শর্করা জাতীয় খাদ্য, ৩০-৪০% স্নেহ জাতীয় খাদ্য এবং ১০% আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ।

(৫) দৈনিক মাথাপিছু কমপক্ষে ৩০ গ্রাম তেল রান্নায় ব্যবহার এবং ২০ গ্রাম গুড়/চিনি পরিবেশন।

(৬) খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনে যথাযথভাবে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন।

(৭) এছাড়া প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

সুষম খাদ্যকে উপাদেয় করার জন্য খাদ্য প্রস্তুতে মশলা ব্যবহার করা যেতে পারে। মশলা শুধু খাবার উপাদেয় করে না বরং কিছু খাদ্য উপাদান যোগ করে। সুষম খাদ্যে কিছু পরিমাণে আঁশ থাকা প্রয়োজন। কারণ আঁশ খাদ্যনালীতে হজমকৃত খাদ্য চলাচল ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। সবধরনের শাকসবজি ও ফলমূলে যথেষ্ট পরিমাণে আঁশ থাকে। তাই খাদ্য সুষম করার জন্য প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফল ও সবজি থাকা প্রয়োজন।

আর্থিক অবস্থা ও খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে সুষম খাদ্য তৈরি করা যাবে। সুষম খাদ্য হিসেবে যে কোনো একশ্রেণির খাদ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দামি বা সস্তা খাবার গ্রহণ করা হলে খাদ্যের সুষমতা নষ্ট হবে না। এছাড়া এ তালিকায় ভিটামিন-সি যুক্ত করতে হবে। কারণ ভিটামিন-সি শরীরে জমা হয় না, প্রতিদিন তা খেতে হয়। ফল ও সবজিতে ভিটামিন-সি আছে। কিন্তু সবজি রান্নার ফলে ভিটামিন-সি তাপে নষ্ট হয়। নিম্নের চার্টে তিন ধরনের খাদ্যের দামি ও সস্তা খাবারের তালিকা দেওয়া হলো।

সারণি : কাজের ভাগ হিসেবে তিন শ্রেণির দামি ও সস্তা খাবার :

খাদ্যের শ্রেণি	দামি খাবার	সস্তা খাবার
শক্তিবর্ধক খাদ্য	চিকন চালের ভাত, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, চিনি, ঘি, মাখন, মধু	মোটা চালের ভাত, আটার রুটি, মিষ্টি আলু, চিনা, কাউন, ভুট্টা, কচু, কাচকলা, মূলা, গুড়, তেল
দেহ বর্ধক খাদ্য	বড় মাছ, মাংস, ডিম, দুধ	ছোট গুঁড়ামাছ, ডাল, শিমের বিচি, বাদাম, সয়াবিন।
রোগ প্রতিরোধক খাদ্য	দুধ, কলিজা, কলা, কমলা, আপেল আঙ্গুর, ডালিম, বেদানা, পাকা আম, পাকা পেঁপে ইত্যাদি।	সবুজ ও রঙিন শাকসবজি, সাজনা, মিষ্টি কুমড়া, আমলকী, লেবু, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, আম ইত্যাদি।

উপরের সারণি থেকে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের সমন্বয় করে সুষম খাদ্য তৈরি করতে হয়। তবে, মনে রাখতে হবে খাদ্য তালিকায় যত বেশি বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর সমন্বয় করা যাবে, তত বেশি সুষম হবে। একজন লোক কোন শ্রেণির খাদ্য কি পরিমাণে খেলে তা সুষম হবে তা নির্ভর করে তার বয়স, পেশা, লিঙ্গ এবং শারীরিক অবস্থার ওপর। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সস্তা সুষম খাদ্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো–

১. চাল বা গম + ডাল + শাক (পুঁইশাক/পালংশাক/ডাঁটা) বা সবজি (টমেটো, শিম, বরবটি, ফুলকপি, লাউ, করলা ইত্যাদি)।

২. চাল বা গম + ডাল + সামান্য মাছ + শাকসবজি।

৩. মায়ের দুধ (শিশুর জন্য সুষম খাদ্য)

৪. চাল বা গম + মাংস + শাকসবজি

৫. চাল বা গম + গরুর দুধ।

ছোট বাচ্চাদের শরীর দ্রুত বৃদ্ধি পায়, সে জন্য বয়স্কদের তুলনায় তাদের আমিষ জাতীয় খাদ্য বেশি প্রয়োজন হয়। যারা বেশি শারীরিক পরিশ্রম করে (কাঠ কাটা, মাটিকাটা, রিক্সা বা ঠেলাগাড়ি টানা ইত্যাদি) তাদের দরকার বেশি বেশি শক্তিদায়ক খাদ্য, যেমন– শর্করা। গর্ভবতী ও প্রসূতিকালে নারীদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশি পরিমাণে এবং বৈচিত্র্যময় খাবার প্রয়োজন হয়।

১.৯ বিভিন্ন বয়সের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা :

(ক) ০-৬ মাস বয়সের জন্য মায়ের দুধই উৎকৃষ্ট খাদ্য। পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর সব পুষ্টি চাহিদা মেটাতে পারে।

(খ) ৬-১২ মাসের শিশুর দৈনিক খাদ্য তালিকা : মাতৃদুগ্ধের সাথে শিশুকে নিচের খাদ্যগুলো খাওয়াতে হবে।

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	নরম ভাত	৪৫ গ্রাম (চাল)	কিলোক্যালরি-৬৫০
২.	রুটি দুধে ভিজিয়ে	৪৫ গ্রাম ২ $^{১}/_{২}$ টেবিল চামচ)	আমিষ-২২ গ্রাম
৩.	ডাল (নরম খিচুড়ি করে)	১০ গ্রাম (২ চা চামুচ)	ক্যালসিয়াম-৩৪৫ মি. গ্রাম
৪.	আলু (চটকিয়ে)	১ টি ছোট	ভিটামিন এ-৩১০ আই.ইউ. লৌহ- ৭.৫ মি. গ্রাম
৫.	শাকসবজি (ভাতের সাথে)	৬০ গ্রাম	ক্যারোটিন ১৬৮০ মি. গ্রাম
৬.	পাকা কলা	১টি ছোট	ভিটামিন বি$_{২}$- ০.৬৮ মি. গ্রাম
৭.	ডিম (সম্ভব হলে)	১টি	ভিটামিন সি-১৭ মি. গ্রাম

(গ) ১-৩ বছরের বাচ্চাদের দৈনিক খাদ্য তালিকা : মাতৃদুগ্ধের সাথে শিশুকে নিচের খাদ্যগুলো খাওয়াতে হবে।

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	ভাত/পিঠা/মুড়ি/চিড়া	১০০ গ্রাম (চাল)	কিলোক্যালরি-১৩৭৫
২.	ডাল	৯০ গ্রাম (১$^{১}/_{২}$ মুষ্টি)	আমিষ-৩৫ গ্রাম
৩.	রুটি/বিস্কুট	৬০ গ্রাম (আটা)	ক্যালসিয়াম-৫৫০ মি. গ্রাম
৪.	শাক ভাজি	৬০ গ্রাম	লৌহ-২২ মি. গ্রাম
৫.	শাকসবজি (নিরামিষ)	৩০ গ্রাম	ভিটামিন-এ-৩২০ আই, ইউ.
৬.	মিষ্টি আলু	৬০ গ্রাম	ক্যারোটিন-৩১০২ মা. গ্রাম
৭.	তেল	১০ মি. লি (২ চা চামুচ)	ভিটামিন বি$_{২}$-০.৫০ মি. গ্রাম
৮.	সবজি	৩০ গ্রাম	ভিটামিন সি-১৭ মি. গ্রাম
৯.	আলু	৪৫ গ্রাম	
১০.	মাছ বা মাংস	৩০ গ্রাম	
১১.	তেল	১০ মিলি (২ চা চামুচ)	
১২.	দুধভাত/পায়েশ/রুটি/সুজি	২৫০ গ্রাম	
১৩.	চিনি/গুড়	৬০ গ্রাম	
১৪.	ফল	১টি	

(ঘ) ৪-৬ বছরের বাচ্চাদের দৈনিক খাদ্য তালিকা :

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	ভাত/পিঠা/মুড়ি/চিড়া	১৫০ গ্রাম (চাল)	কিলোক্যালরি-১৩৭৫
২.	রুটি/বিস্কুট	৬০ গ্রাম	আমিষ- ৪৫ গ্রাম
৩.	ডাল	৪৫ গ্রাম	ক্যালসিয়াম-৪৬০ মি. গ্রাম
৪.	শাক ভাজি	৬০ গ্রাম	লৌহ-২২ মি. গ্রাম
৫.	সবজি ভাজি (নিরামিষ)	৪৫ গ্রাম	ভিটামিন-এ-৩৯০ আই, ইউ.
৬.	মিষ্টি আলু / গোল আলু	৬০ গ্রাম	ক্যারোটিন-৩১০২ মা. গ্রাম
৭.	তেল	১০ মি. লি (২ চা চামুচ)	ভিটামিন বি$_{২}$-১.২ মি. গ্রাম
৮.	মাছ বা মাংস	৩০ গ্রাম	ভিটামিন সি-১৭ মি. গ্রাম
৯.	তেল	১৫ মিলি (৩ চা চামুচ)	
১০.	দুধভাত/পায়েশ	২৫০ গ্রাম	
১১.	চিনি/গুড়	৬০ গ্রাম	
১২.	ফল	১টি	

(ঙ) ৭-৯ বছরের বাচ্চাদের দৈনিক খাদ্য তালিকা :

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	চাল/আটা	৩০০ গ্রাম	কিলোক্যালরি-২২০০
২.	ডাল	৬০ গ্রাম	আমিষ- ৫৫ গ্রাম
৩.	সবুজ শাক	৬০ গ্রাম	ক্যালসিয়াম-৫০০ মি. গ্রাম
৪.	মিষ্টি আলু / গোল আলু	৮০ গ্রাম	লৌহ-৩০ মি. গ্রাম
৫.	সবজি	৩০ গ্রাম	ভিটামিন-এ-৩২৪ আই, ইউ.
৬.	মাছ/মাংস/ডিম	৬০ গ্রাম	ক্যারোটিন-৩৯১৬ গ্রাম
৭.	তেল	৩০ গ্রাম	ভিটামিন বি$_{২}$-১.২ মি. গ্রাম
৮.	ফল	১টি	ভিটামিন সি-৩৬ মি. গ্রাম
৯.	দুধ	২৫০ মি.লি.	
১০.	চিনি/গুড়	৩০ গ্রাম	

(চ) ১০-১৪ বছরের বাচ্চাদের দৈনিক খাদ্য তালিকা :

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	চাল/আটা	৩৫০ গ্রাম	কিলোক্যালরি -২৬০০
২.	ডাল	৬০ গ্রাম	আমিষ- ৬০ গ্রাম
৩.	সবুজ শাক	৬০ গ্রাম	ক্যালসিয়াম-৭০০ মি. গ্রাম
৪.	সবজি	১১৫ গ্রাম	লৌহ-৪৫ মি. গ্রাম
৫.	মিষ্টি আলু	১১৫ গ্রাম	ভিটামিন-এ-৩২৪ আই, ইউ.
৬.	মাছ/মাংস/ডিম	৬০ গ্রাম	ক্যারোটিন-৬১৫১ মা. গ্রাম
৭.	তেল	৩০ গ্রাম	ভিটামিন বি$_{২}$-০.৫ মি. গ্রাম
৮.	ফল	১টি	ভিটামিন সি-৭০ মি. গ্রাম
৯.	দুধ	২৫০ মিলি	

(ছ) ১৪-১৮ বছরের কিশোর/কিশোরীদের দৈনিক খাদ্য তালিকা :

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	চাল / আটা	৪৫০ গ্রাম	কিলোক্যালরি-২৭৭০
২.	ডাল	১০০ গ্রাম	ক্যালসিয়াম-৭০০ মি. গ্রাম
৩.	শাক	৯০ গ্রাম	লৌহ-৬০ মি. গ্রাম
৪.	আলু/মিষ্টি আলু	১২৫ গ্রাম	ভিটামিন-এ-৪৪৫ আই, ইউ.
৫.	অন্যান্য সবজি	৯০ গ্রাম	ক্যারোটিন-৬২৫৮ মা.গ্রাম
৬.	তেল	৩০ গ্রাম	
৭.	দুধ	২৫০ মি.লি	
৮.	মাছ/মাংস/ডিম	৬০ গ্রাম	ভিটামিন বি$_{২}$-১.৫ মি. গ্রাম
৯.	তেল	৬০ গ্রাম	ভিটামিন বি$_{২}$-১.০ মি. গ্রাম
১০.	ফল	১টি	ভিটামিন সি-৭০মি.গ্রাম
১১.	চিনি/গুড়	৬০ গ্রাম	

(জ) পূর্ণবয়স্ক নারীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা :

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	চাল/আটা	৩৭৫ গ্রাম	কিলোক্যালরি-২২০০
২.	ডাল	৪৫ গ্রাম	আমিষ- ৫৬ গ্রাম
৩.	শাক	১৫৫ গ্রাম	ক্যালসিয়াম-৬০০ মি. গ্রাম
৪.	সবজি	৯০ গ্রাম	লৌহ-৪০ মি. গ্রাম
৫.	আলু/মিষ্টি আলু	৬০ গ্রাম	ভিটামিন-এ-৩৫০ আই, ইউ.
৬.	মাছ/মাংস/ডিম	৬০ গ্রাম	ক্যারোটিন-৭৫০০ মা. গ্রাম
৭.	তেল	৬০ গ্রাম	ভিটামিন বি$_{২}$-০.৫ মি. গ্রাম
৮.	ফল	১টি	ভিটামিন সি-৭০ মি. গ্রাম

(ঝ) পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দৈনিক খাদ্য তালিকা :

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	চাল	৩৭৫ গ্রাম	কিলোক্যালরি-২৪০০-২৬০০
২.	আটা	১৫০ গ্রাম	আমিষ-৬০ গ্রাম
৩.	ডাল	৫০-৬০ গ্রাম	লৌহ- ২০ মি. গ্রাম
৪.	শাকপাতা	১০০ গ্রাম	ভিটামিন-সি ২০ মি. গ্রাম
৫.	সবজি	১০০ গ্রাম	ক্যালসিয়াম -২০ মি. গ্রাম
৬.	আলু	৬০-১০০ গ্রাম	ভিটামিন-এ-৭৫০ আই, ইউ.
৬.	মাছ/মাংস	৭০-১০০ গ্রাম	ক্যারোটিন-১২৫ মা. গ্রাম
৭.	ডিম	১টি	
৮.	তেল	৪০ গ্রাম	
৯.	ফল (মাঝারি)	১টি	
১০.	চিনি/গুড়/ মিষ্টি	৩০ গ্রাম	

(ঞ) গর্ভবতী নারীদের দৈনিক খাদ্য তালিকা :

ক্রঃ নং	খাবার	পরিমাণ	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
১.	চাল/ আটা	৪৫০ গ্রাম	কিলোক্যালরি-২৫৫০
২.	ডাল	১০০ গ্রাম	আমিষ-৬০ গ্রাম
৩.	শাক	৯০ গ্রাম	ক্যালসিয়াম-১১০০ মি. গ্রাম
৪.	সবজি	১০০ গ্রাম	লৌহ-৪২ গ্রাম
৫.	আলু/মিষ্টি আলু	২০০ গ্রাম	ভিটামিন-এ-৭০০ আই, ইউ.
৬.	মাছ/মাংস/ডিম	৬০ গ্রাম	ক্যারোটিন-৭৫০০ আই, ইউ.
৭.	তেল	৬০ গ্রাম	ভিটামিন বি$_{২}$-০.৫ মি. গ্রাম
৮.	চিনি/গুড়	৩০ গ্রাম	
৯.	ফল	১টি	ভিটামিন সি-৫০ মি. গ্রাম

উপরোক্ত খাদ্য তালিকা শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ও সুষম খাদ্য। উক্ত তালিকার খাদ্য থেকে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন সঠিক পরিমাণে পাওয়া যাবে। সাধারণভাবে কোনো খাদ্য তালিকায় যত বেশি ধরনের খাদ্য বস্তু থাকবে উক্ত খাদ্য ততবেশি রুচিপূর্ণ ও সুষম হবে। ২০২২

১.১১ বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতি :

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জনগণের এক বিরাট অংশ বিভিন্ন প্রকারের অপুষ্টিতে ভুগছে। বাংলাদেশে অপুষ্টির প্রথম এবং প্রধান শিকার হচ্ছে মা ও শিশু। যুক্তরাষ্ট্রের USAID বাংলাদেশ নারী ও শিশু স্বাস্থ্য ২০১১ইং শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে- এদেশে মায়েদের এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্টির শিকার, উচ্চতার তুলনায় তাদের ওজন কম জাতিসংঘের FAO পুষ্টি জরিপ-১১তে বলা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নারীর পুষ্টিহীনতার দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষে। এতে আরও বলা হয়েছে বাংলাদেশে ৫০% এর বেশি নারীই পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বিগত অক্টোবর ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনে (ব্যাংকক) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহকারী মহাসচিব বলেছেন বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ শিশু মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি। পৃথিবীর যে ৩৬টি দেশে অপুষ্টি বেশি তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাউথ এশিয়ান ইনফ্যান্ট ফিডিং রিসার্চ নেটওয়ার্কের এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের প্রায় অর্ধেকই অপুষ্টিতে আক্রান্ত। ৫ বছরের কমবয়সী শিশুর ৫০% এর মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিশু পুষ্টি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম কিউ. কে তালুকদারের মতে শুধু অপুষ্টির কারণে দৈনিক ২০০ শিশু মারা যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক ২০০৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যুর হার ২৮%। এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৩%। কম ওজনে জন্মানো শিশুর হার ১৯%। রক্তস্বল্পতায় ভোগে ৫০% এবং গর্ভবতী মা রক্তশূন্যতায় ভোগে ৪৬%। বাংলাদেশের ৪০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এরা দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দেশের ৫০% নারী ও শিশু আয়রনের অভাবে ভুগছে। অপুষ্ট মা অপুষ্ট শিশু অদক্ষ কর্মী অপুষ্টির এ চক্রে বছরে দেশের প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের অপুষ্টির ব্যপকতা অতি উচ্চ হারের চেয়েও বেশি। এদেশে খর্বাকৃতি অর্থাৎ স্টান্টিং (Stunting) প্রায় ৩৬%। উচ্চতার তুলনায় ওজনআধিক্য বা ওয়েস্টিং (Wasting) ১৪% ও বয়সের তুলনায় ওজন স্বল্পতা বা আন্ডারওয়েট (Under weight) প্রায় ৩২% যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রধান পুষ্টি সমস্যা ও সম্ভাব্য কারণ নিম্নের ছকে দেওয়া হলো–

ক্রমিক নং	সমস্যা	কারণ
১.	অসম খাদ্য বন্টন	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অসমতা, ফলে অসম খাদ্য বন্টন, খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি, অপর্যাপ্ত গুদামজাতকরণ, খাদ্য অপচয়ও খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করে।
২.	ক্যালরি গ্রহণ হ্রাস	মাথাপিছু প্রতিদিন ২৩০১ কিলোক্যালরি থেকে ১৯৬১ কিলোক্যালরিতে নেমে গেছে।
৩.	শিশুর অপুষ্টি	৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা বিভিন্ন মাত্রার অপুষ্টিতে আক্রান্ত। শিশু মৃত্যুর হার বেশি, শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মায় অর্থাৎ জন্মকালীন ওজন ২.৫ কেজির ও কম। অল্প বয়সে বিবাহ, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, মায়ের অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি শিশুর অপুষ্টির প্রধান কারণ।

৪.	মায়ের অপুষ্টি	প্রতি ১০০০ সন্তান জন্মদানে ৫৬ জন মা গর্ভকালীন জটিলতায় মারা যায়। দৈহিক ক্লেশ, অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, কুসংস্কার, মায়ের অপুষ্টির প্রধান কারণ।
৫.	রক্তস্বল্পতা	মহিলা, গর্ভবতী মহিলা এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা রক্ত স্বল্পতায় ভূগছে। কৃমি রোগ, আমাশয়, আমিষ ও লৌহের ঘাটতি, ঘন ঘন সন্তান জন্মদান, রক্ত স্বল্পতার প্রধান কারণ।
৬.	ভিটামিন-'এ' এর অভাব	প্রতি বছর ৩০,০০০ শিশু ভিটামিন- 'এ' এর অভাবে অন্ধ হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশু অন্ধ হয়ে পড়ার পর মারা যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েদের ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ শাক-সবজি খাওয়ানো হচ্ছে না, রান্নায় তেল ব্যবহার খুবই অল্প, শাল দুধ ফেলে দেওয়া ইত্যাদি।
৭.	আয়োডিনের অভাব	৬৯% জনগণের মধ্যে আয়োডিনের অভাব। ৪৭% জনগণের মধ্যে গলগন্ড দেখা গেছে। ৫ লক্ষ লোক আয়োডিনের অভাবে মানসিক প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ। মাটি, পানি ও খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি।
৮.	অন্যান্য অণু পুষ্টি উপাদানের অভাব	ফলিক এসিড, রিভোফ্লাভিন এবং দস্তা ইত্যাদি অনুখাদ্যের অভাব কিশোরী মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। আমিষ খাদ্যের স্বল্পতা, পেটের অসুখ প্রভৃতিতে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

১.১১ বাংলাদেশে পুষ্টির সমস্যা :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২৬%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়তি জনসংখ্যার চাপে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও বসতি স্থাপনের ফলে চাষাবাদের জমি কমে যাচ্ছে। জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। ফলে খাদ্য ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। খাদ্য দ্রব্যের ক্রয়মূল্য অত্যন্ত বেশি হওয়ায় সকলের পক্ষে পুষ্টি সম্পন্ন খাদ্য কিনে খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব এবং অজ্ঞতার কারণে অনেকে হাতের কাছে যা পায় তাই খেয়ে ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখার জন্য খাদ্য নির্বাচনের যে একটা প্রয়োজন আছে তা বিবেচনা করা একান্ত দরকার। শরীরের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য খাওয়া উচিত অন্যথায় পুষ্টিহীনতায় ভুগে রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

একজন লোকের দৈনিক ৭০-৭৫ গ্রাম প্রোটিন খাওয়ার দরকার। কিন্তু প্রোটিনের ঘাটতি থাকায় দিনের পর দিন প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবে পুষ্টিহীনতা মানুষ ভুগছে। খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালরির একত্রে অভাবজনিত রোগকে প্রোটিন-ক্যালরির অভাবজনিত রোগ বলে। এ ধরনের পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছে শিশু, অন্তসত্ত্বা ও স্তন্যদানকারী নারী এবং স্বল্প আয়ের লোকজন। অনেকে দীর্ঘদিন অপুষ্টিতে ভুগছে ভুগতে মারা যাচ্ছে। যারা বেঁচে থাকে তারা অসুস্থ, মেধাহীন ও কর্মে নিরুৎসাহী হয়ে থাকে। একপর্যায়ে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিহীন হয়ে সমাজের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকে। এছাড়া পুষ্টিহীনতা থেকে মানুষের ভিটামিনজনিত নানা রোগ হয়ে থাকে।

পুষ্টিহীনতার কারণ– পুষ্টিহীনতাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রথমে এর কারণ জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশে পুষ্টির ঘাটতি বৃদ্ধির মূল কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. দারিদ্র্য ২. ঘন জনবসতি ৩. অজ্ঞতা ৪. খাদ্যের পুষ্টিমান উন্নয়ন
৫. রন্ধন জ্ঞান ৬. সুষম খাদ্য তৈরি ৭. খাদ্য সংরক্ষণ ৮. কুসংস্কার
৯. খাদ্যে ভেজাল ১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ১১. স্বাস্থ্য পরিচর্যা

২০২২

নিম্নে এ কারণগুলো বর্ণনা দেওয়া হলো :

১। দরিদ্রতা : পুষ্টিকর খাদ্য যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাখন, পনির, ঘি, ডাল ও তেল ইত্যাদির দাম বর্তমান বাজারে আকাশচুম্বী। জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে বিধায় তারা পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় করতে পারে না ফলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

২। ঘন জনবসতি : অত্যন্ত ঘনবসতি পূর্ণ বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার বসতি প্রায় ১০৬৩ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। জনসংখ্যার এই উর্ধ্বগতির সাথে পাল্লা দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাবার জোগান দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাছাড়া প্রতিবছর ৮৭ হাজার হেক্টর কৃষি জমি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। এভাবে আবাদি জমি হ্রাস এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি চলতে থাকলে খাদ্য ঘাটতি হবে, ফলে মারাত্মক পুষ্টিহীনতা দেখা দেবে।

৩। পুষ্টি বিষয়ক অজ্ঞতা : আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই খাদ্য নির্বাচন এবং রান্নার উপযুক্ত পদ্ধতি জানা নেই। এ কারণে দেখা যায় একই ধরনের খাদ্য অতিমাত্রায় গ্রহণ করার ফলে খাদ্যের অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। শাকসবজি ও ফলের খাদ্যপ্রাণ সংরক্ষণ, পুষ্টিকর খাদ্য চিহ্নিতকরণ ও ব্যক্তি বিশেষের ক্যালরির চাহিদা, শিশু খাদ্য ও সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান বা ধারণা না থাকার কারণে সাধারণ মানুষ পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছে।

৪। খাদ্যের পুষ্টিমান উন্নয়ন : খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পুষ্টিমানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যের মান উন্নত করা সম্ভব যা পুষ্টি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– গুঁড়া দুধের সাথে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' সংযুক্তকরণ, গমের সাথে লাইসিন যোগ, লবণের সাথে আয়োডিন যোগ, মাড়সহ ভাত রান্না, আটার সাথে ভুট্টার আটা যোগ, তেল সহযোগে ক্যারোটিনসমৃদ্ধ শাক-সবজি রান্না ইত্যাদি। খাদ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী খাদ্যের সাথে বিভিন্ন দ্রব্য যোগ করে খাদ্যের পুষ্টিমানের বৃদ্ধিসাধনে দক্ষ থেকে হবে।

৫। রন্ধন জ্ঞান : খাদ্য উপাদান অবিকৃত রেখে সঠিক পুষ্টি আহরণ ও রান্নার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব কম নয়। খাবার তৈরিতে বেশি মশলা, বেশি ঝাল, বেশি কষানো বা অল্প জ্বালে খাদ্যের পুষ্টি নষ্ট হতে পারে। এ ধরনের খাবার হজমে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাপে ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায়। শাকসবজি সর্বদা ধুয়ে কাটতে হবে। রান্নায় কম পানি ব্যবহার করতে হয়। খাদ্য সর্বদা তাজা অবস্থায় রান্না করতে হয় ইত্যাদি জ্ঞানের অভাবে পুষ্টিহীনতা থেকে পারে।

৬। সুষম খাদ্য : বয়স অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের খাবার একত্রে মিশিয়ে সব ধরনের পুষ্টি প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সুষম খাদ্যের কয়েকটি তালিকা পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

৭। খাদ্য সংরক্ষণ : উৎপাদন মৌসুমে আলু, শাকসবজি, আম, কাঁঠাল, আনারস, লেবু, কলা ও অন্যান্য ফসল প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন হলে সংরক্ষণ সুবিধার অভাবে তা নষ্ট হয়ে যায়। পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশে গত বছর (২০১৭) সবজি উৎপাদন হয় ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার মেট্রিক টন, আলু উৎপাদন হয় ১ কোটি ২ লক্ষ মেট্রিক টন। খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত ফল, মূল শাক-সবজি ইত্যাদি সংরক্ষণ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অনেক এগিয়ে গেছে।

৮। কুসংস্কার : সামাজিক কুসংস্কার আমাদের দেশে পুষ্টিহীনতার জন্য অনেকাংশে দায়ী; যেমন- গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে অনেক ধরনের খাবার খেতে দেওয়া হয় না যার বিজ্ঞানসমম্মত কোনো ভিত্তি নেই। মেয়ে অপেক্ষা ছেলেদেরকে পুষ্টিকর খাবার বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়। অনেক এলাকায় প্রসূতি মাকে সুতিকা রোগ হওয়ার ভয়ে পুঁটিমাছ, ইলিশ মাছ ও গরুর মাংস খেতে দেওয়া হয় না। গ্রামের অনেক মা ও শিশুকে শুধু স্যালাইন ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ানো হয় না। এ ছাড়াও বহু ধরনের কুসংস্কার পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী।

৯। খাদ্যে ভেজাল : ভেজাল খাবার পুষ্টিহীনতা সৃষ্টির একটি অন্যতম উপায়। ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য তাদের নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে খাদ্যে ভেজাল দেয়। সয়াবিন তেলের সাথে পাম তেল, মিশ্রণ, সয়াবিন তেলের পরিবর্তে পোড়া মবিলে খাদ্য ভেজে বিক্রি করে। বিভিন্ন বাতিল রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে জুস বা পানীয় তৈরি করা হয়। ইউরিয়া দিয়ে মুড়ি ভাজা, মাছ, মাংস ও দুধে ফরমালিন, মেশানো, কার্বাইড দিয়ে ফল পাকানো ইত্যাদি। বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল ও দূষিত রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে পুষ্টিমানের চরম ক্ষতি করছে। এতে পুষ্টিহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনসাধারণ বিভিন্ন রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।

১০। প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারণে অনেক সময় অঞ্চল বিশেষে উৎপাদিত সম্পূর্ণ ফসলই নষ্ট হয়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ক্ষতি হয়ে অনেক সময়ে দুর্ভিক্ষে রূপ নেয়। ফলে মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগে।

১১। স্বাস্থ্য পরিচর্যা : স্বাস্থ্য পরিচর্যা হচ্ছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা একটি নির্দিষ্ট এলাকার সদস্যদের নিকট সহজলভ্য করে তোলা। অবশ্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদান ও সুষম খাদ্যবন্টন ও গ্রহণের পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বাস্তবায়ন করা উচিত। নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার, সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা, বাসস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, শিশুর ছয়টি টিকা দান, ও মায়ের দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যবস্থা করা গেলে পুষ্টিহীনতা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

অপুষ্টি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান

অপুষ্টি সমস্যা যেমন একদিনে সৃষ্টি হয় না তেমনি এর সমাধানও একদিনে করা সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ থেকে অপুষ্টি দূর করা সম্ভব। পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য মোটামুটিভাবে যেসব ব্যবস্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব তা নিম্নরূপ–

১. শস্যের বহুমুখীকরণ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের উৎসাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যের সরবরাহ এবং প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়।

২. বসতবাড়িতে হাস-মুরগি ও গবাদী পশু পালন এবং অধিক শাকসবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য সবজি বাগান করা এবং ফলের গাছ লাগানো।

৩. বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে খাদ্য ও পুষ্টি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৪. উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থায়ী প্রদর্শনী ও বীজ উৎপাদন খামার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। যাতে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়।

৫. শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বিভিন্ন পাঠ্যসূচিতে পুষ্টি জ্ঞান ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা।

২০২২

৬. দরিদ্রতা এবং ভূমিহীনতা রোধ করার জন্য একটি জাতীয় ভূমি বন্টন ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করা।

৭. ভূমিহীনদের জন্য কাজের সুযোগ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে তাদের পারিবারিক আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৮. প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে অপ্রচলিত নতুন খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার কর্মসূচি, গ্রহণ করা। যেমন– মাশরুম, কাসাভা ইত্যাদি।

৯. এগ্রোবেসড শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা।

১০.দেশব্যাপী শিশুদের সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা।

১১. পল্লী এলাকায় নিরাপদ পায়খানা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা এবং দরিদ্র লোকের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১২. সরকারি অনুদানের মাধ্যমে সকল স্কুলে ছাত্রদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টিফিনের ব্যবস্থা করা।

১৩. দেশে জরুরি খাদ্য মোকাবেলার জন্য 'খাদ্য ব্যাংক' গঠনের পরিকল্পনা করা।

১৪. জাতীয় পর্যায়ে একটি সঠিক ও উপযুক্ত পুষ্টিনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কৃষির ৪টি উপখাত গুলো কী কী?

২। কোন খাদ্যগুলো কৃত্রিম ঘি এর উৎস?

৩। আখ, বীট, তাল ও খেজুর থেকে কোন খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়?

৪। সমগ্র কৃষি ফসলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

৫। মাঠফসল কাকে বলে?

৬। উদ্যান ফসল কাকে বলে?

৭। উৎপাদন পদ্ধতি ভেদে কৃষি ফসলকে কয়ভাবে ভাগ করা যায় ও কী কী?

৮। রবি ফসল কাকে বলে?

৯। খরিফ-১ ও খরিফ-২ ফসলের মধ্যে পার্থক্য কী?

১০। সিরিস (Ciris) শব্দের অর্থ কী?

১১। কোন জাতীয় ফসলের শিকড়ে Nodule থাকে?

১২। Nodule বা গুটির মধ্যে কী থাকে এবং কী করে?

১৩। আমাদের দেশের তেল ফসলগুলো কী কী?

১৪। আঁশ জাতীয় ফসল কী কী?

১৫। পানীয় ফসল বলতে কী বুঝায়?

১৬। সবুজ সার কাকে বলে?

১৭। ফল ও বাগিচার ফসল কোনগুলো?

১৮। কৃষি বীজ কাকে বলে?

১৯। পুষ্ট বীজ সংরক্ষণের জন্য কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়? এগুলো কী কী?

২০। কোনগুলোকে অপুষ্ট বীজ বলে?

২১। বীজে অবস্থিত অপদ্রব্যগুলো কী কী?

২২। বীজের প্রাথমিক অপদ্রব্য পরিষ্কার করার যন্ত্রের নাম কী?

২৩। বীজের চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার করার যন্ত্রের নাম কী?

২৪। বীজের রং দেখে বিভিন্ন বীজ আলাদা করার যন্ত্রের নাম কী

২৫। খাদ্য ও পুষ্টি বলতে কী বুঝায়?

২৬। এগ্রোবেসড খাদ্য কাকে বলে?

২৭। শরীরের কাজের উপর ভিত্তি করে খাদ্যকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

২৮। দেহবর্ধক খাদ্য কাকে বলে?

২৯। খাদ্যের উপাদান কয়টি ও কী কী?

৩০। শর্করা কত প্রকার ও কী কী?

৩১। সেলুলোজ ও পেকটিনের কাজ কী?

৩২। অতিরিক্ত শর্করা শরীরে কী হিসেবে জমা থাকে?

৩৩। দেহকে কিটোসিস নামক রোগ থেকে রক্ষা করে খাদ্যের কোন উপাদান?

৩৪। কেন প্রোটিনকে জীবকোষের প্রাণ বলা হয়?

৩৫। আমিষের প্রথম এবং প্রধান কাজ কী?

৩৬। খাদ্য পরিপাকের জন্য প্রোটিন থেকে উৎপন্ন এনজাইমগুলো কী কী?

৩৭। রক্তে অক্সিজেন পৌঁছে দেয় কোন আমিষ?

৩৮। কিসের অভাবে শরীরে শ্বেত রোগ (Edema) হয়?

৩৯। সবচেয়ে বেশি তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে কোন খাদ্য?

৪০। খাদ্য সুস্বাদু ও মুখরোচক হয় কীভাবে?

৪১। দেহে শতকরা কত ভাগ জৈব ও অজৈব পদার্থ আছে?

৪২। শরীরে যে সকল খনিজ বেশি ও কম লাগে তাদের কী বলে?

৪৩। শরীরে লৌহের কাজ কী?

৪৪। গর্ভবতী মায়ের জন্য আয়োডিন কেন প্রয়োজন?

৪৫। অম্ল জাতীয় লবণ কোনগুলো?

২০২২

৪৬। ভিটামিন কত প্রকার ও কী কী?

৪৭। ভিটামিন-এর এর প্রধান কাজ কী?

৪৮। রিকেট ও অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ প্রতিরোধ করে কোন ভিটামিন?

৪৯। ভিটামিন 'কে'-এর কাজ কী?

৫০। কয় প্রকার ভিটামিনকে একত্রে ভিটা. বি কমপ্লেক্স বলা হয়?

৫১। ভিটামিন বি১ এর কাজ কী?

৫২। ভিটামিন বি১ ও বি২ এর অপর নাম কী কী?

৫৩। ভিটামিন বি১২ এর কাজ কী?

৫৪। কোলেজন নামক আমিষ তৈরি করে কোন ভিটামিন?

৫৫। মানব দেহে কত ভাগ পানি থাকে?

৫৬। সুষম খাদ্য বলতে কী বুঝায়?

৫৭। দৈনিক মোট ক্যালরির কতভাগ শর্করা, স্নেহ ও আমিষ থেকে গ্রহণ করা উচিত?

৫৮। শিশুর ৫ মাস বয়স পর্যন্ত পুষ্টি চাহিদা কোন খাদ্য মিটিয়ে থাকে?

৫৯। পূর্ণ বয়স্ক লোকের দৈনিক কত ক্যালরি প্রয়োজন?

৬০। গর্ভবতী মহিলার দৈনিক কত ক্যালরি প্রয়োজন?

৬১। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ শিশুর মৃত্যুর কারণ কি?

৬২। শতকরা কতভাগ মহিলা ও শিশু লৌহ ও রক্তস্বল্পতায় ভুগছে?

৬৩। অপুষ্টির ক্ষেত্রে স্টান্টিং, ওয়েস্টিং ও আন্ডার ওয়েট বলতে কী বুঝায়?

৬৪। ভিটামিন-'এ' র এর অভাবে বছরে কত শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

৬৫। অনুপুষ্টি বলতে কী বুঝায়?

৬৬। বাংলাদেশে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

৬৭। দৈনিক একজন মানুষের কত গ্রাম আমিষ খাওয়া প্রয়োজন?

৬৮। দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বসবাস করে?

৬৯। প্রতি বছর কত হেক্টর জমি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে?

৭০। গুঁড়া দুধের সাথে কী যোগ করে পুষ্টিমান উন্নয়ন করা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের পার্থক্য লিখ।

২। সেচ প্রাপ্ত ফসল বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দাও।

৩। ব্যবহার ভেদে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিন্যাসের নাম লিখ।

২০২২ ৪। পুষ্ট, অপুষ্ট ও অপদ্রব্যসমূহের পরিষ্কার কয়টি ধাপে করা হয় ও তা কী কী?

৫। খাদ্য, পুষ্টি ও এগ্রোবেসড খাদ্য কাকে বলে?

৬। শক্তি বর্ধক খাদ্য কী? উদাহরণ দাও।

৭। শ্বেতসার বা শর্করার কাজ কী?

৮। আমিষের কাজ কী?

৯। দেহের প্রয়োজনীয় খনিজ লবনগুলো কী কী? নাম লেখ।

১০। ক্যালসিয়াম, লৌহ ও আয়োডিনের ২টি করে কাজের নাম লেখ।

১১। ভিটামিন- এ, ডি, ই ও কে এর ২টি করে কাজের নাম লেখ।

১২। ভিটামিন- বি১ ও বি২ এর কাজ ও উৎস লেখ।

১৩। ভিটামিন- সি এর কাজ ও উৎস লেখ।

১৪। সুষম খাদ্য তৈরির শর্তগুলো লেখ।

১৫। পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক খাদ্য তালিকা লেখ।

১৬। শিশু ও মায়ের অপুষ্টির বিদ্যমান কারণগুলো কী কী?

১৭। পুষ্টিহীনতার কারণগুলো কী কী?

১৮। 'পুষ্টিহীনতা সৃষ্টির একটি অন্যতম উপায় খাদ্যে ভেজাল' ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। সংক্ষেপে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২। বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কী? বীজ পরিষ্কারকরণের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।

৩। খাদ্যকে যে তিন ভাগে ভাগ করা যায় উদাহরণসহ তা বর্ণনা কর।

৪। আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য উপাদানের কাজ ও উৎস লেখ।

৫। ভিটামিন- এ, ডি, ই ও কে এর কাজ ও উৎস বর্ণনা কর।

৬। ভিটামিন- বি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ভিটামিনের কাজ ও উৎস লেখ।

৭। সুষম খাদ্য কী? এ খাদ্য তৈরির শর্ত ও উদাহরণ দাও।

৮। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার আলাদা আলাদা খাদ্য তালিকা লেখ।

৯। দেশের প্রধান পুষ্টি সমস্যা ও সম্ভাব্য কারণের একটি ছক তৈরি কর।

১০। পুষ্টি সমস্যার কারণগুলো কী কী? বর্ণনা কর।

১১। অপুষ্টি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলো বর্ণনা কর।

অধ্যায় ২

ধানের পুষ্টি, জাত, ব্যবহার, সংরক্ষণ, সিদ্ধকরণ ও মিলিং

ভূমিকা: দেশে যে কয়টি দানাশস্য উৎপাদন হয় তার মধ্যে ধান হচ্ছে প্রধান খাদ্যশস্য। পৃথিবীর মধ্যে এটি দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। সারা বিশ্বে ধান উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলো হচ্ছে- চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, ভুটান, কেনিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, নেপাল, জাপান, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয় (BBS ২০১৭)।

২.১ ধানের সংজ্ঞা :

ধান একটি তণ্ডুল বা দানা জাতীয় ফসলের পরিপক্ব ডিম্বাশয়। এটি বীজ নয় বরং একে ক্যারিঅপসিস জাতীয় ফল বলে। এটি গ্রামীনি বা পোয়েসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় গাছের ফলে একটি বীজ থাকে বলে একে বীজ হিসেবেই ধরা হয়।

চাল : ধানের খোসা ছাড়ানোর পর যে অংশ পাওয়া যায় তাকে চাউল বা চাল বলে। ধানের তিন ভাগের এক ভাগ খোসা ও বাকি দুই ভাগ চাল। চালে ৭৯% শর্করা, ৬.৪% আমিষ ও ০.৪% স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকে।

ধানের বৈশিষ্ট্য : ধানের বৈজ্ঞানিক নাম অরাইজা স্যাটাইভা (Oryza Sativa)। এর কাণ্ড নরম, এর পাতা ফলক ও খোল দুইটি অংশে বিভক্ত। পত্র ফলকের গোড়ায় অরিকল থাকে, শিকড় গুচ্ছমূল এটা একবীজপত্রী ও সস্যল (Albuminious)। এর তিনটি উপজাত রয়েছে। যেমন–

(ক) ইন্ডিকা : এ ধান গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেমন– বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটান জন্মে। ভাত ঝরঝরে হয়।

(খ) জাপানিকা : এ ধানের গাছ খাটো ভাত আঠালো হয়। তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া ও জাপানে এ ধান জন্মে।

(গ) জাভানিকা : এ ধানের কুঁশি কম তাই ফলন কম, ইন্দোনেশিয়াতে জন্মে। মৌসুম ভেদে আমাদের দেশে তিন ধরনের ধান জন্মে হয়ে থাক। যেমন-

(ক) আউশ ধান : এ ধান আবাদের সময় ১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই মে (চৈত্র-বৈশাখ) এবং ধান কাটার সময় ১৫ই জুন থেকে ১৫ই আগস্ট (আষাঢ়-শ্রাবণ)। এ ধান আবাদে কম সময় লাগে।

চিত্রঃ ধান গাছ

(খ) আমন ধান : এ ধানের চারা রোপণের সময় ১৫ই জুন থেকে ১৫ই আগস্ট (আষাঢ়-ভাদ্র) এবং ধান কাটার সময় ১৫ই অক্টোবর-১৫ই জানুয়ারি (কার্তিক-পৌষ)। ধান আবাদে বেশি সময় লাগে।

(গ) বোরো ধান : এ ধানের বপনের সময় ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি (পৌষ-মাঘ) এবং ধান কাটার সময় ১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই মে (চৈত্র-বৈশাখ)। এটি আবাদে মাধ্যম সময় লাগে।

২.২ ধানের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য ও গড় ফলন :

১৯৭০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক (ব্রি) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল (উফশী) ধানের জাত, মৌসুম, গড় উচ্চতা, গড় জীবনকাল, জাতের বৈশিষ্ট্য, গড় ফলন ও অবমুক্তের বছর নিম্নের ছকে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	ধানের জাত	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন)-১	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন/হেক্টর)	বছর (অবমুক্ত)
১.	বি. আর- ১ (চান্দিনা)	বোরো আউশ	৮৮ ৮৮	১৫০ ১২০	চাল খাটো, মোটা	৫.৫ ৪.০	১৯৭০
২.	বি. আর- ২ (মালা)	বোরা আউম	১২০ ১২০	১৬০ ১২৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.০ ৪.০	১৯৭১
৩.	বি. আর- ৩ (বিপ্লব)	বোরা আউশ আমন	৯৫ ১০০ ১০০	১৭০ ১৩০ ১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে সাদা দাগ আছে	৬.৫ ৪.০ ৪.০	১৯৭৩
৪.	বি.আর- ৪ (ব্রিশাইল)	আমন	১২৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৭৫
৫.	বি.আর- ৫ (দুলাভোগ)	আমন	১২০	১৫০	চাল ছোট, গোলাকৃত ও সুগন্ধি	৩.০	১৯৭৬
৬.	বি.আর- ৬	বোরো আউশ	১০০ ১১৩	১৪০ ১১০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৪.৫ ৩.৫	১৯৭৭
৭.	বি.আর-৭ (ব্রি বালাম)	বোরো আউশ	১২৫ ১২৫	১৫৫ ১৩০	চাল লম্বা, চিকন	৪.৫ ৩.৫	১৯৭৭
৮.	বি.আর- ৮ (আশা)	বোরা আউশ	১২৫ ১২৫	১৬০ ১২৫	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে দাগ আছে এবং শিলাবৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী	৬.০ ৫.০	১৯৭৮
৯.	বি.আর- ৯ (সুফলা)	বোরো আউশ	১২৫ ১২৫	১৫৫ ১২০	চাল লম্বা, মাঝারি মোটা ও সাদা এবং শিলাবৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী	৬.০ ৫.০	১৯৭৮
১০.	বি. আর- ১০ (প্রগতি)	আমন	১১৫	১৫০	চাল মাঝারি চিকন	৫.৫	১৯৮০
১১.	বি.আর- ১১ (মুক্তা)	আমন	১১৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা	৫.৫	১৯৮০
১২.	বি.আর- ১২ (ময়না)	বোরো আউশ	১০৫ ১০৫	১৭০ ১৩০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.৫ ৪.৫	১৯৮৩
১৩.	বি.আর- ১৪ (গাজী)	বোরো আউশ	১২০ ১২০	১৬০ ১২০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৬.০ ৫.০	১৯৮৩
১৪.	বি.আর- ১৫ মোহিনী	বোরো আউশ	৯০ ১০০	১৬৫ ১২৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.৫ ৫.০	১৯৮৩
১৫.	বি.আর- ১৬ (শাহীবালাম)	বোরো আউশ	৯০ ১১০	১৬৫ ১৩০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৬.০ ৫.০	১৯৮৩

২০২২

১৬.	বি.আর- ১৭ (হাসি)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল মাঝারি মোটা এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫
১৭.	বি.আর- ১৮ (শাহজালাল)	বোরো	১১৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা, সাধা ও হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫
১৮.	বি.আর- ১৯ (মঙ্গল)	বোরো	১১০	১৭০	চাল মাঝারি মোটা এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫
১৯.	বি.আর- ২০ (নিজামী)*	আউশ	১২০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপনযোগ্য	৩.৫	১৯৮৬
২০.	বি.আর- ২১ (নিয়ামত)*	আউশ	১০০	১১০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপনযাগ্য	৩.০	১৯৮৬
২১.	বি-আর- ২২ (কিরণ)**	আমন	১২৫	১৫০	চাল খাটো, মোটা ও সাদা এবং নাবি জাত	৫.০	১৯৮৮
২২.	বি.আর- ২৩ (দিশারী)**	আমন	১২০	১৫০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবি জাত	৫.৫	১৯৮৮
২৩.	বি.আর- ২৪ (রহমত)*	আউশ	১০৫	১০৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপনযোগ্য	৩.৫	১৯৯২
২৪.	বি.আর- ২৫ (নায়াপাজাম)	আমন	১৩৮	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা	৪.৫	১৯৯২
২৫.	বি.আর- ২৬ (শ্রাবণী)	আউশ	১১৫	১১৫	চাল চিকন, লম্বা ও সাদা এবং অ্যামাইলোজ কম	৪.০	১৯৯৩
২৬.	ব্রি ধান- ২৭	আউশ	১৪০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা এবং বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী	৪.০	১৯৯৪
২৭.	ব্রি ধান- ২৮	বোরো	৯০	১৪০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৬.০	১৯৯৪
২৮.	ব্রি ধান- ২৯	বোরো	৯৫	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৭.৫	১৯৯৪
২৯.	ব্রি ধান- ৩০	আমন	১২০	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
৩০.	ব্রি ধান- ৩১	আমন	১১৫	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
৩১.	ব্রি ধান- ৩২	আমন	১২০	১৩০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
৩২.	ব্রি ধান- ৩৩	আমন	১০০	১১৮	চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে এবং আগাম জাত	৪.৫	১৯৯৭
৩৩.	ব্রি ধান- ৩৪	আমন	১১৭	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৭
৩৪.	ব্রি ধান- ৩৫	বোরো	১০৫	১৫৫	চাল খাটো, মোটা এবং বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী	৫.০	১৯৯৮
৩৫.	ব্রি ধান- ৩৬	বোরো	৯০	১৪০	চাল লম্বা, চিক এবং ঠাণ্ডা সহিষ্ণু	৫.০	১৯৯৮
৩৬.	ব্রি ধান- ৩৭	আমন	১২৫	১৪০	চাল মাঝারি, চিকন ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৮
৩৭.	ব্রি ধান- ৩৮	আমন	১২৫	১৪০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৮
৩৮.	ব্রি ধান- ৩৯	আমন	১০৬	১২২	চাল লম্বা ও চিকন	৪.৫	১৯৯৯
৩৯.	ব্রি ধান- ৪০	আমন	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং লবণ সহনশীল	৪.৫	২০০৩
৪০.	ব্রি ধান- ৪১	আমন	১১৫	১৪৮	চাল লম্বাটে মোটা এবং লবণ সহনশীল	৪.৫	২০০৩
৪১.	ব্রিধান- ৪২***	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি, সাদা ও খরা সহিষ্ণু	৩.৫	২০০৪
৪২.	ব্রি ধান-৪৩***	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি, সাদা এবং খরা সহিষ্ণু	৩.৫	২০০৪
৪৩.	ব্রি ধান- ৪৪	আমন	১৩০	১৪৫	চাল মোটা এবং উপকূলীয় অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী	৫.৫	২০০৫
৪৪.	ব্রি ধান- ৪৫	বোরো	১০০	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৬.৫	২০০৫

৪৫.	ব্রি ধান- ৪৬**	আমন	১০৫	১৫০	চাল মাঝারি মোটা, নাবি জাত ১৫ সেপ্টে: পর্যন্ত রোপণযোগ্য	৪.৭	২০০৭
৪৬.	ব্রি ধান- ৪৭	বোরো	১০৫	১৫২	চাল মাঝারি মোটা, চারা অবস্থায় লবণ সহনশীলতা ১২-১৪ ডিএস/মিটার এবং বাকি জীবনকাল ৬ ডিএস/মিটার	৬.০	২০০৭
৪৭.	ব্রি ধান- ৪৮	আউশ	১০৫	১১০	চাল মাঝারি মোটা, ভাত ঝরঝরে	৫.৫	২০০৮
৪৮.	ব্রি ধান- ৪৯	আমন	১০০	১৩৫	চাল মাঝারি চিকন, নাইজার-শাইলের মতো এবং বিআর ১১ থেকে ৭ দিন আগাম	৫.৫	২০০৮
৪৯.	ব্রি ধান- ৫০ (বাংলামতি)	বোরো	৮২	১৫৫	চাল লম্বা, চিকন, সুগন্ধি ও সাদা	৬.০	২০০৮
৫০.	ব্রি ধান- ৫১	আমন	৯০	১৪২	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা (জলমগ্ন না হলে)	৪.৫	২০১০
				১৫৪	(১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)		
৫১.	ব্রি ধান- ৫২	আমন	১১৬	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা (জলমগ্ন না হলে)	৫.০	২০১০
				১৫৫	(১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)		
৫২.	ব্রি ধান- ৫৩	আমন	১০৫	১২৫	চাল মাঝারি চিকন, চারা ও	৪.৫	২০১০
					প্রজনন অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মিটার পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল		
৫৩.	ব্রি ধান- ৫৪	আমন	১১৫	১৩৫	চাল মাঝারি চিকন, চারা ও প্রজনন অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মিটার পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০১০
৫৪.	ব্রি ধান- ৫৫	বোরো	১০০	১৪৫	চাল চিকন ও লম্বা, মধ্যম মানের	৭.০	২০১১
		আউশ	১০০	১০৫	লবণাক্ততা, খরা ও ঠাণ্ডা সহনশীল	৫.০	
৫৫.	ব্রি ধান- ৫৬	আউশ	১১৫	১১০	চাল লম্বা, মোটা ও রঙ সাদা এবং খরা সহনশীল, প্রজনন পর্যায়ে ১৪-২১ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না	৪.৫	২০১১
৫৬.	ব্রি ধান- ৫৭	আমন	১১৫	১০৫	লম্বা, সরু চাল এবং খরা পরিহারকারী, প্রজনন পর্যায়ে ১০-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না	৪.০	২০১১
৫৭.	ব্রি ধান- ৫৮	আমন	১০০	১৫৫	চাল অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মতো, তবে সামান্য চিকন	৭.২	২০১২
৫৮.	ব্রি ধান- ৫৯	বোরো	৮৩	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগ পাতা খাঁড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না	৭.১	২০১৩
৫৯.	ব্রি ধান- ৬০	বোরো	৯৮	১৫১	চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা	৭.৩	২০১৩
৬০.	ব্রি ধান- ৬১	বোরো	৯৬	১৫০	চাল মাঝারি সরু, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল	৬.৩	২০১৩
৬১.	ব্রি ধান- ৬২	আমন	১০২	১০০	চাল লম্বা, সরু এবং সাদা, মাধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ আগাম জাত	৪.৫	২০১৩
৬২.	ব্রি ধান- ৬৩	বোরো	৮৬	১৪৮	চাল বাসমতির মতো চিকন ও লম্বা	৭.০	২০১৪
৬৩.	ব্রি ধান- ৬৪	বোরো	১১০	১৫২	চাল মাঝারি মোটা সাদা এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ (২৪ মিলিগ্রাম/কেজি)	৬.৫	২০১৪

২০২২

৬৪.	ব্রি ধান- ৬৫	আউশ	৮৮	৯৯	চাল মাঝারি চিকন, সাদা, ডিগপাতা খাঁড়া এবং গাছ ছোট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না ও খরা সহিষ্ণু	৩.৫	২০১৪
৬৫.	ব্রি ধান- ৬৬	আমন	১২০	১১৩	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	৪.৫	২০১৪
৬৬.	ব্রি ধান- ৬৭	বোরো	১০০	১৪৩	চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটর মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৬.০	২০১৪
৬৭.	ব্রি ধান- ৬৮	বোরো	৯৭	১৪৯	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ধান পাকার সময় ডিগ পাতা সবুজ থাকে	৭.৩	২০১৪
৬৮.	ব্রি ধান- ৬৯	বোরো	১০৫	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ডিগপাতা খাঁড়া প্রশস্ত ও লম্বা এবং উপকরণ সাশ্রয়ী জাত	৭.৩	২০১৪
৬৯.	ব্রি ধান- ৭০	আমন	১২৫	১৩০	দানা লম্বা, সরু ও সুগন্ধ যুক্ত এবং অগ্রভাগে রঙিন শুঙ আছে	৫.০	২০১৫
৭০.	ব্রি ধান- ৭১	আমন	১০৮	১১৫	খরা সহনশীল এবং ২১ দিন বৃষ্টি না হলেও হেক্টরপ্রতি ৩.৫.৪.০ টন ফলন দিতে সক্ষম	৫.৫	২০১৫
৭১.	ব্রি ধান- ৭২	আমন	১১৫	১৩০	লম্বাটে মোটা দানা ও জিঙ্ক, সমৃদ্ধ (২২.৮ মিলি গ্রাম/কেজি) এবং উপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টরপ্রতি ৭.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম	৬.০	২০১৫
৭২.	ব্রি ধান- ৭৩	আমন	১২০	১২৫	সমগ্র জীবনকালে লবণ সহনশীলতার মাত্রা ৮ ডিএস/মিটার এবং লবণাক্ততার মাত্রা কম হলে হেক্টরপ্রতি ৬.১ টন ফলন দেয়	৪.৫	২০১৫
৭৩.	ব্রি হাইব্রিড ধান- ১	বোরো	১১০	১৫৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা	৮.৫	২০০১
৭৪.	ব্রি হাইব্রিড ধান- ২	বোরো	১০৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	৮.০	২০০৮
৭৫.	ব্রি হাইব্রিড ধান- ৩	বোরো	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	৯.০	২০০৯
৭৬.	ব্রি হাইব্রিড ধান- ৪	আমন	১১২	১১৮	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা	৬.৫	২০১০

১ জীবনকাল বপনের সময়ের ওপর নির্ভর করে কম-বেশি হয়।

* বৃষ্টিবহুল এলাকার উপযোগী।

** আলোক-সংবেদনশীল।

*** ব্রি ধান ৪২ এবং ব্রি ধান ৪৩ বৃষ্টিবহুল এবং খরা প্রবণ উভয় অঞ্চলের উপযোগী।

সূত্র:- কৃষি ডায়েরি- ২০১৬ ইং

২০২২

২.৩ ধানের বিভিন্ন অংশ ও পুষ্টিমান :

ধানের বিভিন্ন অংশ নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১) তুষ (Husk) : এটি ধানের বহিরাবরণ। ধানের দুইটি বন্ধ্যা গ্লুম, লেমা ও প্যালিয়া একত্রে মিলে তুষ তৈরি হয়। ধানের বহিরাবরণ বা খোসা ছেটে তুষ বের করে নিলে লাল আবরণসহ চালের দানা পাওয়া যায়। তুষ মানুষের ভক্ষণযোগ্য নয়।

২) কুঁড়া (Bran) : চালের বহিরাবরণকে কুঁড়া বলে। ধানের তুষ বের করে নেওয়ার পর চাল বা দানার উপরের লাল ও খুবই পাতলা আবরণ ছাঁটাই করলে তা কুঁড়া হয়ে বেরিয়ে আসে। এই আবরণ সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। এই আবরণসহ চাল খেলে সেলুলোজের জন্য শরীরে খাদ্য থেকে পুষ্টি শোষণে বাধা ঘটে। সেজন্য কুঁড়া ছেটে বাদ দেওয়া হয়।

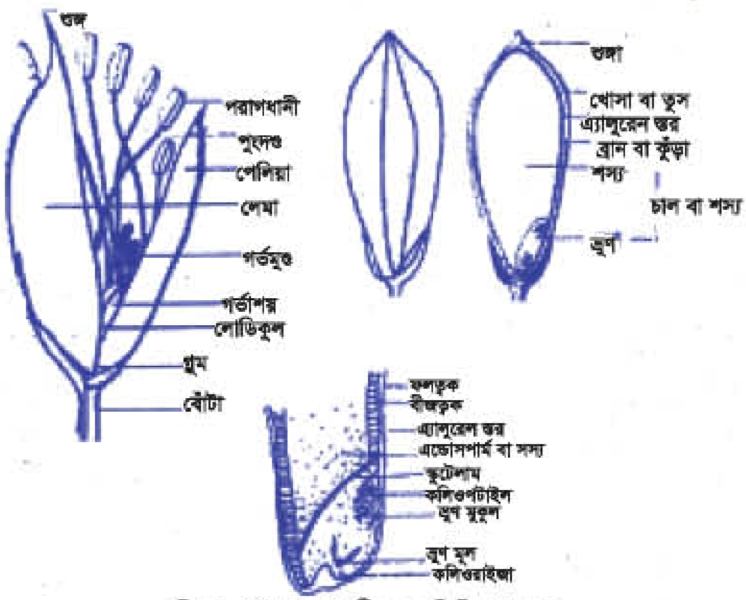

চিত্র : ধানফুল ও বীজের বিভিন্ন অংশ

(৩) অ্যালুরেন স্তর : তুষ ও কুঁড়া বের করে নেওয়ার পরও চালের উপর হালকা বাদামি রঙের গুঁড়ার মতো যে স্তরটি থাকে তাকে অ্যালুরেন স্তর বলে। এই স্তরের জন্য চাল আকাড়া থাকে। আকাড়া চাল সহজে শোষিত হয় না। অ্যালুরেন স্তরে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ থাকে। ঢেঁকিতে চাল ভাঙ্গালে চালের উপর এই স্তর থেকে যায়। কিন্তু মেশিনে ধান ছাঁটাই করলে অ্যালুরেন স্তর আলাদা হয়ে চাল সাদা ও মসৃণ হয়। অ্যালুরেন স্তর আলাদা হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে চালের ভিটামিন ও প্রোটিন কমে যায়।

(৪) শস্য (Endosperm) : ধানের মূল দানাই হচ্ছে শস্য বা এন্ডোসপার্ম। এটি ধানের ৭৫ ভাগ অংশ। চালের দানার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ হচ্ছে ৭৭-৭৯% শ্বেতসার। এন্ডোসপার্মের প্রান্তদেশে আয়োডিন, প্রোটিন এবং সামান্য লৌহ থাকে।

(৫) ভ্রূণ (Embryo) : চালের দানার নিম্ন প্রান্তে অর্থাৎ বোঁটার দিকের প্রান্তে অবস্থিত ভ্রূণ খাদ্য উপাদানে সমৃদ্ধ। ভ্রূণে ভিটামিন-ই, রিবোফ্লেভিন, থায়ামিন, নায়াসিন, লৌহ এবং স্নেহ পদার্থ থাকে।

চালের পুষ্টিমান : চালের পুষ্টি উপাদানের মধ্যে বেশিরভাগই শ্বেতসার যা চালের ভিতরের দিকে বা সস্যল অংশে থাকে। কিন্তু চর্বি, আঁশ এবং খনিজ লবণ থাকে দানার বাহিরের দিকে। চালে আমিষের ভাগ গম বা ভুট্টা থেকে কম থাকে। কলে ছাঁটা ও ঢেঁকি ছাঁটা চালের পুষ্টিমান নিম্নে দেওয়া হলো–

সারণি : চালের পুষ্টিমান (শতকরা হারে)

চাল ও তুষ	প্রোটিন	চর্বি	আঁশ	ছাই	নাইট্রোজেনযুক্ত নির্যাস
ঢেঁকি ছাঁটা চাল	৬.৫-১৬	১.৭-৩.৫	০.২-২.৬	১.২	৭৭.২-৮৭.২
কলে ছাঁটা চাল	৭.৬	০.৫	০.২	০.৫	৯১.৫
তুষ	১৫.৫	২০.০	১২.৫	১২	৪৬.৫

সারণি : চালের খনিজ পুষ্টিমান (মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম)

ক্রমিক নং	খনিজ উপাদান	ঢেঁকি ছাঁটা চাল (কুঁড়াসহ)	কলে ছাঁটা চাল	কুঁড়াসহ তুস
১.	অ্যালুমিনিয়াম	৩০	০.০৭	৫-৪০
২.	ক্যালসিয়াম	১০-১৮	৪.৬	৫৭-৭৮
৩.	ক্লোরিন	-	২০-৩৮	১-৯৭
৪.	লৌহ	৩-৩৪	০.৫-২০.৭	১৪-৩২
৫.	ম্যাগনেসিয়াম	৪৭-১২০	২৩-৩৭	৯৮০-১২৩০
৬.	ফসফরাস	১০৪-৩১৫	৮৮-১১৮	২৪৭৬-২৬৬৮৯
৭.	পটাশিয়াম	২৩৮	৬৪-১০১	১৭৭০-২২৭০
৮.	সিলিকন	৩২-২১২	১১-১৮	১২০০-১৬৩০
৯.	সোডিয়াম	২০	৭.২	৩৫-৪৬

চালে আমিষের পরিমাণ শতকরা গড়ে ৭.৫ ভাগ এবং চালের আমিষের জৈবিক মান কম-বেশি ৬৮ ভাগ। অর্থাৎ চালে যে আমিষ থাকে দেহ তার ৬৮ ভাগ কাজে লাগাতে পারে। চালে ১৭টি অ্যামাইনো এসিড থাকে। এর মধ্যে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড-গুলো হলো- আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, ফিনাইল- এলানিন, মেথিওনিন, থায়ামিন, ট্রিপ্টোফেন, ও ভ্যালিন। শর্করা ও আমিষ ছাড়াও চাল 'বি' পরিবারের কয়েকটি ভিটামিন যথা- 'বি১' (থায়ামিন), বি২ (রিবোফ্লেভিন), নায়াসিন ও ফলিক এসিড এবং লৌহের ভালো উৎস। ধানের বিভিন্ন অংশে উক্ত চারটি ভিটামিন ও লৌহের পরিমাণ দেখানো হলো–

সারণি : ধানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভিটামিন ও লৌহের পরিমাণ (মিলিগ্রামে/১০০ গ্রাম)

ক্রমিক নং	পুষ্টির উপাদান	খোসামুক্ত ধান	কুঁড়া	চালাবরণ	ভ্রূণ
১.	থায়ামিন	০.২১-০.৪৫	১.০-২.৮	০.৩৬-৩.০	৪.৫-৭.৬
২.	রিবোফ্লোভিন	০.০৩-০.০৮	০.২০-০.৩৪	০.১৪-০.৩৪	০.২৭-০.৫০
৩.	নায়াসিন	৪.৪-৬.৫	২৪.০-৪০.৯	২২.৮-৩৮.৫	১.৫-৯.৯
৪.	ফলিক এসিড	০.০২-০.০৬	০.১৩-০.১৫	০.০৪-০.১৯	০.০৯-০.৪
৫.	লৌহ	০.৬৮-৪.৬	১৩.০-৫৩.০	১০.২-২৮.০	১১.০-৪৯.০

ধানের পুষ্টি অপচয় : যে প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে ধান কলে ছেটে চাল তৈরি ও চাল থেকে ভাত, রান্না করা হয় তাতে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজের প্রায় সবটুকুই নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য আমাদের দেশের লোকজন পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ঢেঁকিতে ছাঁটা চাল পুষ্টির দিক দিয়ে উন্নত কিন্তু শ্রমসাধ্য বিধায় কৃষকেরা ধান ঢেঁকিতে না ভেঙে কলে ভাঙাতে ইচ্ছুক। কলে ও ঢেঁকিতে ভাঙানো সিদ্ধ ও আতপ চালে প্রাপ্য তিনটি ভিটামিন ও লৌহের পরিমাণ নিচের সারণীতে দেখানো হলো।

সারণি : আতপ ও সিদ্ধ ধান থেকে কলে ও ঢেঁকিতে ভাঙানো চালে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান (মিলিগ্রাম ১০০ গ্রামে)

ক্রমিক নং	**চালের প্রকার**	**থায়ামিন**	**রিবোফ্লোভিন**	**নায়াসিন**	**লৌহ**
১.	আতপ (ঢেঁকিছাঁটা)	০.১০	০.০৪	৩.৫	৩.২
২.	সিদ্ধ (ঢেঁকিছাঁটা)	০.৩২	০.০৭	৫.২	২.৮
৩.	আতপ (কলেছাঁটা)	০.০৯	০.০১	২.৫	৩.১
৪.	সিদ্ধ (কলেছাঁটা)	০.২৫	০.০৬	৩.৭	৪.০

২.৪ ধানের ব্যবহার বিধি :

ভাত বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য চাল। বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, জাপান, বার্মা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। বাংলাদেশের মানুষ ৫ ঃ ১ অনুপাতে ভাতের সাথে শাকসবজি খায়। আমাদের দেশের মানুষ তার দেহের প্রয়োজনীয় তাপশক্তির শতকরা ৭৫-৮৩ ভাগ পায় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য থেকে। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ৮০ ভাগই হল ধান বা চাল। ধান বা চাল থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য ও শৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করা যায়। যেমন–

(ক) মানুষের খাদ্যদ্রব্য

১) ভাত
২) চিড়া
৩) খৈ, খৈ এর মোয়া ও মুড়কি
৪) মোয়া ও মুড়কি ২০২২

৫) নাড়ু
৬) জাউ ভাত
৭) পোলাও ও বিরিয়ানি
৮) খিচুড়ি
৯) মুড়ি, মিষ্টিমুড়ি ও ঝালমুড়ি।
১০) ফ্রায়েড রাইস
১১) পায়েস ও ক্ষীর
১২) স্যুপ ও মাড় বা ফেন
১৩) চালের আটা বা গুঁড়ি (রুটি তৈরি ও বিভিন্ন পিঠা ও তৈরির জন্য)
১৪) চালের গুঁড়ি থেকে বড়া, নিমকি ও পাপড়
১৫) ভাতের মাদক
১৬) বেগুনি তৈরিতে চালের আটা
১৭) চিপস তৈরি
১৮) চাল ভেজে ছাতু
১৯) বেকারিতে বিভিন্ন খাদ্যে চালের গুঁড়ি ব্যবহার
২০) ওরসালাইন তৈরিতে
২১) ভাতের পাপড় ইত্যাদি

(খ) পশু/পাখির খাদ্য :

১) ধানের কুঁড়া
২) ভাঙা চাল
৩) ধানের খড়

২.৫ ধান সংরক্ষণ পদ্ধতি :

ধান ফসল আবাদের পর কর্তন, সংগ্রহ ও গুদামজাত করা হয়। এ ধান ও চাল অনেকদিন ধরে অর্থাৎ পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত খাওয়া হয়। কোনো কোনো সময় বিশেষ জাতীয় প্রয়োজনে ধান সংরক্ষণ করা হয়। যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, খরা ইত্যাদি সময় যাতে খাদ্যাভাব দেখা না যায়।

ধান কর্তনের পরের দিন থেকে এর গুণাগুণ ও পরিমাণ কমতে থাকে। গুদামজাত করার পর থেকে গুদামে দানার ক্ষতি ২-৬ ভাগ পর্যন্ত থেকে পারে। ধান সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গুদামজাত অবস্থায় ফসলের গুণাগুণ ও পরিমাণ সঠিকভাবে বজায় রাখা। এছাড়াও অমৌসুমে ধান পাওয়া যায় এবং এর অপচয় কম হয়। গুদামে ধান তিন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত থেকে পারে। যেমন-

ক) যান্ত্রিক কারণ
খ) জৈবিক কারণ
গ) জৈব-রাসায়নিক কারণ

যান্ত্রিক কারণ : ধান কর্তনের ফলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নাড়াচাড়ার ফলে ধানবীজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধান বীজে আর্দ্রতার পরিবর্তন হলে বীজ সংকুচিত হয়ে যায়। এজন্য গুদামঘরের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সুষ্ঠুভাবে ধান সংরক্ষণের জন্য বীজে ১২-১৪ ভাগ আর্দ্রতায় আনা হয়।

জৈবিক কারণ : বিভিন্ন অনুজীব বিশেষ করে ছত্রাক এবং গুদামজাত ক্ষতিকর পোকামাকড় বীজের গুণাগুণ নষ্ট করে। এজন্য গুদামের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। অধিকাংশ অনুজীবের ও পোকার বৃদ্ধির জন্য ৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা জরুরি। গুদামের সবচেয়ে ক্ষতিকরক পোকা হচ্ছে বিটল ও মথ। এছাড়া ইঁদুর ও পাখি অনেক সময় গুদামে ঢুকে সংরক্ষিত ধানের ক্ষতি করে।

জৈব রাসায়নিক কারণ : ধানবীজ একটি জীবন্ত শস্যদানা। গুদামের মধ্যেও এর ভ্রূণের শ্বসন ক্রিয়া চলতে থাকে। ফলে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। তাই ধানবীজ নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য এই জলীয় বাষ্প ও তাপ বের করা খুবই প্রয়োজন।

গুদামঘরের প্রকারভেদ : বিভিন্নভাবে ধানবীজ গুদামে সংরক্ষণ করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ-

ক) **খামারবাড়িতে সংরক্ষণ :** খাবার চাহিদা মেটানোর জন্য ধানবীজ বা শস্যদানা খামারের ভিতরেই গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য যে পাত্র ব্যবহার করা হয় তা হল-চটের বস্তা, কাঠের বাক্স, বাঁশের ঝুড়ি বা ডোল ও ড্রাম।

খ) **ফসলের গোলা :** দীর্ঘসময় ধরে ধান গুদামজাত করার জন্য ছোট আকারের কাঠামো তৈরি করা হয়। যেমন- কাঠ, বাঁশ, ধাতব শিট বা সিমেন্টের ঢালাই ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত গোলা।

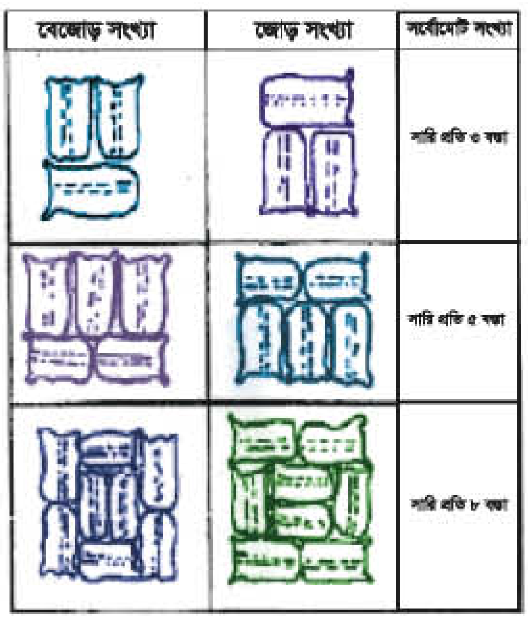

চিত্র : গুদামে ধানের বস্তা বসানোর পদ্ধতি

গ) **পাকা গুদাম :** এ ক্ষেত্রে সাধারণত চালের মিলে এবং সরকারি সংস্থায় পাকা গুদাম ব্যবহার করে গুদামজাত করা হয়। ধানবীজকে বস্তায় ভরে গুদামে সারি করে স্তরে স্তরে সাজানো হয়। গুদামে ধানবীজের বস্তা ভিন্ন সারিতে সাজানো যেতে পারে। ফসলের দানা শস্যের বস্তা সাজানোর পদ্ধতি চিত্রে দেখানো হলো। এ ধরনের গুদামের মেঝে দেয়াল ও ছাদ পাকা করা হয় এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধক করা হয়।

ঘ) ঢালাও গুদাম : শস্যদানা গুদামঘরের মেঝেতে স্তূপাকারে রাখা হয়, তবে আলো বাতাস চলাচলের যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হয়। এখানে কোনো বস্তা বা ব্যাগ ব্যবহার করা হয় না।

ঙ) সাইলো : খাদ্য মন্ত্রণালয় দীর্ঘ সময় ধরে ধান বা চাল সংরক্ষণের জন্য যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গুদাম তৈরি করে তাকে সাইলো বলে।

চিত্র : সাইলো

২.৬ : ধানের গোলাজাত পোকামাকড় :

খাদ্যশস্য গুদামে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা একটি বড় সমস্যা। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) এর মতে পৃথিবীতে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন শস্য গুদামে নাড়াচড়ার দরুন নষ্ট হয়। কোনো কোনো দেশে শতকরা ১৫-৩০ ভাগ শস্য গুদামে নষ্ট হয়। উল্লেখ্য যে ৫০ ধরনের পোকা আমাদের দেশে গোলাজাত শস্যের ক্ষতিসাধন করে থাকে। পরিবেশগত দিক থেকে পোকামাকড়ের অবস্থা ও বংশ বিস্তারের জন্য বাংলাদেশ মোটামুটিভাবে উত্তম স্থান। এখানে অনুকূল আবহাওয়ার দরুন পোকামাকড় দ্রুত বংশবিস্তার করে। ফলে গুদামজাত শস্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে পোকাক্রান্ত হয়। নিম্নে গুদামজাত ধান ফসলের প্রধান প্রধান পোকার পরিচিতি ও ক্ষতির প্রকৃতি বর্ণনা করা হলো-

১. ধানের শুঁড় পোকা : গুদামজাত শস্যেরে কীটপতঙ্গের মধ্যে এটি অন্যতম। ইংরেজিতে এদের রাইস উইভিল বলে। এদের প্রধান খাদ্য ধান। এছাড়াও এরা গম, ভুট্টা প্রভৃতি আক্রমণ করে। এদের মাথার সামনে একটি শক্ত ও লম্বা শুঁড় থাকে। এরা শস্যের মধ্যে গর্ত করে শস্যের শাঁস খেয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই পোকা বর্ষাকালে, বিশেষ করে আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বেশি ক্ষতি করে।

২. কেড়ি পোকা : ইংরেজিতে একে লেসার গ্রেইন বোরার বলে। এ পোকা ধান ও গম ফসলের বেশি ক্ষতি করে এদের চোয়াল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর সাহায্যে এরা শস্যদানার ভেতরের অংশ কুরে কুরে খায়। খাওয়ার ফলে শস্যদানার ভেতরের অংশ ফাঁপা হয়ে যায় এবং শুধু বাইরের খোসাটি অবশিষ্ট থাকে। একবার শস্যদানার মধ্যে ঢুকলে জীবনের অবশিষ্ট সময় এখানেই কাটিয়ে দেয়।

৩. লাল শূসরী পোকা : ইংরেজিতে একে গ্রেইন বিটল বলে। এদের শরীরে লাল ও বাদামি রঙের হয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ে গুদামজাত শস্যদানা বা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য আক্রমণ করে। সাধারণত এরা অক্ষত ও পূর্ণ দানা আক্রমণ করে না। অন্য পোকা খাওয়া দানায় এরা ক্ষতি করে। পোকায় আক্রান্ত ময়দা, সুজি ও আটা একসাথে দলা বেঁধে যায় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

চিত্র : ধান ফসল বিনষ্টকারী গুদামজাত পোকা

৪. খাপড়া বিটল : গুদামজাত শস্যের জন্য এটি একটি মারাত্মক পোকা। এ পোকা না খেয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। এ পোকা ধান, গম, ভুট্টা, আটা ও ময়দায় আক্রমণ করে। পোকার কীড়া দানার ক্ষতি করে। এরা গুদামজাত শস্যের উপরের স্তরে আক্রমণ শুরু করে এবং কখনও খুব বেশি ভিতরে ঢোকে না।

৫. ধানের সুরুই পোকা : ইংরেজিতে একে রাইস মথ বলে। এ পোকা ধান, গম ভুট্টা ও অন্যান্য শস্যদানা আক্রমণ করে। এ পোকার কীড়া ধানের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ভেতরের শাঁস খেয়ে থাকে। আক্রান্ত ধানের মধ্যে এরা গোলাকার ছিদ্র করে খায়। সাধারণত এরা ধানের উপরের স্তরে বেশি ক্ষতি করে।

৬. চালের সুরুই পোকা : একে রাইস মিল মথ বলে। এরা ধানের সুরুই পোকা থেকে একটু বড়। এ পোকা চালের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। কীড়াগুলো এক প্রকার রেশমি জাল তৈরি করে তার নিচে থেকে চালের ক্ষতি করে। আক্রান্ত শস্যদানা দুর্গন্ধ যুক্ত এবং খাওয়া বা বিক্রির অনুপযুক্ত হয়ে যায় এবং বড় বড় জটা সৃষ্টি করে।

৭. সুরুই পোকা : একে ইন্ডিয়ান মিল মথ বলে। এ পোকা বিভিন্ন প্রকার শস্যদানা, খাদ্য বস্তু, সয়াবিন, শুকনো ফল, বাদাম ইত্যাদি আক্রমণ করে। শস্য দানার উপর এরা রেশমি সূতা দিয়ে একটি জাল তৈরি করে যার সাথে পোকার বিষ্ঠা মিশানো থাকে।

২.৭ গুদামজাত শস্যের পোকামাকড় দমন :

গুদাম শস্যের পোকামাকড় দমনের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন– ক) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, খ) প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :

১. শস্য কাটার পরবর্তী সময়ে শস্যদানাকে বেশি সময় ধরে মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।

২. রোদে শুকানোর সময় আশে পাশের গুদাম থেকে পোকা এসে যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভালোভাবে শস্যদানা শুকাতে হবে।

২০২৫

৩. শস্যদানাকে ভালোভাবে বাছাই করে গোলাজাত করতে হবে।

৪. গুদাম ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. গোলাজাত করার পাত্রগুলোকে উত্তমরূপে শুকিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৬. সংররক্ষণ পাত্র এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে এদের মুখ খুব ছোট এবং পেট অপেক্ষাকৃত মোটা হয়।

৭. শস্য ভর্তি করার পর মুখে কিছু বালি, তুষ বা কুঁড়া বা নিম পাতার গুঁড়া দিতে হবে। তারপর মুখ কাঁদা দিয়ে বন্ধ করতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে।

৮. শস্য গোলজাত করার সময় বাঁশের নির্মিত গোলা বা ডোলের ভেতর ও বাহিরের অংশ গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভালোভাবে প্রলেপ দিতে হয়।

৯. প্রতি কেজি শস্য দানার সাথে ২.৯ গ্রাম হারে নিম. নিশিন্দা বা বিষকাটালী পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে সংরক্ষণ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা :

১. বাহির থেকে গুদাম ঘরের ভেতরে ঠাণ্ডা বাতাস প্রয়োগ করে পোকামাকড় দমন করা যায়।

২. গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিকিরণের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা যায়।

৩. প্রতি ১০০০ ঘনফুট জায়গায় ফলিথিয়ন (৫০ ইসি) অথবা ডিডিভিপি (১০০) ইত্যাদির ৮৫ গ্রাম কীটনাশক ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৪. গুদামজাত প্রতিটন বীজে ২-৪ টি ফসটকসিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হলে কীটপ্রতঙ্গ মারা যায়।

২.৮ ধান সিদ্ধকরণ :

ধান থেকে উৎপাদিত চাল আমাদের দেশে দুইভাবে ব্যবহার হয়। যথা-

(ক) আতপ চাল : সংগৃহীত ধানকে শুকিয়ে সরাসরি মিলিং করে যে চাল পাওয়া যায় তাকে আতপ চাল বা সান ড্রাইড রাইস (Sundried Rice) বলে।

(খ) সিদ্ধচাল : সংগৃহীত ধানকে সিদ্ধ করা হয়। তারপর শুকিয়ে মিলিং করে যে চাল পাওয়া যায় তাকে সিদ্ধ বা পারবয়েলড রাইস (Parboild rice) বলে।

ধান সিদ্ধ করা একটি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ধান সিদ্ধ করা প্রথমে শুরু হয়েছিল ভারতে এবং এই উপমহাদশে এখনও ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিদ্ধ চাল ব্যবহার করা হয়। যেমন- বাংলাদেশ, নেপাল, বার্মা, শ্রীলংকা, মালেশিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে। ধারণা করা হয় এই উপমহাদেশে প্রায় অর্ধেক সিদ্ধ চাল খাওয়া হয় যা পৃথিবীর মোট চালের এক-পঞ্চমাংশ। তবে সুগন্ধিচাল সিদ্ধ করা হয় না কারণ তাতে চালের সুগন্ধ অনকেটা চলে যায়।

ধান সিদ্ধকরণের সুবিধা ও অসুবিধা :

সুবিধা :

(১) সিদ্ধ করার ফলে ধানের খোসা ফেটে যায়। ফলে চাল থেকে তুষ বা খোসা সহজে পৃথক করা যায়।

(২) সিদ্ধ করা ধান ভাঙালে খুদের পরিমাণ কম হয়।

(৩) সিদ্ধ চালের পুষ্টি উপাদান বেশি হয়।

(৪) সিদ্ধ চালের পোকমাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।

(৫) সিদ্ধ চালের কুঁড়ায় তেলের (Rice bran oil) পরিমাণ বেশি হয়।

(৬) সিদ্ধ চালের মাড়ে আতপ চালের মাড় অপেক্ষা কম খাদ্যমান অপচয় হয়।

অসুবিধা :

(১) সিদ্ধ করার ফলে চালের প্রাকৃতিক জারণ প্রতিরোধক বা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা গুদামজাত অবস্থায় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়।

(২) সিদ্ধ চাল রান্না করতে বেশি সময় লাগে এবং বেশি জ্বালানি খরচের প্রয়োজন হয়।

(৩) সিদ্ধ ধান বেশি দিন সংরক্ষণ করলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়।

ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি :

কৃষকের বাড়িতে হাঁড়ি, পাতিল, ডেগচি, কড়াই বা তাফালে ধান সিদ্ধ করা হয়। ভিজিয়ে রাখা ধান পাত্র থেকে তুলে রাখা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী পানি দিতে হয়। পাত্র চুলার উপর রেখে জ্বাল দিতে থাকলে যখন বেশির ভাগ ধান ফেটে যায় তখন উঠিয়ে এনে উঠানে বা চাতালে মেলে রোদে শুকানো হয়। ধান সিদ্ধ করার পদ্ধতি দুই-প্রকার। যথা (১) প্রচলিত পদ্ধতি ও (২) আধুনিক পদ্ধতি।

প্রচলিত পদ্ধতি : আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় সিদ্ধ ধানের প্রায় সমস্তটাই প্রচলিত বা দেশীয় পদ্ধতিতে সিদ্ধ করা হয়। এ পদ্ধতি আবার দুই প্রকারের। যথা-

ক) **একসিদ্ধ পদ্ধতি :** বিভিন্ন পাত্রে ধান ১-৩ দিন পর্যন্ত ভিজানো হয়। তারপর জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করে শুকানো হয়।

খ) **দুইসিদ্ধ পদ্ধতি :** ধান পানিতে ডুবানোর পূর্বে আংশিক পানিপূর্ণ পাত্রে রেখে তাপ প্রয়োগ করা হয়। তাপের ফলে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ধানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এ অবস্থায় গরম ধানকে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়। প্রায় ১ দিন পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখার পর ভিজা ধানকে উপরে বর্ণিত একসিদ্ধ পদ্ধতিতে সিদ্ধ করা হয়। দুই সিদ্ধের চাল বেশ শক্ত হয়। উভয় পদ্ধতিতেই ধান সিদ্ধ করার সময় যখন ধানের খোসা ফেটে দুই ভাগ হয়ে যায় তখন ধান সিদ্ধ সম্পন্ন হয়।

আধুনিক পদ্ধতি : আধুনিক পদ্ধতি তিন ধরনের। যথা-

ক) ধান ভিজিয়ে সিদ্ধ করার ধীর পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে পাকা চাতালের বা প্লাটফর্মের (plat from) উপর চোঙ্গাকৃতি এক বা একাধিক ইট বা সিমেন্টের (tank) বা কেটেল এ ধান ভিজানোর হয়। ২৪-৭২ ঘন্টা ভিজানো ধান এখানে স্থানান্তর করা হয়। এই (tank) বা কেটেল একটি নল দ্বারা বয়লারের সাথে সংযুক্ত থাকে। নলটি ট্যাঙ্কের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঢুকানো থাকে। বয়লার থেকে পানির বাষ্প সমস্ত ট্যাঙ্কের ধানে ছড়িয়ে পড়ে। বাষ্প নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নলে ভাল্ভ (Valve) লাগানো থাকে। বয়লারের পানি চুলার আগুনে বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পের তাপে যখন সমস্ত ধান সিদ্ধ হয়ে খোসা ফেটে যায় তখন ট্যাঙ্ক বা কেটেলের নিচের ভালব খুলে সিদ্ধ ধান বের করে আনা হয়। অতঃপর তা শুকানো হয়। ২০২২

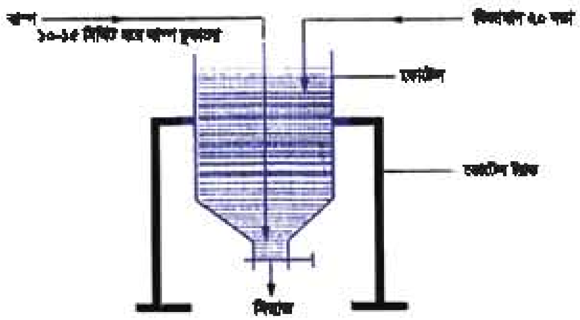

চিত্র : ভিজানো ও সিদ্ধকরণ

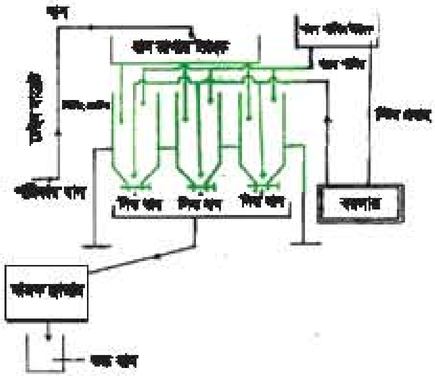

চিত্র : সিদ্ধ করা ধান শুকানোর জন্য ট্যাঙ্ক থেকে বের করা

(খ) ভারতীয় পদ্ধতি : এ পদ্ধতি ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্য কারিগরি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (CFTRI) কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে স্টিলের তৈরি সিদ্ধকরণ ট্যাঙ্ক বা কেটেল ব্যবহার করা হয়। বয়লার থেকে বাষ্প ট্যাঙ্কে প্রবেশ করার উপযোগী করে নলগুলো বিন্যস্ত থাকে। ট্যাঙ্কের উপরের অংশে পানি প্রবেশের নল থাকে। ট্যাঙ্কের নিচে দুইটি ভাল্ভ থাকে, একটি দিয়ে ট্যাঙ্কের পানি নিকাশন করা হয় এবং অন্যটি দিয়ে সিদ্ধ ধান বের করা হয়। ট্যাঙ্কে পানি প্রবেশ করানোর পর বয়লার থেকে বাষ্প প্রবেশ করানো হয়। বাষ্পের তাপে পানির তাপমাত্রা যখন 85°C হয়ে যায় তখন ধানকে উক্ত গরম পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। স্বয়ংক্রিয় কনভেয়ারের সাহায্যে ধানকে সিদ্ধকরণ ট্যাঙ্কে ফেলা হয়। কিছুক্ষণ পর ধান ও পানি মিশ্রণের তাপমাত্রা 70°C এ এসে যায়। এই তাপমাত্রা যেন স্থির থাকে সেজন্য ট্যাঙ্কের ভিতর পানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এ অবস্থায় ৩-৪ ঘন্টা থাকার পর নিচের ভাল্ভ দিয়ে গরম পানি সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর ধানের মধ্যে গরম বাষ্প প্রবাহিত করে ধানকে সিদ্ধ করা হয়। বাষ্পের পানি বের হওয়ার জন্য নিচে ভাল্ভ খোলা রাখা হয়। অধিকাংশ ধানের খোলা ফেটে গেলে ধান সিদ্ধ সম্পন্ন হয়।

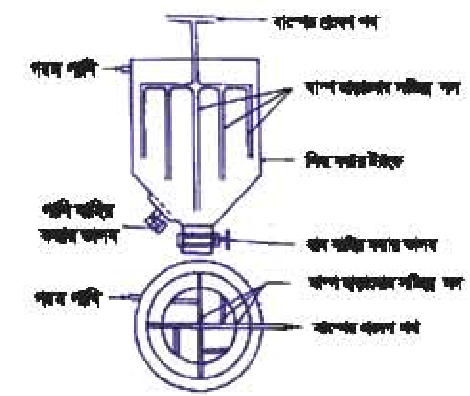

চিত্র : কেন্দ্রীয় খাদ্য কারিগরি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ভারত) উদ্ভাবিত পদ্ধতি

(গ) প্রেসার পদ্ধতি : এটি ভারতে উদ্ভাবিত আধুনিক পদ্ধতি। এতে ধানকে 90°C গরম পানিতে ৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর উক্ত ভেজা ধানে ১৮ মিনিট গরম বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে উচ্চ চাপে ধানের মধ্যে বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। এতে সিদ্ধ ধানের রং কিছুটা হলুদ হয় এবং ভাঙ্গা চাল ও খুদের পরিমাণ কম হয়।

সিদ্ধ ধান শুকানো :

সাধারণ বা আতপ ধান শুকানোর মতো সিদ্ধ করা ধান শুকানো যায় না। সিদ্ধ ধান খুব ধীরে শুকালে ক্ষতিকর অনুজীবের আক্রমণে ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে দ্রুত শুকালে চালে ফাটল তৈরি হয় এবং মিলিং-এর সময় ভাঙ্গা চালের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয় ধান সকল দিকে সমভাবে শুকানো উচিত। সুতরাং সিদ্ধ ধান দুই পর্যায়ে শুকাতে হয়। প্রথম পর্যায়ে জলীয় অংশ ১৬% পৌঁছানোর আগেই শুকানো বন্ধ করে ছায়ায় জমা করে কয়েক ঘণ্টা রাখতে হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শুকিয়ে জলীয় অংশ ১৪% বা তার কম করতে হবে। এভাবে শুকানোর মাঝে বিরতি দেওয়াকে টেম্পারিং বলে। রোদে শুকানোর ক্ষেত্রে এক রোদে না শুকিয়ে ২-৩ দিনের রোদে শুকানো উচিত। প্রথমবার শুকানোর পর রাতের বেলা স্তূপীকৃত করে রাখলে টেম্পারিং-এর কাজ সহজেই হয়ে যায়। শুধু তাই নয় উঠানে ধান ছড়িয়ে দিয়ে ১ ইঞ্চি বা ২.৫ সে.মি. এর বেশি পুরু না করে ঘন ঘন উল্টিয়ে দেওয়া উচিত। বিভিন্ন ধরনের ড্রায়ারের মধ্যে অবিরাম প্রবাহশীল ও টেম্পারিং ব্যবস্থাযুক্ত ড্রায়ার দ্বারা ধান শুকানো উচিত।

২.৯ ধান মিলিং :

ধান থেকে তুষ ও কুঁড়া সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়াকেই মিলিং বা ধান ভাঙানো বলে। ধান মিলিং দুই ভাবে করা যায়। যথা- (ক) প্রচলিত মিলিং (খ) আধুনিক মিলিং

প্রচলিত মিলিং : প্রচলিত মিলিং বা ধান ভাঙানোতে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় তা হল (১) পাইল ও সিয়া (২) ঢেঁকি।

চিত্র : পাইল ও সিয়া এবং ঢেঁকি

আধুনিক মিলিং : আধুনিক মিলিং প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নরূপ−

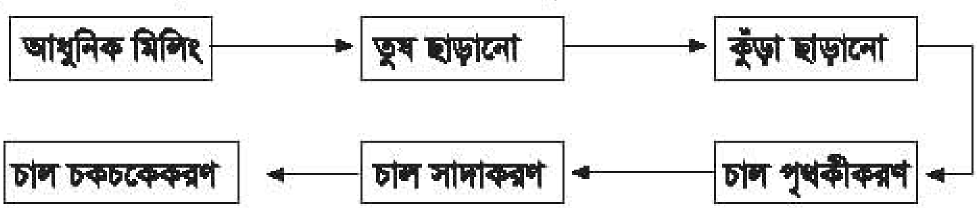

২০২

আধুনিক মিলিং-এর যন্ত্রপাতিগুলো নিম্নরূপ–

(১) তুষ ছাড়ানো মেশিন (Husker)

(২) মিলিং মেশিন : এটি তুষ ছাড়ানো, কুঁড়া ছাড়ানো ও চাল চকচকেকরণ একত্রে সম্পন্ন করে।

(৩) রাইস মিলিং প্লান্ট : এ প্লান্টে ধান ঝাড়াইকরণ, সিদ্ধকরণ, শুকানো, তুষ ছাড়ানো, কুঁড়া ছাড়ানো, চাল থেকে খুদ ও কুঁড়া পৃথকীকরণ, আকার অনুযায়ী বাছাইকরণ ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ধান একসাথে প্রক্রিয়াজাত করা যায়।

তুষ ছাড়ানো মেশিন : এটি দুই ধরনের যথা (ক) ঘর্ষন পদ্ধতি যেমন- ধানকল বা হলার (খ) রোলার পদ্ধতি যেমন- রাবার রোলার হাস্কার।

রাইস হলার বা ধান কল : আমাদের দেশে বর্তমানে বহুল প্রচলিত ছোট ছোট ধানকলগুলোতে ঘর্ষণ বা ফ্রিকশান পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ধান ভাঙানো হয়। এতে তুষ খসানোর সাথে সাথে কুঁড়া ছাড়ানো ও সামান্য পোলিশিং-এর কাজ একই সাথে সম্পন্ন হয়। এসব রাইস হলারগুলো আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় ভাষায় এদেরকে ধান কল বলে। এগুলোর দাম কম, স্থাপনে জায়গা কম লাগে, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খুব সহজ এবং দেশেই তৈরি করা যায়। এগুলোর অসুবিধা হলো ভাঙ্গা চাল ও খুদের পরিমাণ বেশি হয়। তাছাড়া চালের সাথে তুষ, কুঁড়া, খুদ ও ভাঙ্গা চাল একত্রে মিশে যায়।

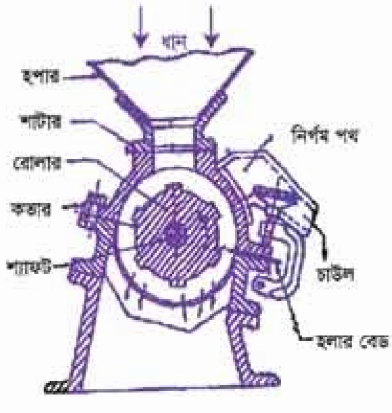

চিত্র: রাইস হলার

চিত্র: ধান কল

হাস্কার : এই যন্ত্রে একই ব্যাসের দুইটি রাবার রোলার পাশাপাশি সেট করা হয়। রোলার দুইটির একটি বেশি গতিতে অন্যটি ধীর গতিতে ঘুরে। হপার থেকে ধান নিয়ন্ত্রিতভাবে রোলার দুইটির মাঝে পড়ে। মেশিন চালু করলে রোলার দুইটি ভিন্নগতি এবং বিপরীত গতিতে ঘুরতে থাকে। ফলে ধানের খোসা বিভক্ত হয়ে চাল বেরিয়ে আসে। এভাবে ধান মিলিং করার সুবিধা হলো এতে খুদের পরিমাণ কম হয় এবং চালের ভ্রূণ বা এপিডার্মিস অক্ষত থাকে। এপিডার্মিসের আবরণ গুদামজাত অবস্থায় চালকে নষ্ট হতে দেয় না। এ প্রকার হাস্কারের দাম বেশি, গঠন জটিল এবং বর্তমানে আমাদের দেশের তৈরি হয় না।

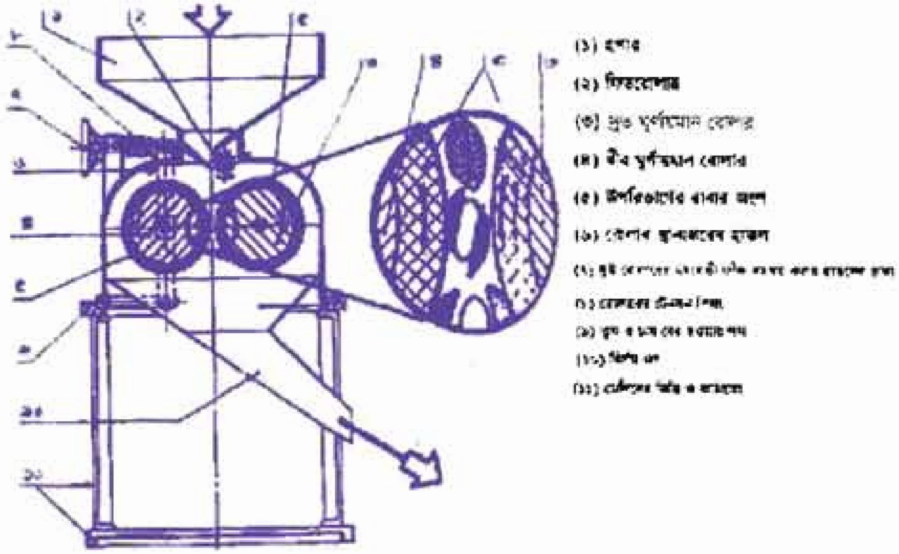

চিত্র: রাবার রোলার হাস্কার

কুঁড়া ছাড়ানো যন্ত্র : ধানের খোসা ছাড়ানোর পর যে চাল পাওয়া যায় তার উপর লালচে বর্ণের কুঁড়ার আবরণ থাকে। এটি পরিপাক ক্রিয়ায় অসুবিধা সৃষ্টি করে। এজন্য চালকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কুঁড়া ছাড়ানো যন্ত্রের সাহায্যে তা তুলে ফেলতে হয়। এ যন্ত্রটিতে দুইটি প্রধান অংশ থাকে তা হলো ছিদ্রযুক্ত ধাতব সিলিন্ডার আচ্ছাদিত রোলার। এর মাঝে থাকে ফাঁকা স্থান। এই ফাকা স্থানেই ঘর্ষণ পদ্ধতিতে মোটর দ্বারা রোলার ঘুরানোর ফলে চালের কুঁড়া আপসারিত হয়ে নিম্নে পতিত হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (ব্রি.) পাওয়ার উইনোয়ার (শক্তি চালিত কুঁড়া ছাড়ানো যন্ত্র) উদ্ভাবন করেছে যা ০.৫ অশ্বশক্তিসম্পন্ন। স্থানীয়ভাবে এটি তৈরি করা যায়। এটি দুই'জন শ্রমিক চালিয়ে প্রতি কর্মদিনে ৮০০-১০০০ কেজি চাল পরিষ্কার করতে পারে।

মিলিং মেশিন : ধান থেকে খাদ্য উপযোগী চাল পেতে হলে ধানের খোসা ছাড়ানো, কুঁড়া ছাড়ানো, ঝাড়াই করা, সাদা করা, তুষ ও কুঁড়া আলাদা করা, ভাঙা চাল ও ক্ষুদ আলাদা করা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে হয়। এ সকল প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করার জন্য হাস্কার, হোয়াইটেনিং মেশিন ও পলিশিং মেশিন ইত্যাদি একত্রে সমন্বিত করে কম জায়গায় ও কম শ্রমিকের দ্বারা সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাকে মিলিং প্রক্রিয়া এবং ব্যবহৃত যন্ত্রাবলিকে একত্রে মিলিং মেশিন বলে। উন্নত দেশের বেশির ভাগ খামারে মিলিং মেশিন দ্বারা ধান প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। মিলিং মেশিনের বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

(১) ধান পরিষ্কারক
(২) ধানের খোসা ছাড়ানো যন্ত্র
(৩) ধান আলাদাকারক
(৪) এলিভেটর
(৫) কুঁড়া ছাড়ানো যন্ত্র
(৬) কুঁড়া টানার ফ্যান
(৭) সাইক্লোন
(৮) চালনী
(৯) গ্রেডার ইত্যাদি।

অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পৃথিবীতে দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য শস্যের না কী?
২. বাংলাদেশে বছরে হেক্টর প্রতি কত ধান এবং চাল উৎপাদন হচ্ছে?
৩. ধান এর সংজ্ঞা লিখ।
৪. ধান কী জাতীয় ফল?
৫. চালের সংজ্ঞা দাও।
৬. ধানের কয়টি উপজাত ও কী কী?
৭. বাংলাদেশে উৎপাদিত ধানের উপজাতের নাম কী?
৮. আউশ ধান কখন বোনে ও কখন পাকে?
৯. কোনটি শীতকালীন ধান? এটি কখন বোনে ও কখন পাকে?
১০. ২০১৬ পর্যন্ত ব্রি কতগুলো ধানের জাত অবমুক্ত করেছে?
১১. ব্রি ধান-৪২ এবং ৪৩ এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
১২. ব্রি ধান-৫০ এর বৈশিষ্ট্য কী?
১৩. ব্রি ধান- ৫৩ ও ৫৪ এর বৈশিষ্ট্য কী?
১৪. জিঙ্কসমৃদ্ধ ধান কোনটি?
১৫. ধানের বহিরাবরণ ও চালের বহিররাবরণকে কী বলে?
১৬. চালের অ্যালুরেন স্তর কোনটি?
১৭. চালের মোট কত ভাগ শস্য বা Endosperm?
১৮. 'চালের জৈবিক মান ৬৮' বাক্যটির অর্থ কী?
১৯. চালে ভিটামিন বি পরিবারের কয়টি ভিটামিন থাকে? এগুলো কীকী?
২০. বাংলাদেশের মানুষের ভাত-সবজি খাওয়ার অনুপাত কী?
২১. ধান সংরক্ষনের জন্য ধানে কতভাগ আদ্রতা থাকা প্রয়োজন?
২২. ধানের গুদামে সবচেয়ে ক্ষতিকারক পোকা দুইটি কী কী?
২৩. সাইলো বলতে কী বুঝায়?
২৪. 'রাইস উইভিল' কী? কীভাবে ক্ষতি করে?
২৫. কেড়ি পোকাকে ইংরেজিতে কী বলে?
২৬. লাল শূসরী পোকা কীভাবে আক্রমণ করে?
২৭. খাপড়া বিটল কী?
২৮. রাইস মথ, রাইস মিল মথ, ইন্ডিয়ান মিল মথ এদের বাংলানাম কী?
২৯. গুদামে সংরক্ষণ কালে ধানের সাথে কী কী গাছের পাতার গুঁড়া মিশালে ভালো হয়?
৩০. গুদামজাত শস্যদানা রক্ষার জন্য কোন ঔষধ ব্যববহার করা উচিত?
৩১. সুগন্ধিচাল কেন সিদ্ধ করা হয় না?
৩২. সিদ্ধ করা চাল কেন তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়?
৩৩. ধান সিদ্ধ করার আধুনিক পদ্ধতি কয়টি ও কী কী?
৩৪. প্রেসার পদ্ধতিতে ধান সিদ্ধ করার জন্য কত তাপমাত্রায় কতক্ষণ ধান পানিতে রাখতে হয়?

৩৫. টেম্পারিং বলতে কী বুঝায়?
৩৬. মিলিং বলতে কী বুঝায়?
৩৭. ধান মিলিং মেশিনে কী কী অংশ থাকে?
৩৮. পাওয়ার উইনোয়ার বলতে কী বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ধান ও চালের সংজ্ঞা দাও।
২. ধানের তিনটি উপজাতের বর্ণনা দাও।
৩. মৌসুম ভিত্তিক তিন প্রকার ধানের বর্ণনা দাও।
৪. ধান বীজের অংশ কয়টি ও কী কী চিত্র সহ বর্ণনা কর?
৫. চালের অ্যালুরেন স্তরের সুবিধা ও অসুবিধা কী?
৬. কলে ছাঁটা ও ঢেঁকি ছাঁটা চালের পুষ্টিমান বর্ণনা কর।
৭. ধান ও চালের ব্যাবহারের বিধি কী কী?
৮. গুদামে ধান কী কী কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার বর্ণনা দাও।
৯. ধানের প্রধান গোলাজাত পোকা মাকড়ের নাম লেখ।
১০. রাইস উইভিল ও গ্রেইন বিটলের বর্ণনা দাও।
১১. ধানে গুদামজাত পোকামাকড়ের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা লেখ।
১২. আতপ ও সিদ্ধ চাল বলতে কী বুঝায়?
১৩. ধান সিদ্ধকরণের সুবিধা কী কী?
১৪. সিদ্ধ ধান শুকানোর প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
১৫. আধুনিক মিলিং প্রক্রিয়ার ফ্লো-চার্টটি লেখ।
১৬. আধুনিক মিলিং যন্ত্রপাতিগুলো কী কী?
১৭. মিলিং মেশিনের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।

রচানামূলক প্রশ্ন

১. ধান ও চালের বৈশিষ্ট্য, উল্লেখ করে এর উপজাত ও শ্রেণি বিভাগগুলো লিখ।
২. ধানের প্রধান প্রধান ১০টি জাতের বৈশিষ্ট্য লেখ।
৩. ধানবীজের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা ও পুষ্টি লেখ।
৪. ধানের পুষ্টি ও পুষ্টির অপচয় বর্ণনা কর।
৫. ধান ও চালের ব্যবহার বিধি উল্লেখ কর।
৬. ধান সংরক্ষণকালীন ধানের ক্ষতির কারনগুলো বর্ণনা কর।
৭. বিভিন্ন প্রকার ধানবীজ গুদামঘরের বর্ণনা দাও।
৮. ধানের গোলজাত পোকামাকড়ের দমন ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।
৯. শস্য গুদামজাত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।
১০. ধান সিদ্ধকরণের আধুনিক পদ্ধতির বর্ণনা দাও।
১১. ধান সিদ্ধকরণের সুবিধা ও অসুবিধা ও ধান শুকানো বর্ণনা কর।
১২. রাইস হলার ও রাইস হাস্কারের বর্ণনা দাও।
১৩. মিলিং মেশিন কী? কুঁড়া ছাড়ানো যন্ত্র কীভাবে কাজ করে? ২০২২

অধ্যায়-৩

ধান থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য

ভূমিকা: ধান বাছাই, মাড়াই ও ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে বস্তায় সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর তা সিদ্ধ করে পুনরায় শুকিয়ে মিলিং মেশিনে খোসা আলাদা করে চাল তৈরি করা হয়। এই চাল রান্না করার পর ভাত তৈরি হয়। ভাত আমাদের দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য।

ধান থেকে আমরা সাধারণত চিড়া, মুড়ি ও খৈ তৈরি করে থাকি। চিড়া মুড়ি, খৈ ২-৩ মাস সংরক্ষণ করা যায়। মুড়ি বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিশু, কিশোর, যুবা এবং বয়স্ক সকলেই মুড়ি খেতে ভালোবাসে। গুড়, মুড়ি, চিড়া খৈ এখনও গ্রামে সকালের নাস্তা বা জলখাবার হিসেবে ব্যবহার হয়। ইদানীং শহরে ঝালমুড়ি, চানাচুরের সাথে মুড়ি, মিষ্টি মুড়ি, মুড়ির মোয়া হিসেবে মুড়ির ব্যবহারের শেষ নেই। দূরের রাস্তায় চিড়া, মুড়ি ও খৈ সঙ্গে নেয়া খুবই সুবিধাজনক। বর্ষাকালে মুড়ি পেঁয়াজ, মরিচ ও তেল দিয়ে ভেজে আকর্ষণীয় মজাদার নাস্তা তৈরি করে নিজে বা মেহমানদের আপ্যায়ন করা যায়। চিড়া, মুড়ি ও খৈ-এর পুষ্টিমূল্য চালের মতো। পেকেটজাত ঝালমুড়ি বর্তমানে শিল্প পণ্য। তাছাড়া মুড়ি ও চিড়ার তৈরি মোয়া বিক্রি বর্তমানে এক শ্রেণির লোকের পেশা হয়ে দাড়িয়েছে।

৩.১ ধান থেকে মুড়ি, চিড়া ও খৈ তৈরি :

মুড়ি (Puffed Rice) তৈরি পদ্ধতি : দুইভাবে মুড়ি-তৈরি করা যায় যথা :-

১। দেশি বা সানতন পদ্ধতি ২। আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি

দেশি বা সানতন পদ্ধতি : মালা বা বিরই বা স্থানীয় জাতের আমন ধানের চাল থেকে মুড়ি তৈরি করা হয়। মুড়ি তৈরির ধান মোটা বা বড় এবং পরিপক্ব ও পরিষ্কার হলে ভাল হয়। পোকামাকড়ের আক্রমণ যুক্ত হলে মুড়ির মান কমে যাবে। তাছাড়া ধানে ধুলাবালি থাকলে মুড়ি খাওয়ার অনুপযোগী হবে। মুড়ির জন্য ধান নির্দিষ্ট পরিমাপে মেপে সসপ্যানে বা মাটির পাত্রে নিতে হয়। ধান অল্প সিদ্ধ করার জন্য সসপ্যানে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি দিয়ে ৭০°C তাপমাত্রায় ২০ মিনিটকাল তাপ দিতে হয়। এই অল্প সিদ্ধ ধান চুলা থেকে নামিয়ে সসপ্যানের গরম পানিসহ প্রায় ১২ ঘণ্টা বা ১ রাত ভিজিয়ে রাখতে হয়।

ভিজিয়ে রাখার পর ভিজানো ধান বাঁশের ডালায় উঠায়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর কিছু পানি দিয়ে ধান আবার চুলায় সিদ্ধ করতে হয়। ধান যখন ২/১টা ফাটতে শুরু করবে তখন বুঝতে হবে যে ধান মুড়ি তৈরির উপযোগী সিদ্ধ হয়েছে। এভাবে সিদ্ধ করা ধান চুলা থেকে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে, ঠাণ্ডা করে ৩-৪ ঘণ্টা শুকায়ে নিতে হয়। ধান এমন ভাবে শুকাতে হবে যাতে ধানে শতকরা ১৮-২০ ভাগ আর্দ্রতা থাকে। এ অবস্থা বোঝার জন্য কয়েকটি ধান হাতের তালুতে নিয়ে ঘষা দিলে চাল বের হবে। এ চাল দাঁতের নিচ দিয়ে চিবুলে কিছুটা শক্ত লাগবে ও মৃদু শব্দ হয়। এরূপ শুকনা ধান ঠাণ্ডা করে গাইলে বা ঢেঁকিতে বা মিলে ভাঙ্গা হয়। ধান ভাঙানোর পর চাল পরিষ্কার করে ঝেড়ে নিতে হয়। চালের গায়ে গুঁড়া লেগে থাকলে মোটা কাপড় বা চটের উপর রেখে ঘষে তা মুছে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

মুড়ি তৈরির জন্য দুই মুখওয়ালা চুলা হলে ভালো হয়। তবে এক মুখওয়ালা চুলাও চলবে। বড় মুখওয়ালা দুইটি পাতিল নিত হবে। একটি বড় অপরটি ছোট। ছোট পাতিলে চাল ও বড় পাতিলে বালু জ্বাল দিতে হয়। চাল গরম হলে চিকন কাঠির তৈরি নাড়নি দিয়ে ভাজার মতো করে চাল নাড়তে হয়। চাল নাড়ার সময় চালের সাথে ১-২ টেবিল চামচ লবণের দ্রবণ (৩০ ভাগ লবণ ও ৭০ ভাগ পানি) মিশাতে হয়। গরম চাল নাড়তে নাড়তে লবণ পনি শুকিয়ে যায় এবং ২/৩ টা চাল পুট পুট শব্দ করে ফুটতে থাকবে। বড় পাতিলে বালু গরম হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নিতে হয়। এ জন্য এক টুকরা পাটখড়ি ভেঙে আগার অংশ গরম বালিতে চেপে ধরলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কালো হয় বা পুড়ে ধোঁয়া ওঠে কী না তা দেখতে হয়। যদি পাটখড়ির আগা কালো হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বালু মুড়ি ভাজার উপযোগী হয়েছে।

২/১ টা ফোঁটা অবস্থায় সমস্ত চাল গরম বালুর মধ্যে ঢেলে দিতে হয়। বালুর মধ্যে চাল ঢেলে দিয়ে চিমটা দিয়ে বালুর পাতিল ধরে ঝাঁকিয়ে চাল ওলট-পালট করতে হয়। বালুসহ পাতিল ২/১ বার ঝাঁকিয়ে ২/৩ বার ওলট-পালট করতে হয়। তাতে সব চাল ফুটে মুড়িতে পরিণত হয়। চাল ফুটে মুড়ি হলেই সাথে সাথে বালি মিশ্রিত মুড়ি ঝাঁঝরিতে ঢেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করলে বালু আলাদা হয়ে নিচে পড়ে যাবে। এরপর ঝাঁঝরির মুড়ি আরও নাড়াচাড়া করলে ঝাঁঝরির ছিদ্র দিয়ে সমস্ত বালু বের হয়ে যাবে।

মুড়ি মুড়ির মোয়া

চিত্রা : মুড়ি ও মুড়ির মোয়া

মুড়ি তৈরি হওয়ার পর পরিষ্কার শুকনা ও জীবাণুমুক্ত জায়গায় রেখে মুড়ি ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর এ মুড়ি দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে হয়। মুড়ি সংরক্ষণের জন্য জীবাণুমুক্ত শুকনা, পরিষ্কার এবং গন্ধবিহীন টিনের কৌটা বা পলিথিন ব্যাগে রাখা যেতে পারে। তবে মুড়ি ভর্তি করার পর তা বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হয়।

আধুনিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতি :

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা অটোমেশিনে মুড়ি করার জন্য দিনাজপুর, পাঁচবিবি জয়পুরহাট, নওগাঁ ও শেরপুর থেকে বি.আর-১১ জাতের আমন ধানের চাল সংগ্রহ করা হয়। মাঝারি মোটা চাল সংগ্রহ করে গুদামজাত করা হয়।

মুড়ি তৈরির পদ্ধতি : মুড়ি তৈরির কারখানায় দুইটি অংশ থাকে এক টিকে ডায়াল ও অপরটিকে রোস্টার বলে। ডায়ালে এক সিরিয়ালে ১৫-২০টি অ্যালুমিনিয়াম কোটেড লোহার পাতিলে হাতল লাগানো থাকে।

প্রত্যেকটি পাতিলে গ্যাস লাইন সংযুক্ত থাকে। চুলা চালু করে প্রতিটি পাতিলে ৫০ কেজি চাল ঢালা হয় এরপর ১ মগ লবণ পানি (১ লিটার) প্রতিটি পাতিলের চালের সাথে ১৫ মিনিট ধরে হাতল ঘুরিয়ে মিশানো হয়। অতঃপর ৪৫ মিনিট জ্বাল দিতে হয় (বালু ছাড়া)। ১ ঘন্টা পর চাল মুড়ি হবার উপযোগী হলে বোলে করে হাতে হাতে চাল তুলে হপার দিয়ে রোষ্টারের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। রোষ্টারের ভিতরে গরম বালু অটোমেটিক ঘুরতে থাকে এবং এক মিনিটের মধ্যে মুড়ি তৈরি হয়ে বের হয়ে আসে। ছাঁকনি দিয়ে বালু ও মুড়ি মেশিনেই আলাদা করা হয়। মুড়িকে ব্লোয়ারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুড়ি তৈরির ফ্লোচার্ট

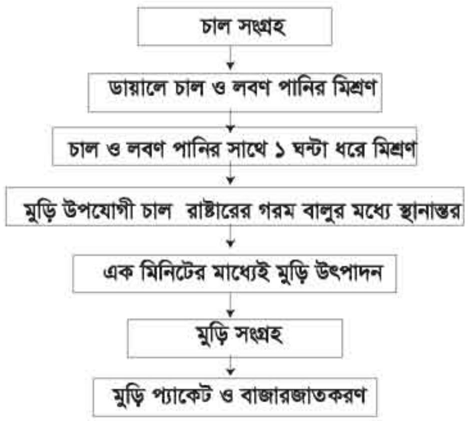

মুড়ি দিয়ে অন্যান্য যেসব খাদ্য তৈরি করা যায় তা নিম্নরূপ

(ক) **মুড়ির মোয়া :** চুলায় কড়াইতে পরিমাণ মতো গুড় ও পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। গুড় গলে গিয়ে ঘন চিট ধরলে তাতে পরিষ্কার মুড়ি নেড়েচেড়ে দিতে হয়। রস শুকিয়ে গেলে কড়াই নামিয়ে গরম থাকা অবস্থায় হাত দিয়ে গোল করে মোয়া গড়ে নিতে হয়। মোয়া করার সময় পানি দিয়ে হাত ভিজিয়ে বা সরিষার তেল মাখায়ে নিলে ভালো হয়। মোয়াকে সুস্বাদু করার জন্য বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করা যায়।

(খ) **ঝালমুড়ি :** মুড়ি মিকচার বা ঝালমুড়ি অতি প্রিয় একটি খাবার। একটি বাটিতে কিছু মুড়ি নিয়ে তাতে পরিমাণমতো চানাচুর, মরিচ গুঁড়া, বিট লবণ গুঁড়া, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, টমেটো কাটা, লেবুর রস ও সরিষার তেল সহযোগে উত্তমরূপে মিশ্রিত করে খাওয়া যায়। যা সকলের নিকট খুবই প্রিয় এই মিশ্রিত মুড়িকে আবার ভেজেও মুড়ি মিকচার তৈরি করা যায়। বাংলাদেশ বিভিন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি প্যাকেটজাত ঝালমুড়ি উৎপাদন করে থাকে।

(গ) **মিষ্টি মুড়ি :** পরিমাণমতো মুড়ি চেলে নিতে হয়। বড় কড়াইতে হালকা আঁচে ৫০ গ্রাম ঘি ও ১০০ গ্রাম চিনি দিয়ে চুলায় চাপাতে হয়। চিনি গলে গেলে মুড়ি ঢেলে তাড়াতাড়ি নেড়ে মিশাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কড়াইয়ের তলায় মুড়ি যেন লাল না হয়ে যায়। ভালোভাবে নেড়ে চুলা থেকে নামিয়ে একটি বড় গামলায় ঢালতে হয়। ১০-১৫ মিনিট পর ঠাণ্ডা হলে হাত দিয়ে চাকা ভেঙে মিষ্টি মুড়ি ঝরঝরে করতে হয়। প্রয়োজনে বিভিন্ন রং ব্যবহার করা যায়। মুড়ির চাকা ভাঙার সময় হাতে সরিষার তেল বা ঘি মাখিয়ে নিলে মুড়ির আঠালো ভাব হাতে লাগবে না বরং মুড়ির স্বাদ বৃদ্ধি পাবে।

ধান থেকে চিড়া : ধান থেকে উৎপাদিত চিড়া একটি সুস্বাদু মুখরোচক খাদ্য। সাধারণত চিড়া দ্বারা হালকা নাস্তা জাতীয় খাবার তৈরি করা হয়। যেমন চিড়ার মোয়া, চিড়া ভাজা চিড়া পোলাও, চানাচুর তৈরিতে ব্যবহার ইত্যাদি। চিড়া ভিজিয়ে তাতে সবরি কলা ও গুড় চটকে খেলে পেট ভালো থাকে।

চিড়া তৈরি- মুড়ি তৈরির মতো চিড়াও দুই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়, যথা-

১। সনাতন বা দেশি পদ্ধতি ২। আধুনিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতি

চিড়া তৈরি দেশীয় পদ্ধতি : চিড়া তৈরির জন্য ধান প্রথমে ভাপে সিদ্ধ (60º-70º C) করা হয়। তবে চাল করার মতো খোসা ফাটিয়ে সিদ্ধ করা হয় না। তারপর উক্ত ধান ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর ধান থেকে পানি ঝরিয়ে খোলা বা কড়াইয়ে নিয়ে চুলায় হালকা আঁচে গরম করা হয় বা টালা হয়। এরপর গরম ধান ঢেঁকিতে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে কুটে তুষ বা খোসা আলাদা করা হয়। ধান যেহেতু গরম থাকে তাই কোটার সময় চাল চ্যাপ্টা হয়ে যায়। তারপর তুষ ও কুঁড়া ঝেড়ে বাদ দিয়ে পরিষ্কার চিড়া পাওয়া যায়। মেশিনে চিড়া করার জন্য ধান শুধু ভিজিয়ে রাখা হয়, সিদ্ধ করা হয় না। চিড়া দিয়ে বিভিন্ন রকম মুখরোচক খাবার বানানো যায়। নাস্তা হিসেবে তা চায়ের সাথে পরিবেশন করা যায়। চিড়া দিয়ে তৈরি বিভিন্ন খাবারগুলো নিম্নরূপ :

চিত্রঃ চিড়া

(ক) চিড়ার পোলাও : এ পোলাও তৈরিতে পরিমান মত চিড়া, কিসমিস, কাজুবাদাম, সিদ্ধ গাজর, সিদ্ধ মটরশুঁটি, ঘি, চিনি, তেজপাতা, দারুচিনি ছোট এলাচ, লবঙ্গ ও লবণ নিতে হয়।

প্রথমে চিড়া দ্রুত পানিতে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। কড়াইতে ঘি নিয়ে উক্ত চিড়া ভেজে নিতে হয়। অন্য কড়াইতে পরিমাণমতো চিনি, বাদাম, গাজর, মটরশুঁটি, মশলা ও পানি দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হয়। শীতের সময় ফুলকপি, বরবটি দেওয়া যেতে পারে। অতঃপর সামান্য ঘি দিয়ে পেঁয়াজ কুঁচি লাল করে ভেজে চিড়া ও সবজি সব একত্রে সামান্য নেড়ে দিলে সুন্দর চিড়ার পোলাও তৈরি হবে। ধনে পাতা দিয়ে পরিবেশন করা যায়।

(খ) চিড়ার পায়েস : এ পায়েস তৈরিতে চিড়া, ঘি, চিনি বা খেজুরের গুড়, দুধ, কিসমিস, গোলাপ জল বা ভ্যানিলা ও এলাচের গুঁড়া পরিমাণমতো নিতে হয়।

প্রথমে দুধের সাথে চিনি বা গুড় মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। ঘন হয়ে এলে কিসমিসগুলো দিতে হয়। আরও ঘন ক্ষীরের মতো হলে নামিয়ে নিতে হয়। ঘি গরম করে সবটা চিড়া অল্প অল্প করে হালকা করে (এমনভাবে ঘিতে ভাজতে হবে যেন ফুলে উঠে) ভেজে নিতে হয়। ক্ষীর ঠাণ্ডা হলে গোলাপজল বা ভ্যানিলা বা এলাচের গুড়া ক্ষীরের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে মিলিয়ে নিতে হয়। চিড়াগুলো পরিবেশনের খুব বেশি আগে ক্ষীরের সাথে মেশালে তা ভিজে নরম হয়ে যাবে। এজন্য খেতে বসার ঠিক আগে ভাজা চিড়া ক্ষীরের সাথে মিশিয়ে পরিবেশন করলে অত্যন্ত উপাদেয় হয়।

(গ) চিড়া ভাজা : চিড়া ভাজা তৈরির জন্য চিড়া, আলুর কুঁচি, ভাজা চিনাবাদাম, সিদ্ধ মটরশুটি, পেঁয়াজ কুঁচি, কাঁচামরিচ কুঁচি, সয়াবিন তেল, ধনেপাতার কুঁচি, লেবুর রস, গোল মরিচের গুঁড়া ও লবণ পরিমাণ মতো নিতে হয়।

কড়াইতে তেল গরম করে নিতে হয়। তেল গরম হলে অল্প অল্প করে চিড়া গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে হালকা ফোলা ফোলা করে ভাজতে হবে। এক্ষেত্রে লম্বা হাতলওয়ালা তারের জালিতে চিড়া ভাজা হলে ভালো হয়। সব চিড়া ভাজা হয়ে গেলে আলুর কুঁচিতে লবণ মাখাতে হবে। তারপর আলুর কুঁচি তেলে ভেজে নিতে হবে। একটা বড় কাঁচের প্লেটে সমস্ত ভাজা চিড়া ভেজে ঢেলে রাখতে হবে। আলু ভাজা ও সমস্ত উপকরণ পরিমাণ মতো লবণ, লেবুর রস ও গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। চায়ের সাথে চিড়া ভাজা পরিবেশন করা যায়। চানাচুর তৈরিতেও চিড়া ভাজা দেওয়া হয়।

এছাড়া মুড়ির মোয়ার মতো চিড়ার মোয়া, মুড়কি, চিড়ার বরফি, চিড়ার চাকতি ও চিড়ার পুলি ইত্যাদি খাবার তৈরি করা যায়।

চিত্র: খৈ

ধান থেকে খৈ তৈরি : নাস্তা হিসেব খৈ অতুলনীয়। এখনও গ্রামাঞ্চলে খৈ-এর কদর অনেক বেশি। রোদে শুকানো ধান থেকে খৈ তৈরি করতে হয়। সিদ্ধ ধান থেকে খৈ তৈরি করা যায় না। বালু উত্তপ্ত হলে বালুর পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ধান হাঁড়িতে উত্তপ্ত বালুর মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি নাড়লে কিছুক্ষণের মধ্যে ধান ফুটে খৈ-এ পরিণত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন হাড়ির মুখে ঢাকনা দিয়ে ধরে নেড়ে সব ধান ফুটিয়ে খৈ-এ পরিণত করতে হয়। খৈ ফুঁটা শেষ হলে চালুনিতে সব ঢেলে তাড়াতাড়ি চালা হয়। বালু চেলে এবং ধানের খোসা বা তুষ বাদ দিয়ে পরিষ্কার খৈ সংগ্রহ করতে হয়। বিন্নি ও কনকচুর জাতের ধান থেকে খৈ তৈরি করা যায়। মুড়ির মতো খৈ থেকে মুড়কি, মোয়া তৈরি করা যায়। এছাড়া দই সহযোগে খৈ একটি মজাদার খাবার।

৩.২ চাল থেকে খাদ্য তৈরি :

আতপ চাল (Sundried Rice) : মাড়াইয়ের পর ধান শুকিয়ে নিয়ে সিদ্ধ না করে মেশিনে বা ঢেঁকিতে ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায় তাকে আতপ চাল বলে। আতপ চালে চালাবরণ ও অঙ্কুর কুঁড়ার সাথে চলে যায় বিধায় পুষ্টিমূল্য অনেক কমে যায়। আতপ চাল বেশি সংরক্ষণ করা যায় না। আতপ চাল বেশি সাদা দেখায় এবং চালের গায়ে সাদা পাউডারের মতো পদার্থ থাকে। আতপচাল অধিকতর পরিষ্কার করার জন্য টেলক বা ফ্রেঞ্চচক ব্যবহার করা হয়। ততে ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পায়।

আতপ ও সিদ্ধ চালের বৈশিষ্ট্য : চাল আমাদের প্রধান খাদ্য। এর ৭৬ ভাগই শ্বেতসার। খেতে সুস্বাদু ও সুপাচ্য এবং রান্নার প্রণালি সহজ হওয়ায় চাল সকলের নিকট অতি প্রিয় খাদ্য। ভারত, বাংলাদেশ, জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নেপাল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনগণের প্রধান খাদ্য হচ্ছে চাল।

ঢেঁকি ছাটা চাল ও কলে ছাঁটা চাল :

ঢেঁকি ছাঁটা চাল : ঢেঁকিতে দেশীয় পদ্ধতিতে ধান ভেঙে যে চাল পাওয়া যায় তাকে ঢেঁকি ছাঁটা চাল বলে। ধানের তুষ বা খোসা ছড়ানোর পর একটি বাদামি রংঙের সূক্ষ্ম স্তর বা চালাবরণ দেখা যায়। আতপ চালের এ চালাবরণ সামান্যই থাকে। চালাবরণের অধিকাংশই পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে। ঢেঁকি ছাঁটা চালে এই স্তরটি কিছুটা বজায় থাকে বিধায় এ চাল পুষ্টির দিক দিয়ে কলে ছাঁটা চালের চেয়ে কিছুটা উন্নত মানের হয়।

কলে ছাঁটা চাল বা পোলিশড রাইস (Polished Rice) : ধান কলে ভেঙে এই চাল পাওয়া যায়। যান্ত্রিক উপায়ে ধান ভাঙা হলে চালের উপরের লালচে আবরণ বা চালাবরণ দূর হয়ে সাদা হয়ে যায়। ফলে চাল পুষ্টির দিক দিয়ে নিম্নমানের হয়। বেশি ছাঁটা বা সাদা মসৃণ চাল Polished Rice শহরের লোক বেশি পছন্দ করে। এই চাল দেখতে সুন্দর, সহজে পোকা ধরে না এবং বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়।

কলে ছাঁটা চাল ঢেঁকি ছাঁটা চাল

চিত্রঃ ঢেঁকি ছাঁটা ও কলে ছাঁটা চাল।

পুরাতন চাল : পুরাতন চালের ভাত সুন্দর ঝকঝকে হয় বলে সকলের নিকট পছন্দনীয়। চাল পুরাতন হলে এর অ্যামাইলোজ নামক শর্করা কমে যায় এবং বাইরে ধুলার মতো অংশ শক্তভাবে শস্যদানার গায়ে সেঁটে যায়। পুরাতন চাল ধীরে ধীরে শক্ত ও লম্বকৃতি হয়ে যায়। সংরক্ষণের কারণে পুরাতন চালের শর্করা কণাগুলো ঘনীভূত হয় এবং কিছুটা পানি শুকিয়ে যায়। এর ফলে ধোয়ার সময় বা রান্না করার সময় পুরাতন চালে পুষ্টি উপাদানের ক্ষয় বহুলাংশে হ্রাস পায়। রান্নার সময় পুরাতন চাল ফাটে না। পুরাতন চাল উন্নত পুষ্টিমানের হয়।

নতুন চাল : নতুন চাল রান্না করলে ভাত নরম ও আঠালো হয়ে যায় এবং সহজেই ফেটে যায়। নতুন চালে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে। এর ফলে ধোয়া ও রান্নার সময় বেশিরভাগ পুষ্টি উপাদান চলে যায়। নতুন চালে পুষ্টি উপাদন পুরাতন চাল থেকে কম হয়।

সিদ্ধ চাল (Parboiled Rice) : বেশিদিন সংরক্ষণের জন্য মাড়াইয়ের পর ধান সিদ্ধ করে নেওয়া হয়। এরপর সিদ্ধ ধান শুকিয়ে ভাঙানোর পর যে চাল পাওয়া যায় তাকে সিদ্ধ চাল বলে। সিদ্ধ করার পূর্বে ধান ২৪ ঘন্টা ভিজানো হয়। এতে ধানের তুষের স্তর ভেদ করে ধানের ভিতর পানি ঢুকলে অ্যালুরন স্তরের থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন, পানিতে দ্রবীভূত হয়ে পানির সাথে চালের দানা বা শস্যের ভিতর প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করে। এ সময় চালে পানিযোজন ও শর্করায় জেলাটিনাইজেশন ঘটে। এরপর ধান পানির বাষ্প দ্বারা অল্প সময় সিদ্ধ করা হয় বিধায় ভিটামিন নষ্ট হয় না। ধান সিদ্ধ করার ফলে ধানের ভ্রূণ চালের সাথে খুব শক্তভাবে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে ধান ভাঙানোর সময় পুষ্টির অপচয় কম হয়। ধান ঢেঁকিতে ভাঙালে পুষ্টি অপচয়ের হার আরও কমে যায়। এ কারণে ঢেঁকি ছাঁটা সিদ্ধ চালের পুষ্টিমূল্য অন্য চাল অপেক্ষা বেশি। ১১০১

সারণি : প্রতি ১০০ গ্রাম আতপ ও সিদ্ধচালের খাদ্যোপাদান

ক্রমিক নং	খাদ্যোপাদান	আতপ চাল		সিদ্ধ চাল	
		ঢেঁকি ছাঁটা	কলে ছাঁটা	ঢেঁকি ছাঁটা	কলে ছাঁটা
১.	আমিষ (গ্রাম)	৭.৫	৬.৮	৮.৫	৬.৪
২.	শ্বেতসার (গ্রাম)	৭৬.৭	৭৮.২	৭৭.৪	৭৯.০
৩.	স্নেহ পদার্থ (গ্রাম)	১.০	০.৫	০.৬	০.৪
৪.	লৌহ (মি.গ্রাম)	৩.২	৩.১	২.৮	৪.০
৫.	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	১০	১০	১০	৯
৬.	ফসফরাস (মি. গ্রাম)	১৯০	১৬০	২৮০	১৪৩
৭.	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	২১	০.০৬	০.২৭	০.২১
৮.	রাইবোফ্লাভিন (মি.গ্রাম)	০.১৬	০.০৬	০.১২	০.০৫
৯.	নায়াসিন (মি.গ্রাম)	৩.৯০	১.৯০	৪.০	৩.৮
১০.	কিলোক্যালরি	৩৪৬	৩৪৫	৩৪৯	৩৪৬

উৎস : পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থা- সিদ্দিকা কবীর

সিদ্ধ চালের বৈশিষ্ট্য :

(১) সিদ্ধ চাল দেখতে উজ্জ্বল, গা মসৃণ এবং ভাত ঝরঝরে হয়।

(২) সিদ্ধ চালের ভাতের স্বাদ মিষ্টি গন্ধযুক্ত হয়।

(৩) সিদ্ধ চালের ভাতের মাড়ে পুষ্টি কম অপচয় হয়।

(৪) সিদ্ধ চালে পোকামাকড়ের আক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।

(৫) সিদ্ধ ধানের চাল হজমে বেশি সহায়ক।

(৬) সিদ্ধ চালের ভ্রূণ বা অঙ্কুর সহজে অপসারিত হয় না।

৩.৩ : আতপ ও সিদ্ধ চাল থেকে উৎপাদিত খাদ্য :

আতপ চাল থেকে উৎপাদিত খাদ্য

আতপ চাল থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দ্রব্যগুলো হচ্ছে-

(১) খিচুড়ি

(২) জাউভাত

(৩) পায়েস

(৪) ক্ষীর

(৫) জর্দা

(৬) পোলাও

(৭) বিরিয়ান ও তেহারি

(৮) ফিরনি

(৯) চালের গুঁড়ি বা আটা

(১০) চালের স্যাঁকা রুটি

(১১) চালের পাপড়

(১২) চালের গুঁড়ি দিয়ে বিভিন্ন পিঠা

(১৩) ফ্রায়েড রাইস

খিচুড়ি

পায়েস

পোলাও

বিরিয়ানি

চিত্র৷ খিচুড়ি, পায়েস, পোলাও, বিরিয়ানি

সিদ্ধ চাল থেকে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যগুলো নিম্নরূপ :

(১) ভাত	(৫) পান্তা ভাত
(২) বসাভাত বা বৌভাত	(৬) খিচুড়ি
(৩) মাড় ফেলা ভাত	(৭) মুড়ি
(৪) ভাতের মন্ড	(৮) নাড়ু ইত্যাদি।

৩.৪ আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে বিভিন্ন খাদ্য :

চালের গুঁড়ি : উন্নত মানের আতপ চাল সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তারপর উক্ত চাল পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। চাল ভালোভাবে ভিজে গেলে পানি সরিয়ে নিতে হয়। তারপর উক্ত চাল শিলপাটায় বেটে চালের গুঁড়ি করা হয়। মেশিনেও চালের গুঁড়ি করা যায়। সেক্ষেত্রে চাল ধুয়ে নিলে চলে। চালের গুঁড়ি রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে পলিব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। চালের আটা থেকে রুটি, ফিরনি, পিঠা ও বিভিন্ন ধরনের বড়া তৈরি করা যায়।

চিত্র : চালের গুড়ির রুটি

রুটি : চালের গুঁড়ি বা আটা ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে গরম পানিতে সিদ্ধ করে নিতে হয়। অতঃপর উক্ত আটা মরান করে ভালো করে ডলে খামির বানাতে হয়। তারপর উক্ত খামির রুটি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়। খামির থেকে ছোট ছোট বল বা গুঁটি করে পিড়ি ও বেলনে বেলে পাতলা ও গোল করে (গমের আটার

রুটির মতো) রুটি বানাতে হয়। গরম তাওয়াতে রুটি ভেজে নিতে হয়। চালের গুঁড়ির রুটি খুব নরম হয় এবং ঠাণ্ডা হলে সহজে ভেঙে যায়। আজকাল রুটি তৈরির জন্য বৈদ্যুতিক মেশিন ব্যবহার করা হয়। এত রুটি তৈরি ও ভাজা-একসাথে সম্পন্ন হয়।

ফিরনি : ফিরনি তৈরিতে পোলাও চাল (আতপ) চিনি, দুধ, বাদাম, পেস্তাবাদাম, কিসমিস, ছোট এলাচ গুঁড়ো ও গোলাপ জল প্রয়োজন হয়। প্রথমে চাল ৪-৫ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর শিল পাটায় মিহি করে বেটে নিতে হয়। দুধ গরম করে চালের গুড়ি মিশিয়ে জ্বালে বসাতে হয়। ঘন ঘন নাড়তে হবে, যাতে ধরে না যায়। একটু পর সবটা জমে আসবে। বেশ ভালো মতো হলে চুলা থেকে নামিয়ে চিনি মিশাতে হয়। এলাচ গুঁড়ো, গোলাপ জল, কিসমিস, বাদাম ও পেস্তাবাদাম কুচি দিয়ে ঘি মাখানো ছোট ছোট বাটিতে ঢেলে ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করতে হয়।

৩.৫ঃ বিভিন্ন পিঠা তৈরি :

বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে পিঠা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পিঠা নিজেরা খেয়ে যত না তৃপ্তি পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি আনন্দ পাওয়া যায় অতিথি আপ্যায়নে। বাংলাদেশে শীতকালের সঙ্গে শীতের পিঠার সম্পর্ক গভীর ও অনেক পুরোনোও। শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় শীতের পিঠা বানাবার আয়োজন। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত এই পিঠা বানানো এং খাওয়ানো চলে সমান তালে। শীতের পিঠার রকম যেমন অনেক, তেমটি খাওয়ার স্বাদও বিভিন্ন। শীতকাল ছাড়াও পহেলা বৈশাখে, নববর্ষে, বিবাহ অনুষ্ঠানে পূজা ও ঈদ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পিঠার ব্যবহার দেখা যায়। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতি ও কাজের ব্যস্ততায় গৃহিণীদের নিজ হাতে পিঠা তৈরি আর হয়ে ওঠে না। আজকাল শহরে শীতকালে ও নববর্ষের বৈশাখী অনুষ্ঠানে পিঠামেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পিঠা তৈরিতে সাধারণত চাল, গুড়, আটা বা ময়দা, তেল বা ঘি, এলাচ, কিসমিস, বাদাম, পেস্তা, সুজি, ক্ষীর. খিরসা, কলাই ডাল, ছোলার ডাল, মুগের ডাল, দুধ ও চিনির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রকার পিঠাগুলো হচ্ছে– পাটিসাপটা, চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা, দুধপুলি, মুগ পাকন, চন্দ্রপুলি, তালের পিঠা, দুধ চিতই, নকশি পিঠা, কলার পিঠা, দই মালপোয়া, পাতা পিঠা, কাটা পিঠা, তেল ভাজা পিঠা ইত্যাদি।

(ক) পাটিসাপটা : এই পিঠা তৈরিতে হাতে করা আতপ চালের গুঁড়ি, বেকিং পাউডার, চিনি বা গুড়, দুধ, খিরসা বা ক্ষীর, ছোট এলাচ, তেল বা ঘি, পরিমানমতো নিতে হয়। দুই কাপ পানিতে চালের গুঁড়ি, বেকিং পাউডার, গুড় বা চিনি, দুধ মিশিয়ে গোলা তৈরি করে এক থেকে দেড় ঘন্টা ঢেকে রেখে দিতে হয়। এবার খিরসা বা ক্ষীর চটকিয়ে চিনি ও এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে নিতে হয়। হাঁড়িতে দুই চামচ ঘি গরম করে ঢেলে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নামাতে হয়।

চিত্র : পাটি সাপটা পিঠা

এবার পাত্র গরম করে কিছু তেল দিয়ে সারা পাত্র চামচ বা ন্যাকড়া দিয়ে মেখে নিতে হয়। এখন অল্প আঁচে বড় চামচের ১ চামচ গোলা দিয়ে পাতলা করে রুটির মতো সম্পূর্ণ পাত্রে ছড়িয়ে দিতে হয়। গোলার উপরিভাগ শুকিয়ে এলে রুটির এক পাশ পরিমাণমতো ক্ষীরের পুর লম্বা করে দিয়ে ডিমের

ওমলেটের মতো মুড়ে সামান্য ভেজে তুলতে হয়। এমনি করে প্রতিবার গোলা দেওয়ার পূর্বে পাত্রে ন্যাকড়া দ্বারা তেল মেখে নিয়ে আরও কয়েকটি পাটিসাপটা পিঠা বানায়ে ভেজে তুলতে হয়। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করতে হয়। পিঠার মাঝে পুর হিসেবে মাখা সন্দেশ বা পাটালি গুড়ে জ্বাল দেওয়া নারিকেলের কোরা ব্যবহার করা যায়।

চিত্রঃ দুধ পুলি পিঠা

(খ) দুধ পুলি : এই পিঠা তৈরিতে আতপ চালের গুঁড়ি, দুধ, চিনি, নারিকেল কোরা, খিরসা বা কনডেনসড মিল্ক, তেল, এলাচ গুঁড়ো পরিমাণমতো নিতে হয়।

প্রথমে একটি পানিশূন্য হাঁড়িতে নারিকেলের কোরা, চিনি, দুধের ক্ষীরসা বা কনডেন্সড মিল্ক মিশায়ে জ্বাল দিয়ে পুলি পিঠার পুর তৈরি করে রাখতে হয়। এরপর একটি হাঁড়িতে আধা পিটার পানি ফুটাতে হবে। পানি ভাল করে ফুটে গেলে এতে চালের গুঁড়ি, লবণ ও সামান্য তেল দিয়ে সিদ্ধ করে নামাতে হয়। একটু ঠান্ডা হলে আটা মাখার মতো করে রুটি তৈরির মন্ড বা খামির তৈরি করতে হয়। রুটির ভিতরে নারিকেল দুধের পুর অল্প অল্প করে ভরে পিঠার মুখ সুন্দর করে মুড়ে দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। এর আকৃতি হবে অর্ধচন্দ্রাকার। পাত্রে তেল গরম করে হালকা আঁচে বাদামি রং করে পুলি ভেজে নিতে হয়।

এবার একটি হাঁড়িতে দুধ, গুড় বা চিনি, এলাচ ও দারুচিনি একত্রে জ্বাল দিতে হয়। কিছুটা ঘন হয়ে এলে এতে পুলিগুলো একটি একটি করে ছাড়তে হয়। খুব সাবধানে খুন্তি দিয়ে নাড়তে হবে যাতে ভেঙে বা লেগে না যায়। দশ-পনেরো মিনিট চুলায় হালকা আঁচে রেখে নামাতে হয়। এ পিঠা গরম অথবা ঠান্ডা দুই ভাবেই খাওয়া যায়, তবে ঠান্ডা পিঠাই বেশি মুখরোচক।

(গ) চিতই পিঠা : এ পিঠা তৈরিতে আতপ চাল, খেজুরের গুড় বা নারিকেল কোরা, পিঠা তৈরির বিশেষ ধরনের সরা বা সাজ, বেগুনের বোঁটা বা ন্যাকড়া, সরিষার তেল ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।

প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে চালের গুঁড়ো গুলিয়ে ঘন করে গোলা তৈরি করে নিতে হয়। এখন পিঠা তৈরির বিশেষ ধরনের সরা ধুয়ে-মুছে চুলায় বসাতে হবে। এই সরায় ছোট ছোট অনেক গর্ত থাকে। পিঠা ভাজার এই সরাকে তাওয়াও বলে। প্রত্যেকটি গর্তে একটি করে পিঠা ভাজা যায়। এখন সরার সকল গর্তে বেগুনের বোঁটা বা ন্যাকড়া দিয়ে সরিষার তেল মাখিয়ে নিতে হয়। এরপর চালের গোলা সরার সকল বাটিতে ভরে আঁচ কমিয়ে রেখে অন্য একটি সরা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। মিনিট পাঁচেক পর সরার ঢাকনা খুলে দেখা যাবে যে পিঠাগুলোর উপরের দিকের গোলা সিদ্ধ হয়ে ফুলে ওঠে। তখন খুন্তি দিয়ে আস্তে পিঠা তুলে নিতে হয়। যদি গোলা ঠিকমতো শুকায়ে পিঠা তৈরি হয়ে থাকে তবে চামচ বা খুন্তি দিয়ে পাশে আলতো করে চাপ দিলে পিঠা উঠে আসে। পিঠা তুলে পুনরায় ন্যাকড়ার কাপড়ে তেল লাগিয়ে উক্ত সাজ বা সরার খাঁজ মুছে গোলা দিতে হয়। এইভাবে পর পর পিঠা বানাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সবগুলো পিঠা বানানো না হওয়া পর্যন্ত চুলা থেকে সাজ নামানো না হয়। তৈরি পিঠা নারিকেল কোরা ও ঝোল গুড় সহযোগে পরিবেশন করা হয়। এ পিঠা জ্বাল দেয়া ঘন খেজুরের রস ও দুধের মিশ্রণে সারারাত ভিজিয়ে শীতের সকালে পরিবেশন করলে খুবই সুস্বাদু লাগে। চিতই পিঠাকে অনেকে সাজের পিঠাও বলে।

২০২৫

চিত্র : সরা বা সাজে চিতই পিঠা ভাজা হচ্ছে

(ঘ) ভাপা পিঠা : চালের গুঁড়ি, পাটালি গুড়, লবণ, নারিকেল কোরা, দুধ বা পানি সহযোগে এ পিঠা বানানো যায়। চালের গুঁড়ির সাথে অল্প দুধ বা পানি ভালো করে মিশিয়ে চালনিতে চেলে নিতে হয়। হাঁড়িতে চার ভাগের তিন ভাগ পানি নিয়ে চুলায় চড়াতে হয়। হাঁড়ির মুখ ঢাকনা বা সরা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। ঢাকনার ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র রেখে চারদিকে আটা বা ময়দা গুলে লাগিয়ে দিতে হয় যাতে করে হাঁড়ির

চিত্র : ভাপা পিঠা

বাষ্প চতুর্দিক দিয়ে বের না হয়ে শুধু ছিদ্রপথে বের হয়। ছোট বাটি বা নারিকেলের আইচার মধ্যে অর্ধেক চালের গুঁড়ি নিয়ে তারপর অল্প নারিকেলের কোরা ও খেজুরের গুড়ের টুকরা নিয়ে পুনরায় চালের গুঁড়ি দিয়ে বাটি ভরতে হয়। পাতলা ভিজা কাপড় দিয়ে পিঠার বাটি ঢেকে ঢাকনার ঠিক মাঝখানে ছিদ্রপথের উপর উল্টো করে বসাতে হয়। সতর্কতার সাথে বাটিটা এমনভাবে তুলে আনতে হয় যাতে পিঠা ভেঙে না যায়। পরে পাতলা কাপড় দিয়ে পিঠা ঢেকে দিতে হয়। তারপর একটি বড় ঢাকনা বা সরা দিয় সম্পূর্ণটা ঢেকে দিতে হয়। মিনিট পাঁচেক পর পিঠা সিদ্ধ হলে ন্যাকড়াসহ তুলে আনতে হয়। পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কিনা হাতের আঙুল দিয়ে পিঠার উপরি ভাগে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। এভাবে পিঠা তৈরি করে ট্রেতে সাজিয়ে গরম অবস্থায় খেতে হয়। এক সাথে অনেকগুলো পিঠা তৈরির জন্য বড় হাঁড়ি ও অনেকগুলো ছিদ্রযুক্ত বড় সরা বা ঢাকনা ব্যবহার করা যায়।

ভাপা পিঠার মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে নারিকেল কোরা আর গুড়ের পরিবর্তে পনির কুচি, চিংড়ি মাছের কুঁচো বা গোস্তের কিমাও দেয়া যেতে পারে। তবে এই পিঠা বানানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে পিঠার দুই দিকের স্তর অতিরিক্ত পুরু না হয়।

২০২২

(ঙ) ভাজা পিঠা : চালের গুঁড়ি, মুগডাল, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, আদাকুচি, জিরা গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, নারিকেল কোরা, চিনি, সরিষার তেল, শুকনা মরিচ ইত্যাদি এই পিঠা তৈরিতে লাগে।

প্রথমে ডাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। কড়াই চুলায় চড়িয়ে নারিকেল কোরা ও চিনি একসঙ্গে মেখে কড়াইতে দিয়ে খুন্তি দিয়ে নেড়েচেড়ে নারিকেলের পুর তৈরি করে পাত্রে ঢেলে রাখতে হয়। কড়াই ধুয়ে আবার চুলায় চাপায়ে সামান্য তেল ঢালতে হয়। তেল গরম হলে তেজপাতা, শুকনো মরিচ ও জিরা ফোড়ন দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে ডাল ভেজে প্রেসার কুকারে দিতে হয়। দুকাপ পানি, লবণ, হলুদ, আদা কুচি, জিরে গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, কুকারে ডালের সঙ্গে দিয়ে কুকারের মুখ বন্ধ করতে হয়। দুইবার বাঁশি দিলে চুলা থেকে নামায়ে ঠাণ্ডা করে ঢাকনা খুলে দিতে হয়। এবার ডাল কড়াইতে নিয়ে জ্বাল দিলে ফুটতে শুরু করলে তা চালের গুড়িতে ঢেলে দিতে হয়। সিদ্ধডাল ও চালের গুড়ি ভালোমতো মেখে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করতে হয়। খামির থেকে ছোট ছোট বল নিয়ে রুটি করে। রুটির ভিতর অল্প অল্প করে নারিকেলের পুর ভরে গোলাকার পুলি তৈরি করে মুখ হাত দিয়ে টিপে বন্ধ করতে হবে।

চিত্র : ভাজা পিঠা

অবশ্যই পুলিগুলো ছোট ছোট আকারের থেকে হয়। এবার কড়াইতে আরও তেল দিয়ে চুলায় চেপে পুলিগুলো বাদামি করে ভেজে নিতে হয়।

৩.৬ পাপড় তৈরি :

পাপড় একটি সুস্বাদু নাস্তা। বিকেলে চায়ের সাথে পাপড় পরিবেশন করা যায়। শিশু-কিশোরদের নিকট এটি অতি মজাদার খাবার। চাল থেকে দু ধরনের পাপড় তৈরি করা যায়। যথা- ভাতের পাপড় ও চালের পাপড়।

ভাতের পাপড় : আতপ চালে পানি দিয়ে মাড় না ফেলে ভাতে সিদ্ধ করে রাখতে হয়। ঠান্ডা হলে পরিমাণমতো জিরা, মরিচের গুঁড়ো ও লবণ ভালোভাবে উক্ত ভাতের সাথে চটকে মেশাতে হয়। একটি কাঠের বাটার উপর বা থালার উপর পরিষ্কার ভিজা কাপড় পেতে মাখা ভাত ছোট ছোট গুটি আকারে সাজিয়ে নিতে হয়। পর পর চার দিন তা রোদে শুকাতে হয়। কাপড় থেকে গুটিগুলো তুলে নিয়ে স্টিলের বাসনে রেখে শুকিয়ে ছোট না হওয়া পর্যন্ত রোজ-রোদে শুকাতে হয়। শুকানো হয়ে যাবার পর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে বায়ুরোধী টিনের পাত্রে ভরে রাখতে হয়। পরিবেশনের সময় গরম তেলে ভেজে নিতে হয়।

চালের পাপড় : আতপ চাল এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরদিন পানি সম্পূর্ণ ঝরিয়ে শিল-পাটায় পিষে নিতে হয়। চুলায় পানি ফুটলে আস্তে আস্তে পেষা চাল পরিমাণমতো লবণসহ ফুটন্ত পানিতে মেশাতে হয়। জ্বাল দেওয়ার সময় ঘন ঘন নাড়তে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঘন হয়ে না যায়। দুইবার ফুটলেই নামিয়ে নিয়ে একটি মোটা বা বড় পলিথিন শীটের উপর একটু দূরে দূরে এক হাতা (গোল চামচ) করে চালের গোলা পাতলা করে ছড়িয়ে দিতে হবে। একবারে শুকিয়ে গেলে সাবধানে তুলে নিয়ে বায়ুরোধক টিনে ভরে রাখতে হবে। খাঁটি ঘি বা তেলে ভেজে খেলে খুবই মচমচ লগবে। খাবার সময় চিনি দিয়ে পরিবেশন করা যায়।

৩.৭ সিদ্ধ চাল থেকে ভাত, খিচুড়ি, নাড়ু ও ফ্রায়েড রাইস তৈরি :

সিদ্ধ চালের ভাত : ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য। এটি শস্যদানার মধ্যে পড়ে বলে কীভাবে রান্না করতে হয় তা সকলের জানা উচিত। প্রথমে পরিমাণমতো চাল বেছে ধান, কাঁকর, ময়লা ইত্যাদি ফেলে দিতে হয়। এরপর ডেকচিতে পরিমাণমতো পানি নিয়ে গরম করতে হয়। চাল ভালো করে ধুয়ে পানির সাথে ছেড়ে দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। ভাত যখন টগবগ করে ফুটে ওঠে তখন ঢাকনা খুলে হাতল বা খুন্তি দ্বারা সমভাবে নেড়ে দিতে হয়। এর ফলে সকল জায়গায় সমানভাবে তাপ লাগে এবং চাল সমভাবে সিদ্ধ হয়। চাল সমভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা জানবার জন্য কয়েকটি ভাত টিপে দেখলে খুব ছোট শক্ত দানা হাতে যখন অনুভূত হয়, তখন মনে করতে হবে যে ভাত হয়েছে এবং এর কিছুক্ষণ পর নামিয়ে মাড় ফেলতে হয়। মাড় ফেলে ভাতের হাঁড়ি বা ডেকচি উপুড় করে রাখলে আস্তে আস্তে সব মাড় পড়ে যায় এবং ভাত খুব ঝরঝরা সুন্দর হয়। কিন্তু এভাবে ভাত রাধলে ভাতের মূল্যবান পুষ্টি উপাদান ভিটামিন-বি এর অনেক অপচয় হয়।

বসাভাত বা বৌভাত : মাড় না ফেলে যে ভাত রান্না করা হয় তাকে বসাভাত বলে। এভাবে ভাত রান্নার জন্য যতটুকু চাল তার দেড় গুণ পানি নিতে হয়। যেমন এক কাপ চাল হলে দেড় কাপ পানি। নতুন চাল সিদ্ধ হতে কম পানি ও পুরানো চাল সিদ্ধ হতে বেশি পানি প্রয়োজন হয়। চাল ধুয়ে পানিতে নিতে হয়। তারপর জ্বাল দিলে কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধ হয়ে এলে দম বা হালকা আঁচে বসাতে হবে। দমে থাকাকালীন চামচ দিয়ে নেড়ে অর্থাৎ ওপরের ভাত নিচে, নিচের ভাত উপরে করে দিতে হয়। অথবা ডেকচি ঝাঁকিয়ে ভাত ওলট-পালট করতে হয়। কয়েকদিন এভাবে রাঁধলে পানি দেওয়ার আন্দাজ হয়ে যাবে। পরে আর মাপতে হবে না। মাড় না ফেললে ভাতের খাদ্যগুণ অনেক বেড়ে যায়। ভাত খুব সুস্বাদু হয়। অবশ্য খারাপ চালের ভাত খুব গন্ধ লাগে।

পান্তা ভাত : ভাতের মাঝে পানি দিয়ে রেখে অতঃপর তা খাওয়াকে পান্তাভাত বলে। পান্তা ভাতের সাথে লবণ, পোড়া-মরিচ, পেয়াজ, আলুভর্তা ও শুটকি রান্না দিয়ে ভোর বেলা খাওয়া হয়ে থাকে। শহরে পহেলা বৈশাখের সময় এর সাথে যোগ হয় ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ ও লতির তরকারি। ভাত ও পান্তা ভাতের মধ্যে পুষ্টির তেমন পার্থক্য নেই। দুটোতেই শর্করা থাকে তবে পান্তার পরিবেশনের উপর নির্ভর করে এর পুষ্টি।

পান্তার উপাকারিতা

১। মানবদেহের জন্য উপকারী বহু ব্যাক্টেরিয়া পান্তার মধ্যে বেড়ে ওঠে,

২। এর ফলে পেটের রোগ ভালো হয় এবং শরীরে তাপের ভারসাম্য বজায় থাকে।

৩। গরমে শরীর ঠাণ্ডা হয়,

৪। রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে,

৫। অ্যালার্জি জনিত রোগ ভালো হয়।

৬। আলসার ভালো হয়।

পুরনো সিদ্ধ চালের ভাত : পুরনো সিদ্ধ চাল বেছে ধুয়ে নিতে হয়। ফুটন্ত পানিতে চাল ঢেলে দিতে হয়। চাল সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতে হয়। চাল ও পানি একসাথে চুলায় দিলে কোন ক্ষতি হয় না। পুরনো সিদ্ধ চালের ভাত খুব নরম করে নামাতে হয়। এই ভাত ঠাণ্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়।

নতুন সিদ্ধ চালের ভাত : ভাত রান্নার ১ ঘণ্টা আগে চাল ধুয়ে রাখতে হয়। ফুটন্ত পানিতে চাল ঢেলে দিতে হয়। এই চাল সিদ্ধ হতে অল্প সময় লাগে। এই চালের ভাত একটু শক্ত থাকতে নামিয়ে মাড় বা ফেন ঝরিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে জাউ ভাতের মতো হয়ো যাবে। নতুন চালের ভাত পেটে অসুখ হওয়ার কারণে এই ভাতের মাড় ফেলে খাওয়া উচিত।

২০২২

ভাজা ভাত : ঘরে অনেক সময় ভাত বাসি হয়ে যায়। এই ভাত ভেজে খাওয়া যায়, তবে ভাত যেন নরম না হয়। নরম হলে ভাত বেশ ঝরঝরে থাকে না। কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে চুলায় বসিয়ে তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুঁচি ও শুকনা মরিচ দিতে হয়। এগুলো ভাজা ভাজা হলে পরিমাণমতো বাসিভাত কড়াইতে দিয়ে খুব সামান্য হলুদ, লবণ, গরম মসলা ও তেজপাতা দিয়ে নাড়তে হয়। ভাত ভাজা হলে নামিয়ে ফেলতে হয়। এই ভাত গরম গরম খেলেই ভালো লাগে। বেশি দেরি করলে, আর যদি আবহাওয়া গরম থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

খিচুড়ি : চাল ও মুগডাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। কড়াইয়ে ঘি, আদা, তেজপাতা নিয়ে চুলায় অল্প ভাজতে হয়। ডাল একটু ভেজে নিতে হয়। তারপর চাল, দারুচিনি, লবঙ্গ দিয়ে ভেজে পরিমাণমত পানি দিতে হয়। এরপর লবণ দিয়ে নেড়ে দিতে হয়। মিনিট পনেরো পর ফুটে উঠলে ঢেকে দিতে হয়। মৃদু জ্বালে ২০-২৫ মিনিট ফুটানোর পর হলুদ ও মরিচ দিলে ঝাল ভুনা খিচুড়ি তৈরি হয়। পরিবেশনের সময় পেঁয়াজ কুচি ভাজা ও ডিমের স্লাইস বা ডিম ভাজি দিলে উত্তম হবে। খিচুড়ির মধ্যে সবজির টুকরা, মটরশুঁটি, গাজর কুচি দিয়েও সবজি খিচুড়ি তৈরি করা যায়। অনেকে খিচুড়িতে পানির ভাব রেখে পাতলা খিচুড়ি করেন। তবে ঝরঝরা খিচুড়িরই বেশি চাহিদা।

খুদ ভাজা : চাল ভাঙ্গানোর পর মিল বা কল থেকে যে খুদ পাওয়া যায় তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে চুলায় ভেজে নিতে হয়। ভাজা খুদ ঠাণ্ডা করে বায়ুরোধী পাত্রে পিঠা বা চালের গুড়ি তৈরি করার জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

নাড়ু : পরিবারের বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানে নাড়ু তৈরি করা হয়। নাড়ু সকলের প্রিয় খাবার। শুকনো খাবার হিসেবে এটি বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। চাল থেকে অনেক ধরনের নাড়ু হয়। যেমন- আনন্দ নাড়ু, মনোহর নাড়ু, তিলের নাড়ু, ঝাল নাড়ু ইত্যাদি। প্রথমে পরিষ্কার সিদ্ধ চালের গুড়োঁর সাথে দই মিশিয়ে নিতে হয়। গোলা তৈরি হলে কড়াইয়ে ঘি দিয়ে ভেজে নিতে হয়। তারপর চিনির রসে ফেলে তা থেকে গরম অবস্থায় নাড়ু পাকিয়ে নিতে হয়। ঠাণ্ডা হলে নাড়ু করা যায় না।

চিত্র : ফ্রায়েড রাইস

ফ্রায়েড রাইস : কড়াইয়ে পানি ফুটে উঠলে পোলাও চাল দিতে হয়। সাথে লবণ মিশিয়ে মাঝারি আঁচে ভাত সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ফুটাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে ভাত যেন গলে না যায় এবং প্রত্যেকটি ভাত আলাদা থাকে। মাড় ফেলে ভাত শক্ত ঝরঝরে করে নিতে হবে। গাজর ও ওলকপি ছোট ছোট টুকরা করে ও মটরশুঁটি আলাদা ভাবে সিদ্ধ করতে হয়। পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ কলি কুচি করতে হয়। মাংস স্লাইস করতে হয়। একটি থালায় মাংস এবং সবজিগুলো নিয়ে তাতে ভাত রেখে, লবণ, গোল মরিচের গুঁড়ো ও স্বাদ লবণ ছিটিয়ে দিতে হয় এরপর ডিম ভেঙ্গে স্বাদ লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে ফেটতে হয়।

বড় হাঁড়ি বা কড়াইয়ে তেল গরম করতে হয়। তেলে মাংস দিয়ে ৫-৬ মিনিট এবং গাজর ও ওলকপি দিয়ে ৪-৫ মিনিট ভাজতে হয়। তারপর পেঁয়াজ ও ফেটানো ডিম দিয়ে নাড়তে হয়। ৭-৮ মিনিট ভাজার পর ডিম কিছুটা জমাট বাঁধলে ভাত দিয়ে নাড়তে হয়। সয়াসস দিতে হয়। পেঁয়াজ কলি দিয়ে ফ্রায়েড রাইস নামিয়ে নিতে হয়। শুধু চিংড়ি মাছ, ডিম, মুরগির মাংষ দিয়েও ফ্রায়েড রাইস রান্না করা যায়।

অনুশীলনী-৩

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মুড়ি তৈরিতে কোন জাতের চাল লাগে?
২. কীভাবে বুঝা যাবে যে বালু মুড়ি ভাজার উপযোগী হয়েছে?
৩. মুড়ি থেকে কী কী খাবার তৈরি করা যায়?
৪. মেশিনে চিড়া করার জন্য কী করা হয়?
৫. চিড়ার বিভিন্ন খাবার গুলো কী কী?
৬. খৈ তৈরিতে কোন জাতের ধান ব্যবহার হয়?
৭. আতপ চাল কাকে বলে?
৮. আতপ চালের পুষ্টিমূল্য কম কেন?
৯. আতপ চাল অধিকতর পরিষ্কার করার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?
১০. ঢেঁকিছাঁটা চাল কেন উন্নত মানের হয়?
১১. শহরের লোকেরা কেন সাদা মসৃন চাল পছন্দ করে?
১২. পুরানো চাল কেন উন্নত পুষ্টিমানের হয়?
১৩. চিড়ার পায়েসে কী কী উপকরণ লাগে?
১৪. জেলেটিনাইজেশন বলতে কী বুঝায়?
১৫. আতপ চালের গুঁড়ি থেকে কী কী খাবার তৈরি হয়?
১৬. ফিরনি তৈরিতে কী কী উপকরণ লাগে?
১৭. প্রধান ১০টি পিঠার নাম লেখ।
১৮. পিঠা তৈরিতে কী কী লাগে?
১৯. পাটিসাপটা পিঠার পুরে কী কী দেয়া য়ায়?
২০. পুলি পিঠার আকৃতি কেমন?
২১. সাজ বা সরার কাজ কী?
২২. ভাপা পিঠা তৈরিতে কী কী লাগে।
২৩. ভাপা পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কিনা কীভাবে বুঝা যায়?
২৪. ভাতের মাড় ফেললে কী অপচয় হয়?
২৫. বসাভাত কাকে বলে?
২৬. বসাভাতে চাল ও পানির অনুপাত কত?
২৭. চালের বিভিন্ন প্রকার নাড়ুর নাম কী.
২৮. পান্তা ভাত বলতে কী বুঝায়?
২৯. মুড়ি তৈরির মেশিনের দুটি অংশের নাম কী কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মিষ্টি মুড়ি কীভাবে তৈরি করতে হয় বর্ণনা কর?

২. চিড়ার পোলাও তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. চিড়া ভাজা কীভাবে তৈরি করতে হয়?

৪. ঢেঁকি ছাঁটা ও কলেছাঁটা চালের পুষ্টিমান নির্ণয় কর।

৫. সিদ্ধচাল রান্নার নিয়ম লেখ।

৬. সিদ্ধ চালের বৈশিষ্ট্য কী কী?

৭. আতপচাল ও সিদ্ধচাল থেকে উৎপাদিত খাদ্যগুলো কী কী?

৮. চালের গুঁড়ির ফিরনি কীভাবে তৈরি করে?

৯. বৌভাত বা বসাভাত তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১০. খিচুড়ি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১. নাড়ু কীভাবে তৈরির করে?

১২. ধান থেকে খৈ তৈরি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৩. পান্তা ভাতের উপাকারিতা লেখ।

১৪. মুড়ি তৈরির যান্ত্রিক পদ্ধতির ফ্লোপচার্ট লেখ।

রচনামুলক প্রশ্ন

১. মুড়ি, মুড়ির মোয়া ও ঝালমুড়ি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুড়ি তৈরির পদ্ধতি ও প্রবাহ চিত্র বর্ণনা কর।

৩. ধান থেকে চিড়া ও চিড়ার পায়েশ প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।

৪. আতপ ও সিদ্ধ চালের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৫. সিদ্ধচালের পুষ্টিমূল্য আতপ চাল অপেক্ষা বেশি, ব্যাখ্যা কর।

৬. আতপ চাল থেকে উৎপাদিত খাদ্যগুলো কী কী? আতপচালের গুঁড়ি থেকে রুটি ও ফিরনি তৈরি বর্ণনা কর।

৭. পাটিসাপটা অথবা দুধপুলি পিঠা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮. চিতই পিঠা বা ভাপা পিঠা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৯. পাপড় কী? চালের পাপড় ও ভাতের পাপড় তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১০. খিচুড়ি ও ফ্রায়েড রাইস তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অধ্যায় ৪

ডাল ফসলের জাত, পুষ্টি, সংরক্ষণ ও মিলিং

ভূমিকা : ডাল লিগিউম জাতীয় রবি মৌসুমের ফসল। এটি লিগুমিনেসি পরিবারের পেপিলেওনেসি উপ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারের যে সমস্ত ফসলের পরিপক্ব ও শুকনো বীজ আহারোপযাগী সেগুলোকেই ডাল বা Pulse বলে। অবশ্য এদের কোন কোন উদ্ভিদের কাঁচা শুঁটি বা বীজ তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। মসুর, মুগ, মাষকলাই, ছোলা, খেসারি, মটরশুঁটি, অড়হর ফেলন সিম প্রভৃতি শুঁটি জাতীয় দানা যা মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাই ডালশস্য বা Pulse Crop। সাধারণত খোসা ছাড়ানোর পর যুক্ত বা বিযুক্ত বীজপত্রগুলোকে ডাল বলে।

লিগুমিনেসি পরিবারের বৈশিষ্ট্য : এ পরিবারের ফসলের বৈশিষ্ট্য হলো, এদের শিকড়ের গুটিতে বসবাসরত ব্যাক্টেরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ (Fixation) করে জমি উর্বর করে। ফলে এ ফসলে নাইট্রোজেন সার কম দিলেই চলে।

আবাদ মৌসুম ও গুরুত্ব : শীতের শুরুতে ডাল চাষ শুরু হয়ে বৈশাখে ডাল ফসল কৃষকের ঘরে ওঠে। অন্যান্য ফসল অপেক্ষা ডালে বেশি আমিষ থাকে। ডালের আমিষ মানবদেহ সহজে গ্রহণ করতে পারে। যারা মাছ-মাংস ক্রয় করে খেতে পারে না তারা স্বল্পমূল্যে ডাল খেয়ে আমিষের অভাব পূরণ করে। এ কারণে ডালকে গরিবের মাংস বা Poor man's meat বলে। আমিষ ছাড়াও ডালে স্নেহ, খনিজদ্রব্য, আঁশ ও খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। প্রাণিখাদ্য হিসেবে ডালের সবুজ ও কাঁচা গাছ, ডাল ও ডালের খোসা এবং ভুসি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার হয়। ডালের মধ্যে মসুর, মুগ, বুট ও ছোলার ডালের জনপ্রিয়তা বেশি। মুগ ডালের ফলন কম হয় বলে বাজারে মূল্য বেশি থাকে। রান্নার পর সুগন্ধ ও স্বাদের জন্য মুগ ডাল শীর্ষস্থানীয়।

বাংলাদেশে ডাল উৎপাদন খুবই সম্ভাবনাময়। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৯ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে মোট ডাল ফসলের উৎপাদন হয় ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার মেট্রিক টন। ডালের ফলনে আমাদের দেশের মোট চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। পুষ্টিবিদগনের মতে একজন মানুষের দৈনিক ডালের চাহিদা ৪৫ গ্রাম। সে হিসাব মতে আমাদের প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকার ডাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় ডালের ব্যবহারে নিম্নের তিনটি কাজ সম্পন্ন হয়। যেমন–

(১) দানা জাতীয় শস্য এবং ডালের মিশ্রিত খাদ্য শিশুর দেহবৃদ্ধি এবং বয়স্কদের শরীর রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(২) ডাল ভিটামিন বি (রিবোফ্লাভিন ব্যতীত)-এর উৎকৃষ্ট উৎস। এতে যথেষ্ট পরিমাণ থায়ামিন বা ভিটামিন-বি১ আছে যা বেরিবেরি রোগের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

(৩) ডাল ও দানা জতীয় শস্যে ভিটামিন-সি এর অভাব আছে, কিন্তু অঙ্কুরিত ডালের দানায় যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকে। যেমন– ছোলা ও মুগের অঙ্কুর।

৪.১ বিভিন্ন প্রকার ডালের জাত :

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) (জয়দেবপুর, গাজীপুরে)- এর ডাল গবেষণা কেন্দ্র থেকে অবমুক্ত বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতের নাম, উৎপাদনের মৌসুম, হেক্টরপ্রতি ফলন, জীবনকাল ও গাছের বৈশিষ্ট্য নিম্নের ছকে দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	জাতের নাম	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
০১.	বারি ছোলা-৫	রবি	১.৮-১.৯	১২৫-১৩০	বীজের আকার ছোট ধূসর বাদামি বর্ণের।
০২.	বারি ছোলা-৬	রবি	১.৮-২.০	১২৫-১৩০	বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতি ও মসৃণ, রঙ উজ্জ্বল বাদামি।
০৩.	বারি ছোলা-৭	রবি	২.৫-২.৮	১২৫-১৩০	বীজের আকার কিছুটা গোলাকতি মসৃণ, রঙ উজ্জ্বল বাদামি।
০৪.	বারি ছোলা-৮	রবি	১.৫০-১.৬০	১২৫-১৩০	কাবুলি টাইপ, গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সে.মি. পত্র ফলকগুলো বড় আকারের।
০৫.	বারি ছোলা-৯	রবি	১.৫০-২.৫	১২৫-১৩০	রোগ প্রতিরোধী ও উচ্চফলনশীল।
০৬.	বারি মসুর-৫	রবি	২.০-২.২	১১০-১১৫	বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা, বীজের রঙ লালচে বাদামি।
০৭.	বারি মসুর-৬	রবি	২.০-২.৩০	১১০-১১৫	বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা, বীজের রঙ লালচে বাদামি।
০৮.	বারি মসুর-৭	রবি	১.৬০-২.২	১১৫-১২০	বীজের আকার বড়, বীজের রঙ লালচে বাদামি।
০৯.	বারি মসুর-৮	রবি	২.২-২.৩	১১৫-১২০	বীজের আকার বড়, বীজের রঙ লালচে বাদামি
১০.	বারি খেসারি-১	রবি	১.৪-১.৬	১২৫-১৩০	পাউডারি ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধী।
১১.	বারি খেসারি-২	রবি	১.৫০-২.০	১২৫-১৩০	পাতা স্থানীয় জাতের তুলনায় বেশ চওড়া।
১২.	বারি খেসারি-৩	রবি	১.৫-১.৭	১৩০-১৩৫	ওডাপ oxalyl Di amino Propinisacid (ODAP) এর পরিমাণ ০.০৪%
১৩.	বারি খেসারি-৪	রবি	০.৭২-১.০৮	১১৪-১১৭	একটু লম্বাকৃতির।
১৪.	বারি মুগ-২	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.২-১.৩০ ১.৫-১.৬০ ১.০-১.১০	৬০-৬৫ দিন	দিন নিরপেক্ষ সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।
১৫.	বারি মুগ-৩	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.২-১.৩ ১.৩-১.৪ ১.০-১.১	৬০-৬৫ দিন	দিন নিরপেক্ষ সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।
১৬.	বারি মুগ-৪	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৩-১.৪ ১.৪-১.৫ ১.২-১.৩	৬০-৬৫ দিন	সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। জাতটি দিন নিরপেক্ষ।
১৭.	বারি মুগ-৫	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৭-১.৮ ২.০-২.১ ১.৫-১.৬	৫৫-৬০ দিন	সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। প্রায় সবগুলো ফল একসাথে পাকে।

২০২২

১৮.	বারি মুগ-৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.১ ১.৭-১.৮	৫৫-৫৮ দিন	সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। প্রায় সবগুলো ফল একসাথে পাকে।
১৯.	বারি মুগ-৭	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.২ ১.৭-১.৮	৬০-৬২ দিন	সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। প্রায় সবগুলো ফল একসাথে পাকে।
২০.	বারি মুগ-৮	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭ ১.৫-১.৬	৫৬-৬০ দিন	সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। প্রায় সবগুলো ফল একসাথে পাকে।

৪.২ বিভিন্ন প্রকার ডাল বীজের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি :

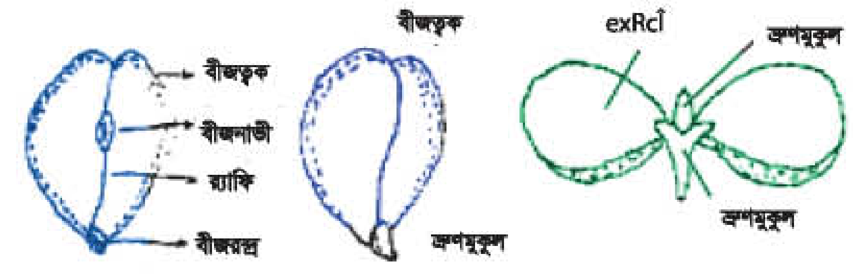

চিত্র: ছোলা বীজের বিভিন্ন অংশ

চিত্র : মসুর বীজের বিভিন্ন অংশ

৪.৩ ডাল বীজের পুষ্টিমান

ডালের পুষ্টিমান : ডাল অত্যন্ত পুষ্টিকর দানাদার খাদ্যশস্য। এই শস্যে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। অন্যান্য দানা জাতীয় শস্যের তুলনায় যে কোনো ডালে আমিষের পরিমাণ বেশি। ডাল ও চাল মিশ্রিত খিচুড়ি শিশু ও বয়স্কদের রেরি বেরি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। অঙ্কুরিত ডালের অঙ্কুরে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকে।

ডালের পুষ্টি উপাদান :

(১) প্রোটিন : ডালে ১৮-২৫% প্রোটিন থাকে। ডালের প্রোটিনের মধ্যে গ্লোবিউলিন-৬৬%, অ্যালবুমিন ১৪%, গ্লুটোনিন-৪.৮% ও প্রোলামিন থাকে। ডালের প্রোটিন গমের চেয়ে দ্বিগুণ এবং কলে ছাঁটা চালের ১৪ গুণ। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রোটিন প্রধান খাদ্যের তুলনায় ডালে প্রোটিনের পরিমাণ কম নয়। কিন্তু

এই প্রোটিন মাছ ও মাংসের মতো উৎকৃষ্ট শ্রেণির নয়। ১০০ গ্রাম ডালের প্রোটিন ১০০ গ্রাম মাংসের প্রোটিনের সমান, ১০০ গ্রাম ডিমের প্রোটিনের দ্বিগুণ এবং ১০০ গ্রাম দুধের প্রোটিনের ৭ গুণ সমান। সুতরাং আমাদের মতো দরিদ্র দেশে অল্প ব্যয়ে ডাল থেকেই অধিকাংশ প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু ডালের প্রোটিনে কোনো কোনো অ্যামাইনো এসিড কম থাকায় এর সহিত কিছু প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন প্রকার ডালে আবার বিভিন্ন রকমের অ্যামাইনো এসিড থাকে তাই প্রতিদিন একই ডাল না খেয়ে একেক দিন একেক রকম ডাল বা পাঁচ মিশালী ডাল খাওয়া উচিত। চাল ও ডালের প্রোটিন পরস্পরের পরিপূরক।

(২) শর্করা : ডালে শর্করা থাকে ৬০%-৬৫%, স্টার্চ থাকে ৪৭-৫৩% এবং চিনি থাকে ৭.৯% । শ্বেতসার ও আমিষের জন্য ডাল দানাশস্যের ন্যায় ক্যালরিযুক্ত খাদ্য। ১০০ গ্রাম ডাল থেকে ৩৪৬ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

(৩) স্নেহ পদার্থ : ডালে স্নেহ পদার্থ খুব কম থাকে, মাত্র ১-২%। তবে ছোলার ডালে ৫% স্নেহ পদার্থ থাকে।

(৪) ভিটামিন : ডাল ভিটামিন-বি১ (থায়ামিনের) এর ভালো উৎস। এ ছাড়া ভিটামিন-এ, রিবোফ্লাবিন ও নায়াসিন ভিটামিন পাওয়া যায়। ছোলা, মুগ, মাষকলাইয়ের বীজ খোসাসহ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরিত হয়ে ভিটামিন-সি তৈরি করে অঙ্কুরিত ডালের পুষ্টিমূল্য বেশি। ভিজানোর ফলে থায়ামিন পানিতে মিশে ডালের দানার ভিতরে প্রবেশ করে। মসুর ডালে ক্যারোটিন পাওয়া যায়। রান্না করার সময় ডালে 'বি' ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

(৫) মিনারেলস বা খনিজ পদার্থ : প্রতি ১০০ গ্রাম ডালে ৮-১০ মি: গ্রাম লৌহ, ১০০-২০০ মি: গ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৪২০- ৬২০ মি: গ্রাম ফসফরাস থাকে। মসুর ও মটর ডালে অন্যান্য ডালের চেয়ে লৌহ কম থাকে। অন্যদিকে মাষকলাই, ছোলার ডাল ও সয়াবিনে লৌহের পরিমাণ বেশি থাকে।

ডালের পুষ্টি উপাদানগুলো দেহের বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রক্তশূন্যতা, বেরি বেরি ও স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতা, প্রতিরোধে সহায়তা করে। ডালের খোসা বা ভুসিতে সিলিকার পরিমাণ খুব বেশি নয়। ভুসিতে আঁশ জাতীয় খাদ্য থাকে ১৬% এবং প্রোটিনের পরিমাণ ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে। কাজেই ডালের খোসা গরু ছাগলের খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে। ডাল জাতীয় শস্যের সাথে অন্যান্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের তালিকা নিম্নের ছকে দেখানো হলো–

খাদ্য সমূহ	শক্তি (কিলোক্যালরি)	প্রোট্রিন (গ্রাম)	ননী/চর্বি (গ্রাম)	কার্বোহাইড্রেট (মিলিগ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	থায়ামিন (মিলিগ্রাম)	রিবোফ্লোবিন (গ্রাম)	বি-ক্যারোটিন
মসুর ডাল	৩৪৩	২৫.১	০.৭	৫৯.০	৬৯	৪.৮	০.৪৫	০.৪৯	২৭০
মাষকলাই ডাল	৩৪৭	২৪.০	১.৪	৫৯.৬	১৫৪	৯.১	০.৪২	০.৩৭	৩৮
মুগডাল	৩৪৮	২৪.৫	১.২	৫৯.৯	৭৫	৮.৫	০.৭২	০.১৫	৪৯
ছোলারডাল	৩৭২	২০.৮	৫.৬	৫৯.৮	৫৬	৯০	৬.৩	০.৩৯	০.৪১
খেসারিডাল	৩৪৫	২৮.২	০৬	৫৬.৬	৯০	৬.৩	০.৩৯	০.৪১	১২০
চাল	৩৫৬	৬.৪০	০.৪	৭৯.০	৯	৪.০	০.২১	০.০৯	-

গমের আটা	৩৪১	১২১	১.৭	৬৯.৪	৪৮	১১.৫	০.৪৯	০.২৯	২৯
গমের ময়দা	৩৪৮	১১.০	০.৯	৭৩.৯	২৩	২.৫	০.১২	০.৭	২৫
সয়াবিন	৪৩২	৪৩.২	১৯.৫	২০.৯	২৪০	১১.৫	০.৭৩	০.৭৬	৪২৬
চিনাবাদাম	৫৬৭	২৫.৩	৪০.৯	২৬.১	৯০	২.৮	০.৪৫	০.১৩	৩৭
হাঁসের ডিম	১৮১	১৩.৫	১৩.৭	০.৮	৭০	৩.০	০.৯০	০.২৬	৫৪০
গরুর দুধ	৬৭	৩.২	৪.১	৪.৪	১২০	০.২৫	০.১২	০.১৯	২০
রুই মাছ	৯৭	১৬.৬	১.৪	৪.৪	৬৫০	১.০	০.৫০	০.১৪	-
মুরগি	১০৯	২৫.৯	০.৬	-	২৫	-	-	০.১৪	১৪৫

উৎস : বাংলাদেশে মসুরের চাষ-বি.এ.আর.আই

ডালে উপস্থিত পুষ্টিবিরোধী উপাদান : ডালে সাধারণত নিম্নলিখিত পুষ্টিবিরোধী উপাদান বা জৈব বিষ দেখা যায়।

এগুলো নিম্নরূপ-

(১) সয়াবিন- ট্রিপসিন ও হেমাগ্লুটানিন।

(২) শিমের বিচি- গয়টেরোজেনিক ফ্যাক্টর।

(৩) খেসারি ডাল- ল্যাথাইরাস।

উপরোক্ত বিষগুলো তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।

ল্যাথাইরিজম : খেসারির ডালে ল্যাথাইরিজম রোগের জন্য দায়ী ল্যাথাইরাস উপাদান পাওয়া যায়। একনাগাড়ে ২-৩ মাসের বেশি সময় শুধু খেসারির ডাল খাওয়া উচিত নয়। এ ছাড়া প্রতিদিন ২০০ গ্রাম বা তার বেশি পরিমাণ খেসারির ডাল দীর্ঘদিন খেলে ল্যাথাইরিজম রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ রোগে হাত ও পা অবশ হয়ে প্যারালাইসিস বা অবশ রোগ হয়ে থাকে। তবে খেসারির ডাল ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পানি নিংড়ে ফেলে দিলে ক্ষতিকর ল্যাথাইরাস উপাদান কমে যায়। তাছাড়া ডাল গুঁড়া করে অন্য খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাবার তৈরি করা হয়। গোটা ডালের চেয়ে গুঁড়া করে বেসন হিসেবে খেলে সহজে হজম হয়।

চিত্র : ল্যাথাইরিজমে আক্রান্ত কিশোর

৪.৪ ডাল সংরক্ষণ :

সংরক্ষণের জন্য ডাল শুকানোর পদ্ধতি :

(১) ডাল বীজ সব সময়ই পরিষ্কার ও পাকা মেঝে অথবা প্লাস্টিকের শিটে পাতলা করে ছড়িয়ে দিয়ে শুকাতে হব।

(২) কোনো সময় বৃষ্টি হলে বীজ পুনরায় শুকিয়ে নিতে হবে।

(৩) সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতা কমিয়ে ৮-৯% এ আনতে হবে।

(৪) শুকানো ডাল কামড় দিলে যদি কট শব্দ হয় তবেই বোঝা যাবে বীজ সংরক্ষণ করার উপযোগী হয়েছে।

বীজ সংরক্ষণ পর্যায় : ডাল ফসল কাটার পর থেকে বীজ প্রক্রিয়াকরণ কাজ শুরু হয়। তবে ডাল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন–

(ক) **মাঠে সংরক্ষণ :** বীজ ফসল পাকার পর কাটার পূর্ব পর্যন্ত মাঠে থাকার সময়কে মাঠে সংরক্ষণ বুঝায়। বীজের মধ্যে যখন সবচেয়ে রসহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই বীজের পরিপক্বতা অবস্থা হয়। ডাল বীজের পরিপক্ব অবস্থায় রস থাকে ২৮-৩০ ভাগ।

(খ) **স্তূপাকার সংরক্ষণ :** ফসল বা বীজ কাটার পর বস্তা বস্তা বা পাত্রে রাখার উপযোগী অবস্থা করার পূর্বে পর্যন্ত সময়কে স্তূপাকার সংরক্ষণ বোঝায়। বীজ কাটার পর তাড়াতাড়ি মাড়াই, ঝাড়াই, পরিষ্কারকরণ ও শুকানো প্রয়োজন। তাছাড়া বীজে বেশি রস থাকার কারণে শ্বসন প্রক্রিয়া বেড়ে যাবে এবং তাপের সৃষ্টি হয়ে বীজ নষ্ট হয়ে যাবে। ডালবীজের বেলায় বীজ ছায়াতে বা রোদে শুকিয়ে ৮-১০ ভাগ আর্দ্রতায় নামিয়ে আনতে হয়।

(গ) **বস্তাবন্দী বা পাত্রে সংরক্ষণ :** বীজ মাড়াই, ঝাড়াই, পরিষ্কারকরণ ও শুকানোর পর বস্তাবন্দী বা পাত্রে রাখা থেকে বিতরণ বা বিক্রি করার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বস্তাবন্দী সংরক্ষণ বোঝায়। সংরক্ষণকালে বীজ যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এবং সংরক্ষণ পাত্র রাখার স্থান উঁচু, মাচা ঠান্ডা ও শুষ্ক হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

চিত্র : ডাল বীজ সংরক্ষণ

(ঘ) **বিতরণকালীন সংরক্ষণ :** বীজ বিতরণের জন্য বা বিক্রেতার নিকট পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বিতরণকালীন সংরক্ষণ বোঝায়। বীজ পরিবহনকালে ট্রেনে, ট্রাকে, নৌকা ইত্যাদি স্থানে সাময়িকভাবে রাখা হয়। এ সময়টুকু বিতরণকালীন সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত।

সংরক্ষণ পাত্রে ডাল ভরা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি :

(১) শুকানো ডাল বীজ সংরক্ষণ পাত্রে ভরে ভালোভাবে মুখ বন্ধ করতে হবে।

(২) শুকানোর পর ডাল বীজ ঠান্ডা করে তার পর সংরক্ষণ পাত্রে ভরতে হবে।

(৩) মাটির বা টিনের পাত্রের মুখ তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে যাতে পোকা বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

(৪) সংরক্ষণ পাত্র ঠান্ডা জায়গায় ইট, কাঠ বা মাচার উপরে রাখতে হবে।

(৫) সংরক্ষণ পাত্রের চার পাশ সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণ না হয়।

(৬) যদি কোনো কারণে পাত্র ভেঙ্গে অথবা কেটে যায় তবে ডাল বীজ আবার শুকিয়ে অন্য পাত্রে একই নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

সংরক্ষণ পদ্ধতি : ডাল বীজ বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তবে বীজের আর্দ্রতা ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর বীজের গুণাগুণ বহুলাংশে নির্ভর করে। নিম্নের সারণিতে বীজের বিভিন্ন পর্যায়ে কী পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে তা দেখানো হলো।

সারণি : বীজের আর্দ্রতার ওপর নির্ভর করে ডাল সংরক্ষণ

ক্রমিক নং	বীজের আর্দ্রতা	বীজের অবস্থা	সংরক্ষণের পর্যায়
১	২৮-৩০%	বীজ পরিপক্ব হয়	ফসল কেটে সংগ্রহ করতে হবে।
২	১৮-২০%	বীজ নষ্ট হতে পারে	ফসল কেটে তাড়াতাড়ি না শুকালে এবং স্তূপাকারে রাখলে বীজ নষ্ট হতে পারে।
৩	১২-১৪%	ছত্রাক গজাতে পারে	ফসল কেটে মাড়াই করে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে কটকটে না করলে ছত্রাক গজায়।
৪	১০-১২%	সাময়িক সংরক্ষণ করা যায়	৬-৮ মাস সংরক্ষণ করা যায় তবে পোকার আক্রমনের সম্ভাবনায় থাকে।
৫	৮-১০%	সংরক্ষণের উপযুক্ত আর্দ্রতা	এ অবস্থায় বায়ুরোধী পাত্রে দীর্ঘদিন রাখা যায় এবং পোকা আক্রমণ করতে পারে না।

সাধারণত তিন ভাবে ডাল সংরক্ষণ করা যায়-

(১) পলিথিনযুক্ত ছালার বস্তা : ডাল বীজ সংরক্ষণে পলিথিনযুক্ত ছালার বস্তা খুবই উপযোগী। পুরু পলিথিন ব্যাগ পাটের বস্তার ভিতরে ভরে এ ধরনের বস্তা তৈরি করা যায়। বস্তার মধ্যে ডালবীজ ভরে প্রথমে পলিথিনের মুখটি পুড়িয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ছালার ব্যাগের মুখ রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। প্রতি ১০০ কেজি ডালর বীজের জন্য একটি বস্তার খরচ পড়ে মাত্র ৩০-৩৫ টাকা। এ ধরনের ছালার বস্তা ২-৩ বছর ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে বস্তার ভিতরের পলিথিন ব্যাগ পরিবর্তন করে তা পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

চিত্র: পলিথিনযুক্ত বস্তা

(২) পলিথিনযুক্ত মাটির পাত্র : উন্নত পাত্রের ভিতরে পুরু পলিথিন ব্যাগ প্রবেশ করিয়ে ডাল সংরক্ষণ করা যায়। ডাল ফসলের বীজ পলিথিন ব্যাগে ভরে পলিথিনের মুখ মোমের শিখায় পুড়িয়ে সিল করে দেয়া হয়। পরে পাত্রের মুখ তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাত্রের ভিতর পলিথিন থাকায় বাহিরের

বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এধরনের পাত্রে ডাল বীজ এক বছর পর্যন্ত ভালো অবস্থায় রাখা যায়। সংরক্ষণকালে দ্বিতীয় বার শুকানোর প্রয়োজন হয় না। প্রতি ৪০ কেজি ডাল বীজের জন্য সংরক্ষণ পাত্রের খরচ পড়ে ৫০ টাকা মাত্র। এ ধরনের পাত্র ৩-৪ বছর ব্যবহার করা হয়। শুধু প্রয়োজনে ঢাকনাটি পরিবর্তন করতে হয়।

(ঙ) টিনের তৈরি পাত্র : কারখানাজাত একধরনের শীট দ্বারা এ ধরনের পাত্র তৈরি করা হয়। পাত্রের মুখ বন্ধ করার জন্য গোলাকার ঢাকনা চারদিকে সিল করার ব্যবস্থা থাকে। তবে সিলিং যুক্ত বা মুখ মিহি কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করলে বাহিরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এ ধরনের পাত্রে ডাল এক বছরের বেশি সময় ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের পাত্রের খরচ পড়ে ২০০ টাকা। এ পাত্র ১০-১২ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

চিত্র: মাটির পাত্র ও টিনের পাত্র।

৪.৫ গোলাজাত ডাল শস্যের ক্ষতিকারক পোকামাকড় :

বাংলাদেশে তিন প্রজাতির ডালের বিটল পোকা গুদামজাত শস্যে আক্রমণ করে থাকে। এদের তিনটি প্রজাতির নাম হলো

(১) ক্যালোসোব্রুকাস চাইনেনসিস (Callosobruchus Chinensis)

(২) সি. ম্যাকুলেটাস (C. Maculatus)

(৩) সি. এনালিস (C. Analis)

উপরের তিনটি প্রজাতির “বিটল পোকা” গুদামজাত ডালের ক্ষতি করে থাকে। ডাল গুদামে যতবেশি দিন থাকবে ক্ষতির পরিমাণ ও ততই বাড়তে থাকবে। এদের আক্রমণে শতকরা ১০০ ভাগ ডাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ডালের বিটল পোকাকে কোনো কোনো দেশে ‘কাউপির উইভিল’ (Cowpea Weevil) বলে থাকে।

এরা মুগ, মসুর, ছোলা, কলাই, অড়হর, খেসারি ও মাষকলাইসহ সব ধরনের ডাল খেয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়েই গুদামজাত ডালের ক্ষতি করে।

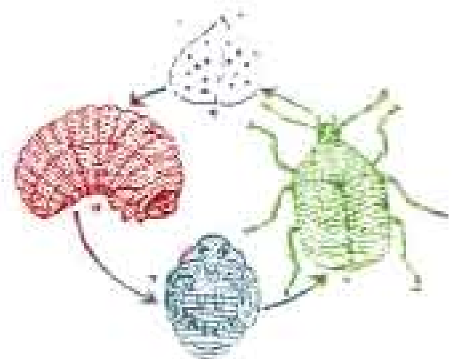

ক-লার্ভা খ-পিউপা গ-পূর্ণাঙ্গ পোকা ঘ-আক্রান্ত ডাল
চিত্র। ডালের বিটল পোকা

এ পোকা ডালের দানার খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হাল্কা হয়ে যায়। এতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং খাবার অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

৪.৬: গোলাজাত ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন :

(১) ডাল শস্য গুদামজাতকরণের পূর্বে দানা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়।

(২) ডালের দানা শুকিয়ে জলীয় পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে ১২% এর নিচে আনতে হবে।

(৩) বীজের জন্য টনপ্রতি ৩০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন ১০% গুড়া মিশিয়ে পোকার প্রতিরোধ করা যায়।

(৪) ফসটক্সিন ট্যাবলেট ২টি বড়ি-প্রতি ১০০ কেজি গুদামজাত ডালে ব্যবহার করতে হবে। এ বড়ি গুদামের আবদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করতে হবে।

(৫) এছাড়া ডাল বীজের সাথে সয়াবিন, বাদাম, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি তেল মিশিয়ে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪.৭: ডাল মিলিং বা ভাঙানো :

ডালের আবরণ অত্যন্ত শক্ত থাকে। এতে প্রায় ১৬ ভাগ আঁশ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমিষ থাকে। ডালের খোসা অপসারণ করা না হলে খোসাসহ ডাল খেয়ে হজম করা কষ্টসাধ্য হয়। তাই ডালের খোসা অপসারণ (বডি হাস্কিং) করা দরকার। ডালের খোসা অপসারণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় ডালের খোসার সাথে আহারোপযোগী অনেকাংশ চলে যায়। তাই খোসা অপসারণ প্রযুক্তি এমন হওয়া উচিত যাতে খাদ্যোপযোগী অংশের অপসারণ কম ঘটে। এটা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন-

(১) ডাল বীজের গুণগত প্রকৃতি।

(২) ডাল বীজের গঠন বা আকার।

(৩) ডাল বীজের আয়তন।

(৪) ডাল বীজের ভৌত গুণাবলি

(৫) ডাল বীজের পরিপক্বতা

(৬) ডাল বীজের আর্দ্রতা ইত্যাদি।

ডালের খোসা বীজপত্রকে খুব শক্তভাবে আবৃত করে রাখে। ডালের খোসা মূল ডালের ৫-১০ ভাগ হয়। আবার কোনো কোনো ডালের শতকরা প্রায় ৫-১৮ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক ডালে এক প্রকার আবরণ থাকে যা পাতলা আঠালো পর্দার মতো খোসা ও ডালের শাঁসকে শক্ত করে আটকে রাখে। ডালের দানার আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– গোলাকার, নলাকার, পিরামিড আকৃতি, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি, ট্যাবলেট আকৃতির এবং খোসা মসৃণ, খসখসে ও কুচকানো থাকে। ডালের এই নানা ধরনের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে খোসা অপসারণের প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তবে খোসা অপসারণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে খোসা অপসারণের প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। খোসা অপসারণের পদ্ধতি প্রয়োগে দক্ষতার উপর ডালের উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভরশীল। ডাল প্রস্তুতকরণ বা মিলিং সাধারণত দুই ভাবে হয়ে থাকে। যথা-

(ক) খোসা আগলাকরণ ও (খ) খোসা অপসারণ বা দূরীকরণ

২০২৫

খোসা আলগাকরণ : সব ডালের খোসা অপসারণের আগে আলগা করে নিতে হয়। তাছাড়া ডালের শাঁস ও খোসা সহজে পৃথক করা যায় না। ডালের খোসা সহজে আলগাকরণের জন্য ডাল শুকিয়ে নিতে হয়। ডাল ভালোভাবে শুকিয়ে না নিলে আলগাকরণের সময় ডালের শাঁস চ্যাপ্টা হয়ে শুকিয়ে গুঁড়া হয়ে যায়।

খোসা অপসারণ বা দূরীকরণ : ডালের খোসামুক্তকরণ প্রক্রিয়া গ্রামীণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র আকারে হস্তচালিত মেশিনে ও বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সম্বলিত মিলে আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। পদ্ধতিদ্বয় নিম্নরূপ :

(ক) গ্রামীণ পদ্ধতি ও (খ) আধুনিক পদ্ধতি

গ্রামীণ পদ্ধতি : গ্রামীণ পদ্ধতিতে ডাল ভাঙানোর জন্য দুইধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন- হামানদিস্তা ও যাঁতা।

হামানদিস্তা : হামানদিস্তা দিয়ে ডাল খোসামুক্তকরণ একটি প্রাচীনতম ও সাধারণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ডালকে রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে কিছু পানি মিশিয়ে হামান দিস্তায় নেওয়া হয়। অতঃপর হাত দ্বারা হামান দিয়ে দিস্তায় রাখা ডালে আঘাত করে আস্ত ডালের খোসামুক্ত করা হয়। ডাল খোসামুক্ত হওয়ার পর কুলা দ্বারা ঝেড়ে ডালের আলাদা হওয়া অংশ বস্তাবন্দী করা হয়। এ পদ্ধতিতে সময় ও শ্রম বেশি লাগে।

যাঁতা : এটি পাথরের তৈরি একটি গ্রামীণ যন্ত্র। এতে পাথরের দুইটি গোলাকার ঘুরানোর উপযোগী চাকতি বা খণ্ড থাকে। নিচের চাকতিটি স্থির থাকে এবং উপরের চাকতিটি ঘুরানো যায়। তবে উভয় চাকতির ভিতরের দিকে খাঁজ কাটা থাকে। উপরের চাকতির ঘুরানোর জন্য একটি হাতল আছে এবং ডাল প্রবেশ করানোর ছিদ্র থাকে। দুই চাকতির মাঝে ডাল দিয়ে চাকতি ঘুরালে ডালের খোসা মুক্ত হয়ে যায়। গমও এই যন্ত্র দ্বারা পিষে আটা করা যায়।

আধুনিক পদ্ধতি :

(ক) এব্রেসিভ সিলিন্ডার মেশিন : বর্তমানে পাথরের প্লেট ব্যবহৃত মিল ছাড়া এব্রেসিভ সিলিন্ডার মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। এ মেশিনে ছিদ্রযুক্ত চালনি থেকে নির্দিষ্ট একটি গোলাকার ঘর্ষণকারী পাথর থাকে। মেশিনটি চালু হলে পাথরটি ৬৫০ আরপিএম এ ঘুরতে থাকে। উপরের হপার দিয়ে ডাল ঢেলে দেওয়া হয়। ভালো দানা মেশিনের ভিতরে ঘূর্ণায়মান পাথরের পাশে এসে লাগে। পাথরের ঘর্ষণে ডালদানার খোসা আলাদা হয়ে যায়। দানা ছোট হলে ঘর্ষণ প্রক্রিয়া কয়েকবার চালানো হয়। যেমন- মসুরের দানা। তবে বড় দানা ১-২ বার ঘর্ষণেই খোসা আলাদা হয়ে যায়। যেমন- ছোলা বা মটরদানা।

(খ) শুষ্ক চাকতি মেশিন : এ মেশিনে একটি সিলিন্ডারের মধ্যে অকেগুলো ঘর্ষণকারী চাকতি থাকে। এ চাকতিগুলো খুব দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকলে উঁচু হপার দিয়ে ডাল দানা ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। এ মেশিনে অন্যান্য মেশিনের তুলনায় খুব কম সময়ে ডালের খোসা অপসারণ বা মুক্ত করা হয়।

(গ) আধুনিক মিলিং মেশিন : এ মেশিন দ্বারা ডালের খোসায় ফাটল ধরানোর জন্য খসখসে রোলার ব্যবহার করা হয়। রোলার ঘুরতে থাকলে ডাল দানা রোলারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়।

ডালের খোসায় ফাটল ধরানোর পর অ্যাব্রেসিভ রোলারের সাহায্য খোসামুক্তকরণ করা হয়। অনেক সময় ডালে ০.১-১ ভাগ পরিমাণ ভোজ্যতেলের প্রলেপ দেওয়া হয় এতে করে তেল খোসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শাঁসকে খোসা থেকে সহজে আলাদা করে ফেলে। তারপর এই ডাল ট্যাপারিং রোলারের সাহায্যে সহজেই খোসা অপসারণ করা হয়। তেল ব্যবহারে ডাল দানা তেল চুষে নেয় ফলে খোসা ও শাঁসের মধ্যকার শক্ত বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। ডালের খোসা ও শাঁসের মধ্যকার বাঁধন শিথিল করার জন্য তেল বা পানি ব্যবহার করার পর ডালের টেম্পারিং করতে হয়। টেম্পারিং করার জন্য তেল বা পানি মিশানো ডাল শুকাতে হয়। ডাল দানা আর্দ্রতা কমানোর জন্য স্তূপাকারে রাখা হলে সমস্ত দানা তাপে গরম হয়ে যায়। এ তাপ দানার মধ্যে অনেক সময় ধরে রাখতে পারে। তবে আর্দ্রতা পরিমিতকরণ করতে অনেক সময় লাগে। তাই পানি বা তেল মেশানো কাজ রাতের বেলায় করে পরিমিতকরণের কাজ করা হয়। এ ডাল দানা পরদিন সকালে মিলিং-এর উপযোগী হয়ে এবং সহজে ও অল্প সময়ে খোসামুক্ত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ডালদানা মিলিং- এর বিভিন্ন অংশ কী পরিমাণে পাওয়া যায় তা নিচে দেখানো হলো-

ক্রমিক নং	ডালের নাম	বিভিন্ন অংশের নাম ও পরিমাণ (%)		
		শাঁস	অঙ্কুর	খোসা
১	মসুর	৮৪.১১	১.৯০	১৩.৯৯
২	ছোলা	৮২.০০	১.২৫	১৬.৭৫
৩	মুগ	৮১.২১	১.৪৭	১৭.৩২
৪	মটরশুঁটি	৮৩.০৭	১.২৪	১৫.০৬

চিত্র : আধুনিক ডাল মিলিং মেশিন

ডাল মিলিং-এর ফ্লো-চার্টং

অনুশীলনী -৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ডাল ফসল কোন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত?
২. ডাল শস্য কাহাকে বলে?
৩. লিগুমিনেসি পরিবারের বৈশিষ্ট্য কী?
৪. ডালকে কেন গরিবের মাংস বলে?
৫. বাংলাদেশে ডালের হেক্টরপ্রতি ফলন কত?
৬. একজন মানুষের দৈনিক ডালের চাহিদা কত?
৭. ভিটামিন- বি১ এর অভাবে কী রোগ হয়?
৮. অঙ্কুরিত ডালে কী ভিটামিন থাকে?
৯. বারি মুগ-৪ ও ৫ এর বৈশিষ্ট্য কী?
১০. ডালে কোন কোন প্রোটিন বেশি থাকে?
১১. কেন পাঁচমিশালী ডাল খাওয়া উচিত?
১২. ১০০ গ্রাম ডাল থেকে কত ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়?
১৩. ডালে শর্করা, স্টার্চ ও চিনি কত ভাগ করে থাকে?
১৪. ডালে কী কী পুষ্টিবিরোধী উপাদান থাকে?
১৫. ল্যাথাইরিজম বলতে কী বুঝায়?
১৬. ডাল সংরক্ষণের জন্য ডালের আদ্রতা শতকরা কত ভাগ হওয়া দরকার। ২০২২

১৭. ডাল বীজ পরিপক্ব অবস্থায় কত ভাগ আর্দ্রতা রাখা যায়?

১৮. ডাল সংরক্ষণের জন্য পলিথিনযুক্ত বস্তা কত বছর ব্যবহার করা যাবে?

১৯. গোলাজাত ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকা কোনটি?

২০. বিটল পোকার অন্য নাম কী?

২১. এ পোকা কীভাবে ডালের ক্ষতি করে?

২২. ডালের বীজ দানার পোকা দমনের জন্য কী ঔষুধ দেয়া যায়?

২৩. ডালের বীজের সাথে কী কী তেল মিশিয়ে পোকা দমন করা যায়?

২৪. ডালের দানার আকৃতি কীরূপ হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডাল শস্য কী ? বাংলাদেশে ডালের উৎপদানের অবস্থা কী?

২. প্রত্যহ ডালের ব্যবহারে কোন তিনটি কাজ সম্পন্ন হয়?

৩. ডালের ভিটামিন ও খনিজ কতটুকু উপকারী?

৪. ল্যাথাইরিজম রোগ থেকে মুক্তির উপায় কী?

৫. সংরক্ষণের জন্য ডাল শুকানো পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৬. ডালবীজ সংরক্ষণের পর্যায়গুলো কী কী?

৭. সংরক্ষণ পাত্রে ডাল ভরা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮. পলিথিনযুক্ত ছালায় কীভাবে ডাল সংরক্ষণ করা হয়?

৯. ডালের বিটল পোকার আক্রমণ বর্ণনা কর।

১০. ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১. ডাল মিলিং কী কী অবস্থার উপর নির্ভর করে।

১২. আধুনিক মিলিং-এর ফ্লো-চার্ট লেখ।

রচানমূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য ও পুষ্টিতে ডাল বীজের অবদান লেখ।

২. ডালের পুষ্টি উপাদান বর্ণনা কর।

৩. ডালের বীজ সংরক্ষণ পর্যায় এবং আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে ডাল সংরক্ষণ আলোচনা কর।

৪. ডাল সংরক্ষণের তিনটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

৫. গোলাজাত ডাল ফসলের পোকার আক্রমণ ও দমন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৬. ডাল মিলিং-এর গ্রামীণ ও আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অধ্যায় ৫
ডাল থেকে উৎপাদিত খাদ্য

ভূমিকা : মাছ-মাংসের পরিপূরক হিসেবে ডাল অনন্য। এ কারণেই ডাল আমাদের খাদ্য তালিকায় আমিষ সমৃদ্ধ এবং মাংসপেশি বর্ধক একটি সুলভ খাবার। ডাল ছাড়া যেন আমাদের খাবার সম্পূর্ণ হয় না এবং তৃপ্তিও পাওয়া যায় না। ফলে খাবারের টেবিলে মাছ-মাংস আর যাই থাক না কেন ডাল অবশ্যই থাকবে। পূর্বে মাছ-মাংসের পরিবর্তে ডাল খেয়ে আমিষের চাহিদা মেটানো যেত। বর্তমানে ডালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এটি আর গরিবের খাবার নেই। রকমারি ডাল রান্নায় বাঙালির জুড়ি নেই। মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, মাষকলাই অড়হর মোটামুটি এই ডালগুলো বাঙালির রান্নাঘরে বেশি থাকে। তুলনামূলক বিচারে সব ডালের মধ্যে মসুর ডালে আমিষ জাতীয় উপাদান (২৫.১ গ্রাম) বেশি থাকায় এটি সকলের প্রিয় ডাল।

৫.১ ডাল রান্না করার সাধারণ নিয়মাবলি :

(১) সব ডালে এক রকম ভিটামিন থাকে না। তাই প্রতিদিন একরকম ডাল রান্না না করে একাধিক ডাল রান্না করে খাওয়া উচিত। আর যদি ডালের সাথে কিছু সবজি যোগ করা যায় তাহলে এর আমিষের গুণাগুণ আরও বেড়ে যায়।

(২) ভাঙা মসুর ডালের চেয়ে আস্ত গোটা মসুর ডাল উত্তম। কেননা আস্ত মসুর ডালে পুষ্টিমান পুরোপুরি বজায় রাকে।

(৩) পুরাতন ডালের চেয়ে নতুন ডাল সবচেয়ে ভালো। এটি খেতেও যেমন স্বাদ লাগে তেমনি গুনাগুণ ও অটুট থাকে এবং সহজেই সিদ্ধ হয়।

(৪) ডাল খেয়ে যারা হজম করতে পারে না তারা ডালের সঙ্গে আলু মিশিয়ে সিদ্ধ করে খেলে হজমে অসুবিধাটা হবে না।

(৫) ডাবলি বা চটপটির ডাল বা মটর ডাল নরম করে সিদ্ধ করতে চাইলে সারা রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর রান্নার সময় সঠিক পরিমাণে খাবার সোডা দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।

(৬) কলাই-এর ডাল সব সময় ধাতব পাত্রে ভিজিয়ে রাখলে ভালোভাবে রান্না হয়ে যাবে।

(৭) ডাল রান্নার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ডাল ও পানি আলাদা আলাদা না থাকে। ডাল ও পানি যত মিশবে ততই খেতে সুস্বাদু হবে।

(৮) যদি ডাল একটু পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করতে চান তাহলে রান্না করার সময় সামান্য খাবার সোডা মিশিয়ে দিলেই চলবে।

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার ডালের ছবি

ডাল সিদ্ধ করার পদ্ধতি :

ডাল রান্না করার পূর্বে ডাল সিদ্ধ করতে কিছু নিয়ম-কানুন জেনে নেয়া উচিত। অড়হর ডাল, মটর ডাল এবং ছোলার ডালের একটি ধর্ম হচ্ছে এগুলো সিদ্ধ হতে চায় না, অনেক সময় লাগে। ডাল সিদ্ধ প্রক্রিয়া নিচের বিষয়ের উপর নির্ভরশীল-

(ক) **ডালের প্রকারভেদ :** ডালের প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে রান্না করার পূর্বে ডাল ২-৪ ঘণ্টা পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তাছাড়া পানিতে ১-৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ভিজিয়ে চুলায় হালকা আঁচে রাখলে ভালোভাবে সিদ্ধ হয়।

(খ) **পানির খরতা :** খর পানির চেয়ে মৃদু পানিতে ডাল সিদ্ধ হতে কম সময় লাগে। খর পানির ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট ডাল সিদ্ধ হতে বাধা দেয়।

(গ) **খাবার সোডার ব্যবহার :** অনেক সময় ডাল তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করার জন্য খাবার সোডার (সোডিয়াম বাই কার্বনেট) পাউডার পরিমাণমতো ব্যবহার করে ডাল সিদ্ধ করা হয়। তবে খাবার সোডা ব্যবহার করলে ডালের বি১ ভিটামিন নষ্ট থেকে পারে।

(ঘ) **চাল ধোয়া পানি :** সিদ্ধ করার সময় ফুটন্ত ডালে কয়েকটি চাল ছেড়ে দিলে বা চাল ধোয়া পরিষ্কার পানিতে ডাল ঢেলে দিলে সহজেই ডাল সিদ্ধ হয়ে যাবে।

(ঙ) **নারিকেল তেল ব্যবহার :** ডাল সিদ্ধ করার সময় কয়েক ফোঁটা নারিকেল তেল ব্যবহার করলে ডাল সহজেই সিদ্ধ, নরম ও মোলায়েম হয়ে যায়।

মসুর ডাল রান্নার নিয়ম : প্রথমে ডাল কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর ভিজানো ডাল ভালো করে ধুয়ে পরিমাণমতো পানিতে সিদ্ধ করতে হয়। আধা সিদ্ধ হয়ে এলে এ ডালে হালকা হলুদ, লবন ও সামান্য জিরা বাটা দিতে হয়। ডাল যখন ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন ডাল ঘুঁটুনি দিয়ে ডাল ভালোভাবে ঘুঁটতে হয়। ডাল যখন পানির সাথে মিশে যাবে তখনই বাগাড় দিতে হবে। নামানোর পূর্বে ডালে কিছু ধনে পাতা, কাঁচামরিচ দিয়ে নামিয়ে রাখতে হবে।

মসুর ডাল একটু ভিন্ন আমেজের টক করতে চাইলে কচি আম সহযোগ রান্না করলে খেতে চমৎকার লাগে। তাছাড়া, টমেটো, মেথি শাকের পাতা, লাউ, তেঁতুল, কুল, আমশুঁট, জলপাই, পুঁইশাক, ডাঁটা সজনে প্রভৃতি দিয়ে মসুর ডাল রান্না করলেও সুস্বাদুও সুগন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে।

মুগ ডাল রান্নার নিয়ম : মুগ ডালের মধ্যে 'সোনা মুগ' সবচেয়ে ভালো। 'হালি মুগ' নামে সবুজ রঙের মুগ ডাল অসুস্থ লোকের জন্য খাবার উপযোগী। মনে রাখতে হবে রান্নার পূর্বে মুগ ডাল ভেজে নেয়ার মাঝেই এর স্বাদ লুকিয়ে থাকে। কাজেই এর আসল স্বাদ পেতে চাইলে ডালকে ঘি বা ডালডা দিয়ে ভেজে নিতে হবে। নিম্নে ডাল রান্নার পদ্ধতি দেয়া হলো-

প্রথমে ভাজা মুগডাল সিদ্ধ করতে হবে। এরপর আলাদা কড়াইয়ে ১ চা চামচ ঘি দিয়ে পেঁয়াজ ও রসুন কুচি বাদামি করে ভেজে তুলতে হবে। এবার আরও কিছু ঘি ভালোভাবে গরম করে তাতে পাঁচফোড়ন ঢেলে বড় চামচ দিয়ে ডাল ঘুঁটে ফেলতে হবে। ডাল ফুটে উঠলে সবশেষে কিছু গরম মশলার গুঁড়া, কাঁচামরিচ, ক্ষীর অথবা মাখন গরম করে ঐ ডালের উপর ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে এনে গরম গরম পরিবেশন করা হয়। তাছাড়া এ ডাল রান্নার সময় বাঁটা নারিকেল অথবা পালংশাক দিয়ে ঘি বাগাড় দিলে অভিনব স্বাদে সুস্বাদু হয়ে উঠবে।

মাষকলাই ডাল রান্নার নিয়ম :

(১) রান্নার জন্য মৌসুমের নতুন ডাল সংগ্রহ করতে হবে। পুরাতন ডাল কীটনাশক দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় বলে স্বাদ হয় না।

(২) আমাদের দেশে দুই ধরনের মাষকলাই পাওয়া যায়। একটি কালো কুচকুচে অন্যটি খয়েরি রঙের। কাল মাষকলাই খেতে স্বাদ বেশি।

(৩) মাষকলাই-এর ডাল রান্নার পর যত ঘন হবে তত সুস্বাদু হবে। এ জন্য মাষকলাই রান্নার সময় ভাতের মাড় বা চালের গুঁড়া মিশিয়ে দিলে ডাল ঘন হয়।

(৪) মাষকলাইয়ের ডাল আরও সুস্বাদু করার জন্য এর সাথে শিং বা টাকি মাছ দিয়ে রান্না করতে হবে।

(৫) মাষকলাই এর ডাল প্রথমে বাদামি করে ভেজে পরে তা গুঁড়া করে রান্না করলে এর ঘ্রাণ অনেক বেড়ে যায়।

(৬) শহরের ডাল অনেক দিনের পুরোনো এবং তা কলে ভাঙা হয় এতে এ ডালের স্বাদ গুণ ও গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। গ্রামের মৌসুমি ডাল ঢেঁকিতে বা যাঁতায় ভাঙা হয় বিধায় এর নিজস্ব স্বকীয় স্বাদ, গন্ধ ও ভিটামিন অক্ষুণ্ন থাকে। ফলে ডাল খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায়।

৫.২ মসুরের ডাল থেকে পিঁয়াজু ও বড়া :

হালকা নাস্তার জন্য পেঁয়াজু ও ডালপুরির তুলনা নেই। বিশেষ করে বিকেলে চা এর সাথে পিঁয়াজু বা ডালপুরি সকলেই খুব পছন্দ করে। সেজন্য দেখা যায় শহরে বন্দরে গরম গরম পেঁয়াজু ও ডালপুরির চাহিদা অনেক বেশি। পিয়াঁজু তৈরিতে পেঁয়াজ বেশি ব্যবহার করলে খেতে উপাদেয় হয়। পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়া পিঁয়াজুতে পেঁয়াজের পরিমাণ কমে গেছে। তেমনি ডালের দাম বাড়ায় ডালপুরিতে মসুরের ডাল ছাড়া অন্য ডাল দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে।

উপকরণ

১।	মসুরের ডাল	২৫০ গ্রাম
২।	ডালের বেসন	২০ গ্রাম
৩।	শুকনা মরিচের গুঁড়া	৫ গ্রাম
৪।	কাঁচা মরিচের কুচি	৫টি
৫।	পেঁয়াজ কুচি	১০০ গ্রাম
৬।	আদা বাটা	২০ গ্রাম
৭।	লবণ	পরিমাণমতো
৮।	সয়াবিন তেল	পরিমাণমতো

পেয়াজু তৈরিতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

চিত্র: পেঁয়াজু

ডাল ধুয়ে ডুবো পানিতে ৪-৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর পানি ছেঁকে ডাল বাটতে হবে। ডালের মণ্ডের সাথে শুকনা মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, লবণ ও কাঁচা মরিচ ও বেসন ভালোভবে মেশাতে হবে। তেল ভালোভাবে গরম হলে চার আঙ্গুল দিয়ে ডালের মণ্ড তুলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে চ্যাপ্টা করে তেলে ছাড়তে হবে। এমনভাবে বেশ কয়েকটি পেঁয়াজু এক সাথে দিয়ে ভাজতে হবে। পেঁয়াজু মচমচে হলে তেল ছেঁকে তুলে টিস্যু বা কাগজের উপর রাখতে হবে। পিঁয়াজু সস্ বা সালাদ দিয়ে পরিবেশন করা যায়। বড়াতে পেঁয়াজের পরিমাণ কম হবে এবং এর আকৃতি গোল ও মোটা হবে। পেঁয়াজুতে পেঁয়াজের পরিমাণ বেশি হবে। আকৃতি চ্যাপ্টা হবে।

৫.৩ মুগ ডাল ও মটর ডাল থেকে বিভিন্ন খাদ্য তৈরি :

সব ধরনের ডালের মধ্যে মুগ ডাল ও মটর ডাল অন্যতম। মুগডাল ও মটর ডাল থেকে বহু ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম দেয়া হলো-

(১) মুগ ডালের পরোটা
(২) মুগ ডালের পাকোড়া
(৩) মুগাঙ্কুর
(৪) চিড়া ডালমুট
(৫) দই বড়া
(৬) মটর ডাল থেকে চানাচুর
(৭) মটর চটপটি ইত্যাদি

মুগডালের পরোটা : এটি তৈরি করতে মুগডাল, গমের আটা, পালংশাক, পিঁয়াজ, তেল বা ঘি, জিরা, লবণ ও মরিচের গুঁড়া লাগবে। প্রথমে জিরা ভেজে নিতে হয়। পালংশাকের সাথে পিঁয়াজ কুচি মিশাতে হয়। তারপর মুগডাল বাটা, আটা, পালং পাতা, পিঁয়াজ কুচি, জিরা, লবণ ও মরিচ গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। খামির থেকে রুটি তৈরির মতো বল করে পিঁড়ি বেলুন দ্বারা বেলে রুটি তৈরি করে তেল বা ঘিতে ভেজে নিতে হয়।

মুগডালের পাকোড়া : পাকোড়া তৈরিতে মুগডাল, পালংশাক, তেল বা ঘি লবণ, গুঁড়া মরিচ, মশলা, সস বা চাটনি প্রয়োজন হয়। প্রথমে ডাল ৬-৮ ঘন্টা ভিজিয়ে ব্লেন্ডারে বা শিলপাটায় বেটে নিতে হয়। পালংশাক ভালো করে ধুয়ে কেটে বাটা ডাল, শাক ও সব মসলা, লবণ ভালো করে মিশিয়ে কাই বা খামির তৈরি করতে হয়। ছোট ছোট বলের মতো তৈরি করে ডুবো তেলে ভেজে তুলতে হয়। সস্ বা চাটনি সহযোগে খেতে দেওয়া হয়।

অঙ্কুরিত মুগের সালাদ (মুগাঙ্কুর) : আমাদের দেশে খাদ্য তালিকায় ডাল হিসেবে খাবার ছাড়া মুগের ব্যবহার অত্যন্ত কম। মুগবীজ থেকে তৈরি মুগাঙ্কুর একটি উৎকৃষ্ট সবজি হিসেবে আমাদের দেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মুগাঙ্কুর থেকে বিভিন্ন উপাদেয় খাবার তৈরিসহ মাছ, মাংস ও অন্যান্য সবজির সাথে খাওয়া যায়। এটিতে শর্করা, আমিষ, খনিজ লবণসহ প্রচুর ভিটামিন-সি থাকে। পুষ্ট, পরিপক্ব বীজ ৩-৪ দিন পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে ৩-৪ সেমি, লম্বা অঙ্কুর বৃদ্ধি হলে তা খাবার হিসেবে খাওয়া যায়, সাধারণত ১ কেজি বীজ থেকে ৮-৯ কেজি মুগাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। সালাদ তৈরর জন্য আস্ত মুগবীজ ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। ৩-৪ দিন পর অঙ্কুর বের হলে প্রেসার কুকারে সামান্য পানি দিয়ে ৫ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা, টমেটো ও শসা কুচি মিশাতে হবে। অত:পর লেমন জুস, লবণ ও গুঁড়া মরিচ মিশিয়ে মুগের সালাদ পরিবেশন করতে হয়।

পরোটা পাকোড়া মুগাঙ্কুর

চিত্রঃ মুগ ডালের পরোটা, পাকোড়া ও মুগাঙ্কুর

চিড়া ডালমুট তৈরি : চিড়া ডালমুট তৈরির উপাদানগুলো হলো চিড়া, মুগডাল, মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া লবণ, সাইট্রিক এসিড, বিট লবণ ও বেকিং পাউডার ইত্যাদি।

মুগডাল ভালোভাবে পরিষ্কার করে ২ গ্রাম বেকিং পাউডার দিয়ে ১ রাত ভিজিয়ে রাখতে হয়। চিড়া বেছে পরিষ্কার করতে হয়। ডালে হলুদ, মরিচ ও লবণ মিশাতে হয়। কড়াইতে তেল গরম করতে হয়। তেল যখন গরম হবে তখন ধোঁয়া উঠতে থাকবে। এ সময় চিড়া ঢেলে দিয়ে তেলে ভাজতে হয়। ভাজা হলে তেল ঝরিয়ে রেখে ঠান্ডা করতে হয়। তারপর একই পদ্ধতিতে ডাল ভাজতে হয়। চিড়া ভাজা ও ডাল ভাজা একত্রে মিশিয়ে গুঁড়া মশলা, সাইট্রিক এসিড, বিট লবণ মিশ্রিত করে ছোট ছোট প্যাকেট করতে হয়। চিড়া ডালমুটে চিনাবাদাম ভেজে দেওয়া যেতে পারে। তারপর প্যাকেট বায়ুরোধী করে বাজারজাত করা হয়।

দইবড়া : এটি পুরাতন নবাবী আমলের খাবার। এটি মসলা মেশানো টকদই দিয়ে মাষকলাই ডালের বড়া রান্নার পদ্ধতি। এটি বেশ তীব্র স্বাদযুক্ত খাবার। এটি সাধারণত রুচিবর্ধক খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের পুরানো ঢাকাতে এখনও এ খাবারের প্রচলন আছে। যদিও বর্তমানে এর ব্যবহার প্রচলন ২০২

সীমিত। রমজান মাসে ইফতারে এর আকর্ষণ বাড়ে। উত্তর ভারতের পাঞ্জাবী ও হরিয়ানী খাবারে দইবড়া বহুল ব্যবহৃত।

প্রস্তুত প্রণালি: দই বড়া তৈরিতে মুগের ডাল, টকদই, সরিষার তেল, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া ও লবণ ইত্যাদি লাগে। মুগের ডাল ভাল করে বেছে ধুয়ে ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ডাল বেটে পরিমানমতো লবণ মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। এরপর মরিচ ও জিরা ভেজে গুঁড়া করে রাখতে হবে। বেশি ভাজা হলে তিতা হয়ে যাবে। কড়াইতে তেল গরম করে ফেটানো ডাল দিয়ে বড়া ভেজে নিতে হবে। একটি আলাদা পাত্রে পানি রেখে ভাজা বড়াগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে। ১৫ মিনিট পরে বড়াগুলো তুলে প্লেটে রাখতে হবে।

এরপর টক দই পরিমাণমতো বড়াগুলোর উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। দই দিয়ে তার উপর জিরার গুঁড়া ও মরিচ গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হবে। সব শেষে একটু বিট লবণ দিলে খেতে ভালো লাগবে। দইবড়া মাষকলাই ডাল দিয়েও করা যাবে।

চানাচুর তৈরি : চানাচুর তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো হচ্ছে ছোলার ডালের বেসন, চিনাবাদাম, অর্ধভাঙ্গা মটর ডাল, চিড়া, জিরার গুঁড়া, ধনের গুঁড়া, সাইট্রিক এসিড, লবণ, ডিম, সয়াবিন তৈল ইত্যাদি।

প্রস্তুতপ্রণালি:

(১) ছোলার ডালের বেসনের সাথে এমনভাবে পানি মেশাতে হবে যাতে খামির অর্ধকঠিন অবস্থায় পরিণত হয়।

(২) খামিরের সাথে খাবার রং, ডিম, এসিড ও লবণ মিশিয়ে সাঁজ বা ডাইসে নিতে হয়।

(৩) চুলার কড়াইতে এমনভাবে সয়াবিন তেল নিতে হবে যাতে চানাচুরের টুকরোগুলো ডুবিয়ে ভাজা যায়। তেল ফুটলে তার উপর ডাইস রেখে অল্প পরিমাণ খামির নিয়ে হাতে চাপ দিয়ে তেলের মধ্যে প্রথমে ঝুরিগুলো ফেলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় হাতাওয়ালা ছিদ্রযুক্ত চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে হয়। যখন ভাজা সম্পূর্ণ হয় তখন ঐ চামচ দিয়ে ঝুরি তেল থেকে তুলে নিয়ে তেল ঝরার জন্য ছিদ্রযুক্ত ট্রেতে রাখা হয়। খেয়াল রাখতে হবে ঝুরিগুলো যেন বেশি বা কম ভাজা না হয়। বিভিন্ন ডিজাইনের ঝুরি পেতে হলে ডাইসগুলো সে অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিতে হয়।

(৪) চিনাবাদামকে খোসামুক্ত করে কিছু সময় পানিতে রাখতে হয়। তারপর পানি ঝরিয়ে তেলে ভেজে নিতে হয়।

(৫) মটর ডাল প্রায় ৫-৭ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর পানি ঝরিয়ে তেলে ভেজে নিতে হয়।

(৬) চিড়াগুলো পরিষ্কার করে তেলে ভেজে নিতে হয়।

(৭) একটা টেবিলের উপর পলিথিন কাগজ বিছিয়ে তার উপর প্রস্তুতকৃত ঝুরি, বাদাম, ডাল, চিড়া, জিরার গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো ও মরিচের গুঁড়ো নিতে হয়। সব মিক্সার মেশিনে দিয়ে অথবা হাত দ্বারা ভালোভাবে মেশাতে হয়।

(৮) ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন মাপের পলিথিন ব্যাগ নিয়ে তাতে চানাচুর ভরে ভালোভাবে সিল করতে হয়।

(৯) চানাচুরে উপাদানগুলোর সংখ্যা ও পরিমাণের ভিন্নতা কমবেশি করে স্বাদের বৈচিত্রতা আনা যায়। এতে আলুর পেস্টও ব্যবহার করা যায়।

(৫) খেসারির বেসন দিয়ে ঝুরি তৈরি : ঝুরি তৈরির জন্য খেসারির ডালের বেসন, খাবার সোডা, লবণ ও সয়াবিন তেলের প্রয়োজন হয়। প্রথমে বেসন, খাবার সোডা, লবণ, তৈল এক সাথে মেশাতে হয়। পানি সহযোগে মণ্ড বা খামির তৈরি করতে হয়। চুলার উপর কড়াই বসিয়ে তেল গরম হলে চিকন ঝুরির ডাইস কড়াই- এর উপর বসাতে হয়। ডাইসের উপর খামির দিয়ে হাতের তালু দিয়ে পিষাতে হয়। চিকন ঝুরি গরম তেলের মধ্যে পড়বে। মেশিন ব্যবহার করলে মেশিনের সাহায্যে ঝুরি তেলের মধ্যে ফেলতে হয়। চিকন ঝুরি অল্প আঁচে ভেজে তুলে তেল ঝরিয়ে ঠাণ্ডা পলিথিন প্যাকেট করে বাজারজাত করা যায়। এই ঝুরি চানাচুরের সাথে মেশানো যায় বা আলাদাও প্যাকেট করে বিক্রি করা যায়।

(৬) খেসারির বেসন দিয়ে পাপড় তৈরি : পাপড় তৈরির উপকরণ ঝুরি তৈরির মতো। ঝুরি তৈরির মতো বেসন, খাবার সোডা, লবণ, কাঁচা তেল মিশাতে হয়। তারপর পানি দিয়ে মণ্ড বা খামির তৈরি করতে হয়। চুলায় তেলের কড়াইয়ের উপর পাপড়ের ডাইস বসিয়ে হাতের তালু দিয়ে পিষতে হয়। ডাইসের ছিদ্র দিয়ে পাতলা পাপড় গরম তেলে পড়বে এবং অল্প আঁচে ছোট ছোট পাপড় ভেজে তুলতে হয়। পাপড় ডাইস ছাড়া হাতেও বানানো যায় তবে তা উত্তম রূপে শুকাতে হবে। এটি চানাচুর তৈরির একটি প্রধান উপকরণ।

চিত্র : পাপড় তৈরি (হাতে বানানো)

(৭) খেসারির বেসন দিয়ে গাটিয়া তৈরি : ঝুরি ও পাপড় তৈরির মতোই গাটিয়া তৈরির উপকরণ একই রকম, শুধু গাটিয়া তৈরিতে অতিরিক্ত সামান্য কালিজিরা লাগে। গাটিয়া তৈরির পদ্ধতি ঝুরি ও পাপড়ের মতোই। গাটিয়াও চানাচুরের একটি উপকরণ।

(৮) ছোলার ডাল ভাজা : পরিষ্কার ও পুষ্ট ছোলার ডাল নিয়ে খাবার সোডা ও লবণ সহযোগে ৭-৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর ডালগুলো পানি ঝরিয়ে গরম তেলে ভেজে নিতে হয়। বাদাম ও চিড়া তেলে ভেজে চানাচুরের জন্য তৈরি করতে হয়। এগুলো আলাদাভাবে পলিথিন প্যাকেট করেও বাজারজাত করা যায়।

(৯) বোম্বাই চানাচুর : বিট লবণ, সাইট্রিক এসিড, জিরা, আদা, গোলমরিচ ও দারুচিনির গুঁড়া সংগ্রহ করে বিট লবণ ও সাইট্রিক এসিড ছাড়া সব মশলা একত্রে হালকা আঁচে ভেজে নিতে হয়। চানাচুরের সাথে উপরে তৈরি সব উপকরণ যেমন- ঝুরি, পাপড়, গাটিয়া, ডাল ভাজা, বাদামভাজা, চিড়া ভাজা এক সাথে মিশাতে হয়। সেগুলোর সাথে সব মসলা, বিট লবণ, সাইট্রিক এসিড এক সাথে মিশিয়ে বোম্বাই চানাচুর পলিথিন প্যাকেটে ভরে ভালোভাবে বায়ুরোধী করে মুখ বন্ধ করতে হয়।

(১০) মটর চটপটি : চটপটি তৈরিতে মটর ডাল, বেকিং পাউডার, তেঁতুল, আলু, ডিম, খিরা বা শশা, টমেটো, পেঁয়াজ, জিরা, শুকনো মরিচ, হলুদ গুঁড়া, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা কুঁচি, লবণ, সামান্য চিনির প্রয়োজন হয়। প্রথমে বাছাইকৃত পরিপক্ক মটর নিয়ে কিছু বেকিং পাউডার দিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরদিন সকালে মটরগুলো ভালোভাবে ধুয়ে বাকি বেকিং পাউডার ও হলুদ গুঁড়া দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। মটর সিদ্ধ হলে চুলা থেকে নামাতে হয়। মটরের দ্রবনের উপরের ময়লা জমলে তা তুলে ফেলতে হয়। পরদিন সকালে মটরগুলো ভালোভাবে ধুয়ে বাকি বেকিং পাউডার ও হলুদ গুঁড়া দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। নতুন মটরে বেকিং পাউডার লাগে না বিশেষ করে চৈত্র-বৈশাখ মাসের নতুন মটর। তেঁতুল পানিতে ভিজিয়ে পাল্প বের করতে হয়। আলু ও ডিম সিদ্ধ করে ছোট ছোট স্লাইস তৈরি করতে হয়। জিরা ও মরিচ আলাদাভাবে গুঁড়া করতে হয়। পেঁয়াজ, খিরা ও টমেটো স্লাইস করতে হয়। অল্প পানিসহ মটর, তেঁতুল, আলু, লবণ, চিনি ও অর্ধেক গুঁড়া মশলা দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। তারপর ফুটে উঠলে নামাতে হয়। পরিবেশনের সময় বাটিতে করে চটপটি দেওয়ার পর উপরে আলু ও ডিমের স্লাইস, ধনেপাতা কুঁচি ও মরিচ কুঁচি ও কিছু মশলার গুঁড়া ছিটিয়ে দিতে হয়।

চিত্র : মটর চটপটি

৫.৪ ছোলার ডালের হালুয়া :

বুটের হালুয়া : ছোলার ডাল, দুধ, চিনি, ঘি, দারুচিনি, এলাচ, পেস্তাবাদাম, চিনাবাদাম, কিসমিস, গোলাপজল, জর্দা রং ইত্যাদি দ্বারা বুটের সুস্বাদু হালুয়া তৈরি করা হয়। প্রথমে বুটের ডাল ২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয় এবং পানি ফেলে দিতে হয়। নতুন পানি দিয়ে ডাল এমনভাবে সিদ্ধ করতে হয় যেন ডালের পানি শুকিয়ে যায়। অল্প অল্প করে দুধ মিশিয়ে ডাল মিহি করে বেটে নিতে হয়। একটি কড়াইয়ে বাকি দুধ নিয়ে তাতে চিনি, ঘি, গরম মশলা দিতে হয়। পাত্রটি চুলায় নিয়ে নেড়েচেড়ে ফুটাতে হয়। ঘন হয়ে এলে

গোলাপজল মিশিয়ে ঘন ঘন নেড়ে হালুয়া করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তলায় লেগে না যায়। যখন দলা বেঁধে পাত্রের হালুয়া পা ছেড়ে দিলে নামাতে হয়। ঘি এর প্রলেপ দেয়া বড় থালায় নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। ঠাণ্ডা করার পূর্বে পেস্তা ও বাদামের কুচি ও কিসমিস উপরে ছড়িয়ে দিতে হয়। ঠাণ্ডা হলে ছুরি দিয়ে হালুয়া বরফী আকারে কেটে নিলে ভালো হয়।

ছোলার ডাল থেকে বেসন তৈরি : সাধারণত বুট বা ছোলা গুঁড়া করে যে পাউডার বা গুঁড়ি পাওয়া যায় তাই বেসন। বেসনের ব্যবহার বহুবিধ। বেসন দিয়ে ডালের বড়া, পাকোড়া ইত্যাদি তৈরি করা যায়। ডালমুটের মধ্যে বেসনের তৈরি বুন্দিয়া, ঝুরি, পাটিয়া মিশানো হয়ে থাকে। বেসন তৈরির উপকরণগুলো ছোলা/ডাল, কুলা, যাঁতা, গম ভাঙানোর মেশিন।

বেসন তৈরি : পরিপুষ্ট, অক্ষত ছোলা ডাল বাছাই করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। কুলা দিয়ে ঝেড়ে ছোলা ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হবে। পাথরের যাঁতায় ছোলার খোসা ছাড়িয়ে ভেঙে নিতে হবে। গম ভাঙানোর মেশিনে ছোলা ডাল ভাঙাতে হবে। মিলে ভাঙানোর ফলে ছোলা থেকে পাউডার বা ময়দা তৈরি হবে। একে বেসন বলে। এই বেসন পলিথিন বা চটের বস্তায় মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে ১ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। এই বেসন থেকে বেগুনি, পিঁয়াজু এবং বুন্দিয়া তৈরি করা হয়। ডাল উন্নত মানের না হলে ভালো বেসন হবে না। সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে বেসনে পোকা ধরবে।

বুটের বুন্দিয়া : বুন্দিয়া তৈরিতে ছোলার বেসন, খাবার সোডা, লবণ, সয়াবিন তেল, চিনি, জর্দার রং ইত্যাদি নিতে হয়। বেসন, খাবার সোডা, রং, লবণ, কাঁচাতেল প্রয়োজনমতো ভালোভাবে মিশিয়ে পানি সহযোগে তরল মণ্ড তৈরি করতে হয়। চুলার উপর কড়াই বসিয়ে তেল গরম করতে হয়। বুন্দিয়ার ডাইস কড়াইয়ের উপর রেখে ডাইসের উপর মণ্ড ঢাললে তা আপনা-আপনি গরম তেলে পড়বে। তবে একবারে বেশি বুন্দিয়া ভেজে দেওয়া যাবে না। কড়াইতে চিনি ও পানি সমপরিমাণ নিয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে সিরা তৈরি করতে হয়। সব বুন্দিয়া সিরার মধ্যে একবারে ঢালতে হয় এবং অল্প তাপে নেড়ে সমানভাবে গরম করতে হয়। সিরা থেকে বুন্দিয়া ছিদ্রযুক্ত বড় চামচ দ্বারা তুলে ট্রেতে ছড়িয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। পরে তা পরিবেশন বা বিক্রি করা হয়।

মিহিদানা : এটি বুন্দিয়া তৈরির মতোই হবে। তবে এখানে যে ডাইস দিয়ে বুন্দিয়া তৈরি হয় তার চেয়ে ছোট ছোট ছিদ্রের ডাইস ব্যবহার করে মিহিদানা তৈরি করতে হয়। এই মিহিদানা দিয়ে লাড্ডু তৈরি হয়।

চিত্র : বুটের হালুয়া ও বুন্দিয়া

৫.৫ মাষকলাই ও খেসারি ডালের বেসন থেকে বড়া, বেগুনি, চালকুমড়ার বড়ি, কচুরি ও আমৃত্তি তৈরি :

(ক) বেসন তৈরি : প্রথমে উত্তম মানের খেসারি অথবা মাষকলাইয়ের ডাল বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কুলা দিয়ে ঝেড়ে খেসারি বা মাষকলাইয়ের ডালের ধুলাবালি ও অপদ্রব্য পরিষ্কার করতে হয়। পাথরের যাঁতায় খেসারির ডালের খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। গম ভাঙানোর মেশিনে এই ডাল ভাঙালে বেসন পাওয়া যায়। ছোলার বেসনের মতোই খেসারি বেসন দিয়ে বড়া, বেগুনি, পিঁয়াজু ইত্যাদি তেলে ভেজে উপাদেয় নাস্তা হিসেবে খাওয়া হয়।

(খ) বড়া তৈরি : পরিমাণমতো বেসন নিয়ে তাতে লবণ ও পানি দিয়ে গোলা তৈরি করে নিতে হয়। গোলার সাথে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা ইত্যাদি মিশিয়ে নিতে হয়। কড়াইয়ে তেল গরম হলে ছোট ছোট বড়া তৈরি করে তেলে আস্তে আস্তে লাল করে ভাজা হয়। গরম গরম সস দিয়ে খেলে ভাল লাগে।

(গ) বেগুনি তৈরি : খেসারির বেসন পরিমাণমতো নিয়ে বড়া তৈরির মতো গোলা তৈরি করতে হয়। তার পর বাজার থেকে লম্বা বেগুন কিনে পাতলা করে স্লাইস করা হয়। অতঃপর স্লাইসগুলো গোলায় ডুবিয়ে তেলে ভেজে নিলেই বেগুনি তৈরি হয়ে যায়। রমজান মাসে এই বেগুনির খুবই চাহিদা হয়।

(ঘ) মাষকলাই ও চালকুমড়ার বড়ি : পরিপক্ব বড় আকারের চাল কুমড়া সংগ্রহ করে কাটতে হয়। কুমড়ার খোসা ও বিচি ফেলে মাংসল অংশ কুরানির সাহায্যে পেস্ট বা মণ্ড তৈরি করতে হয়। এই মণ্ড একটি পাতলা কাপড়ে নিয়ে সারারাত ঝুলিয়ে রাখতে হয়। তারপর এই চালকুমড়ার মণ্ড পরিমাণমতো নিয়ে ডালের কাই-এর সাথে মেশাতে হয়।

এদিকে খোসা ছাড়ানো পরিষ্কার পুষ্ট মাষকলাইয়ের ডাল সংগ্রহ করে ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভেজানো ডাল পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে শিল-পাটায় পিষে কাই তৈরি করতে হয়। চালকুমড়ার পেস্ট ও ডালের কাই ভালো করে মিশ্রণ করে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করে তা পাটি ও বড় পলিথিন শিটে সাজিয়ে রাখতে হয়। ২-৩ দিন বড়ি রোদে শুকাতে হয়। শীতকালে এ বড়ি তৈরি করে পলিব্যাগে বা টিনের কৌটায় বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করতে হয়। মাষকলাইয়ের বড়ি মাছের তরকারি বা সবজির লাবড়াতে ব্যবহার করা যায়।

চিত্র : বড়া, বেগুনী ও মাষকলাইয়ের বড়ি

চাল কুমড়ার বড়ি রান্নার পদ্ধতি : পদ্ধতি জানা না থাকলে রান্নার সময় চাল কুমড়ার বড়ি আস্ত থাকে না তরকারির সাথে গুলিয়ে যায়। ফলে তরকারির স্বাদ যেমন নষ্ট হয় তেমনি এর সৌন্দর্যের হানি হয়।

প্রথমে বড়িগুলোকে হালকা মসলা দিয়ে মেখে নিতে হবে। কড়াইয়ের গরম তেলে বড়িগুলোকে হালকা বাদামি করে ভাজতে হবে। অন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে তাতে বাকি প্রয়োজনীয় মসলা লবণ সহযোগে ভালোভাবে কষিয়ে এর মধ্যে ভাজা বড়িগুলো ছেড়ে দিতে হবে। মাছ দিয়ে রান্না করতে চাইলে মাছ আলাদা কষিয়ে নিতে হবে। এরপর কষানো শেষে ঐ বড়িগুলোর সাথে মাছও ছেড়ে দিতে হবে। এবার সব উপকরণ কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে কষানোর পর তাতে হালকা করে গুলানো তেঁতুলের পানি ঢেলে ১০-১৫ মিনিট উনুনে রেখে তারপর তরকারির পাতিলটি নামিয়ে এনে পরিবেশন করতে হবে।

(ঙ) কচুরি : এটি একটি নাস্তা (Snacks) জাতীয় হালকা খাবার। বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যা বেলা বা গ্রীষ্মের ছুটির দিনের বিকেলে আসরকে জমজমাট করতে শিঙাড়া, কচুরি ও ডালপুরীর তুলনা নেই। কচুরি তৈরিতে ছোলার ডাল, ময়দা ও কিছু মসলা লাগবে।

প্রথমে পরিমাণমতো টাটকা ছোলার ডাল নিয়ে সামান্য চুন ও পানি দিয়ে মেখে নিয়ে রেখে দিতে হবে। ডাল ভালো করে সিদ্ধ করে পানি ঝরাতে হবে। কচুরির জন্য কালোজিরা, মৌরি, কড়াইয়ে ভেজে গরম থাকতেই থেতো করে নিতে হবে। এটাই কচুরির মসলা। পুরে খাবার সোডা মেশালে কচুরির ভিতর জালি জালি হবে। এরপর ময়দার খামির করে তা রুটির মত বেলে নিতে হবে। এরপর পুলি পিঠার মতো কেটে তাতে কচুরীর পুর দিয়ে চারধারে এঁটে দিতে হবে। কড়াইয়ের ঘি গরম করে কাঁটা কচুরিগুলো ক্রমাগত ভেজে নিতে হবে। কচুরিগুলো বাদামি রং হলে তা নামিয়ে ঘি মথিয়ে সসসহ পরিবেশন করা যাবে। ছোলার ডাল ছাড়াও মুগ, কলাইয়ের ডাল দিয়েও কচুরি তৈরি করা যায়।

(ঞ) আমৃতি : মিষ্টান্নের জগতে আমৃতি খুবই পরিচিতি নাম। এটি খেতে সুস্বাদু এবং দেখতে অনেকটা জিলাপির মতো। তবে জিলাপির চেয়ে এটি বেশ শক্ত এবং গোলাকার। এটি চিনির রসে ভিজিয়ে শক্ত করা হয়।

আমৃতির জন্য চিনির সিরা তৈরি : প্রথমে তিন ভাগ চিনি ও এক ভাগ পানি নিতে হবে। এরপর কড়াইতে চিনিসহ পানি জাল দিতে হবে। চিনির গাদ বা ফেনা উঠলে তা চামচ দিয়ে তুলে অন্য পাত্রে রাখতে হবে। তারপর জাল কমিয়ে রাখতে হবে। সমস্ত গাদ ফেলে দেয়ার পর সিরা লালচে হয়ে উঠলে কড়াই নামিয়ে সিরা ছেকে রাখতে হবে। তারপর অল্প আঁচে চুলায় চাপলে ঘন সিরায় পরিনত হবে।

আমৃতি তৈরি : প্রথমে আমৃতি বানাবার ১০ দিন আগে ১ কেজি মাষকলাইয়ের ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। ডাল ভিজবার ২দিন পর ২০ গ্রাম চুনের পানি মিশাতে হয়। ১০ দিন পর ঐ ডাল বেটে আধা কেজি আতপচাল গুঁড়ি ভালো করে মিশিয়ে গোলা তৈরি করতে হবে। গোলা যেন পাতলা হয়। এরপর কড়াইতে ঘি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। জিলাপির মতো একটি ন্যাকড়া জোগাড় করে তাতে ছিদ্র করে গোলা ভরতে হবে। এরপর কড়াইয়ে গরম ঘিয়ের মধ্যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমৃতির মতো পাক দিতে হবে। পাক যত সুন্দর হবে আমৃতি দেখতে তত সুন্দর লাগবে। কড়াইতে যে কটা আমৃতি আটবে ঠিক সে কঁটাই দিতে হবে। উল্টে পাল্টে দিয়ে ভাজা লালচে রঙের হয়ে এলে ঝাঁঝরি চামচ দিয়ে তুলে আমৃতি চিনির সিরায় ডুবাতে হবে। ১০-২০ মিনিট পর তুলে পাত্রে সাজিয়ে রাখতে হবে। অনেকে মাষকলাই ডালের পরিবর্তে সুজি দিয়ে আমৃতি তৈরি করে থাকেন।

২০২২

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কোনো ডালে আমিষ বেশি থাকে?

২. ডালের সাথে কী যোগ করলে এর আমিষের গুণাগুণ আরও বেড়ে যায়?

৩. ডাবলি বা চটপটির ডাল নরম করতে কী মেশাতে হয়?

৪. খাবার সোডা ব্যবহার করলে ডালের কোন ভিটামিন নষ্ট হয়?

৫. মসুর ডালকে টক করতে চাইলে কী কী দেয়া যায়?

৬. মুগ ডালের স্বাদ কীভাবে বাড়ে?

৭. মুগ ডালকে সুস্বাদু করতে কী দেয়া যায়?

৮. মাষকলাই ডালকে আরও ঘন করার জন্য কী মিশাতে হয়?

৯. মাষকলাই ডালকে আরও সুস্বাদু করার জন্য কী মাছ দিয়ে রান্না করা হয়?

১০. মাষকলাই ডালকে কীভাবে রান্না করলে এর ঘ্রান বেড়ে যায়?

১১. কী কী মিশায়ে মুগডালের পরোটা তৈরি করা হয়?

১২. মুগডালের পাকোড়া তৈরিতে কী কী উপকরণ লাগে?

১৩. মুগাঙ্কুর মানে কী?

১৪. মুগাঙ্কুরে কী কী পুষ্টি থাকে?

১৫. মুগ ডালের বীজ কত দিন ভিজিয়ে কত সেমি অঙ্কুর হলে মুগাঙ্কুর হয়?

১৬. চিড়া ডালমুটে কী কী উপকরন লাগে?

১৭. দইবড়া কী ধরনের খাবার?

১৮. চানাচুরের প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি কী কী?

১৯. চানাচুরের মটরডাল ভাজার আগে কত ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়?

২০. চানাচুরের সাথে খেসারি ডালের বেসনের কোনো খাদ্য খাবার মেশাতে হয়?

২১. চনাচুরের সাথে মেশানোর জন্য কোন খাদ্য তৈরিতে অতিরিক্ত কালিজিরা লাগে?

২২. চানাচুরের সব উপকরণ মেশানোর পর কোন এসিড মিশাতে হয়?

২৩. মটর চটপটি তৈরিতে কখন বেকিং পাউডার দিতে হয় না?

২৪. হালুয়া তৈরিতে ডাল কীভাবে বাটতে হয়?

২৫. হালুয়া নামিয়ে ঠাণ্ডা করার পূর্বে কী করতে হয়?

২৬. ছোলার বেসন দিয়ে কী কী খাবার তৈরি করা যায়?

২৭. ছোলার বেসন কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়?

২৮. বুন্দিয়া তৈরির উপকরণ কী কী?

২৯. মাষকলাইয়ের বড়ি কতদিন রোদে শুকাতে হয়?

২০২২

৩০. মাষকলাইয়ের বড়ি কিসের সাথে রান্না করে খেতে হয়?

৩১. কচুরি বলতে কী বুঝায়?

৩২. কচুরি তৈরির মশলা কী কী?

৩৩. কচুরি দেখতে কোন পিঠার মত?

৩৪. আমৃতি তৈরির কতদিন পূর্বে মাষকলাইয়ের ডাল ভিজাতে হয়?

৩৫. আমৃতি তৈরির গোলা করতে কী কী লাগে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডাল সিদ্ধ করার পদ্ধতি গুলো কী কী?

২. মসুর ডালকে ভিন্ন আমেজের করতে হলে কী কী দিতে হয়?

৩. মুগ ডাল ফুটে উঠলে কী কী দিয়ে পরিবেশন করতে হয়?

৪. মসুর ডালের পিঁয়াজু তৈরি বর্ণনা কর।

৫. মুগ ডালের পরোটা কীভাবে বানাতে হয়?

৬. মুগ ডালের পাকোড়া তৈরির বর্ণনা কর?

৭. অঙ্কুরিত মুগের সালাদ কীভাবে পরিবেশন করা হয়?

৮. চিড়া ডালমুঠের তৈরি প্রবাহ চিত্র লেখ?

৯. খেসারির বেসন দিয়ে কীভাবে পাপড় ও গাটিয়া তৈরি করে?

১০. বোম্বাই চানাচুর কীভাবে তৈরি করে?

১১. বুটের বরফি কীভাবে তৈরি করে?

১২. বুটের বুন্দিয়া ও মিহি দানা কীভাবে তৈরি করা হয়?

১৩. চালকুমড়ার বড়ি অনেকে রান্না করতে পারে না, কারণ কী?

১৪. কচুরি কী ধরনের খাবার?

১৫. আমৃতি ও জিলাপির মধ্যে পার্থক্য কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডাল রান্নার সাধারণ নিয়ামাবলি ও ডাল সিদ্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. মসুর , মুগ ও মাষকলাই ডাল রান্নার বিশেষ নিয়ম বর্ণনা কর।

৩. মুগ ও মটর ডাল থেকে পরোটা, পাকোড়া, মুগাঙ্কুর, চিড়া ডালমুট ও দইবড়া তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. চানাচুর ও মটর চটপটি তৈরি পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা কর।

৫. ছোলার ডালের হালুয়া, বুন্দিয়া ও মিহিদানা তৈরি বর্ণনা কর।

৬. মাষকলাই ও চাল কুমড়ার বড়ি তৈরি ও রান্নার নিয়ম লিখ।

৭. কচুরি ও আমৃতি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অধ্যায় ৬

তেল বীজের জাত, পুষ্টি, সংরক্ষণ ও মিলিং

ভূমিকা : মুখরোচক স্বাদের যে কোনো খাবার রান্নাতেই তেলের প্রয়োজন। তেল স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য। তেল খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু করে, খাদ্যগুণকে অটুট রাখে এবং খাবারের খসখসে ভাব দূর করে। তেলে যে ভিটামিন বা খাদ্যগুণ রয়েছে তা খাদ্যবস্তুর সাথে যুক্ত হয়ে এর স্বাদ ও গুণাগুণকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

আমাদের দেশের তেলসমৃদ্ধ ফসলগুলো হচ্ছে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, তিসি, গর্জনতিল, সূর্যমুখী, কুসুম ফুল, সয়াবিন, নারিকেল ইত্যাদি। তেল ফসলগুলো আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে-আমাদের জনপ্রতি দৈনিক ২২ গ্রাম তেল খাওয়া প্রয়োজন। দেশে ভোজ্যতেলের ঘাটতি প্রায় ৭০ ভাগ। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ভোজ্যতেল শক্তির উৎস হিসেবে অতি প্রয়োজনীয়। চর্বিতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ ডি ই কে ইত্যাদি দ্রবীভূত হওয়ার জন্য উদ্ভিজ্জ তেলের প্রয়োজনীয়তা অনেক। কারণ এর অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। এছাড়া উদ্ভিজ্জ তেলে কোলেস্টরল না থাকায় শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। আমরা উদ্ভিজ্জ তেলফসল থেকে দুই ধরনের তেল পেয়ে থাকি। যেমন- উদ্বায়ী তেল ও অনুদ্বায়ী তেল

(ক) উদ্বায়ী (Volatile) তেল : যে সকল তেল খোলা অবস্থায় রেখে দিলে বাষ্পায়িত হয়ে যায় তাকে উদ্বায়ী তেল বলে। যেমন– লেমন ঘাসের তেল, দারুচিনির তেল, কমলা লেবুর খোসার তেল, গোলাপের পাপড়ির তেল ইত্যাদি। এ তেল সুগন্ধি এবং কনফেকশনারিতে ব্যবহার হয়।

(খ) অনুদ্বায়ী (Non Volatile) তেল : যে সকল তেল খোলা অবস্থায় রেখে দিলে বাতাসে মিশে যায় না বা বাষ্পায়িত হয় না তাকে অনুদ্বায়ী তেল বলে। যেমন- সরিষা তেল, তিলের তেল, সয়াবিন তেল, বাদাম তেল, সূর্যমুখী তেল, তিসির তেল, ভেরেন্ডার তেল ইত্যাদি। উদ্ভিদ উৎস থেকে প্রাপ্ত এ তেলকে ভোজ্যতেল (Edible Oil) বলে।

খাঁটি ও ভেজাল তেল : রান্নার কাজে খাঁটি তেল ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। কারণ খাঁটি তেলে খারাপ গন্ধ থাকে না, এর দ্বারা রান্না করা যে কোনো খাবারের নিজস্ব স্বাদ, গন্ধ নষ্ট হয় না। ভোজ্যতেলগুলো খাঁটি হলে এগুলোর রান্না করা খাবারও উন্নত মানের হয়।

বড় বড় হোটেলে রান্নার জন্য দামি ও খাঁটি উদ্ভিজ্জ তেল যেমন- জলপাইয়ের তেল, লবঙ্গ তেল, তিলের তেল, চালের কুঁড়ার তেল, বাদাম তেল ও সূর্যমুখী তেল ব্যবহার করে সকল খাবারকে সুস্বাদু করা হয়। কিন্তু আমরা ঘরে সয়াবিন তেল ব্যবহার করি যাতে ভিটামিন থাকলেও স্বাদ ও গন্ধ নেই। অথচ দেশীয় সরিষার তেলে রয়েছে স্বাদ, ঘ্রাণ ও প্রচুর ভিটামিন। কিন্তু বর্তমানে সরিষার ও সয়াবিনের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা বিভিন্ন ভেজাল বা নিম্নমানের তেল খাচ্ছি। তাজা তরিতরকারির স্বাদ পেতে হলে খাঁটি ভোজ্যতেল দিয়ে রান্না করতে হবে।

খাঁটি তেল শনাক্তকরণ: তেল খাঁটি কি ভেজাল তা আমরা খালি চোখে বা গন্ধে বুঝতে পারি না। তবে খাঁটি ও ভেজাল তেল বোঝা যায় নিম্নের কৌশলে–

(১) যে সব তেল গরম করলে তা থেকে অধিক ধোঁয়া ওঠে সেই তেল ভেজাল বলে ধরে নিতে হবে।

(২) এ ছাড়া গরম করার ফলে তেল থেকে পচা গন্ধ বের হলে বা ফেনা উঠতে থাকলে সেই তেল ও ভেজালযুক্ত। ভেজাল তেল তাড়াতাড়ি গরম হয় এবং গরমে অধিক উপাদের আবরণ পুড়ে যায়। তেল কখনই বেশি গরম করতে নেই। এতে তরকারি রাঁধার সময় খারাপ গন্ধ আসে এবং তেলের নিজস্ব পুষ্টিমান নষ্ট হয়ে যায়।

তেল ফসলের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি :

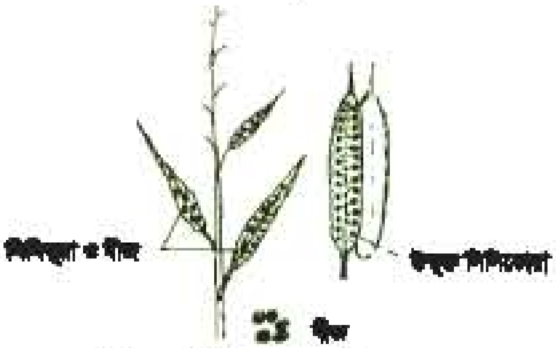

চিত্র : সরিষা ফল ও বীজ

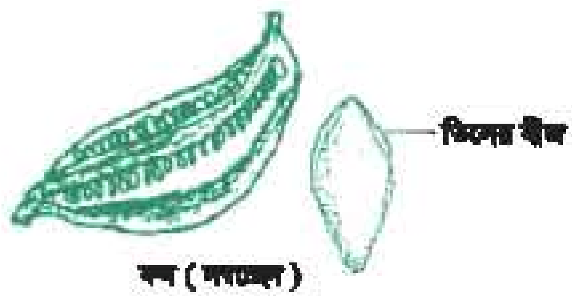

চিত্র : তিলের ফল ও বীজ

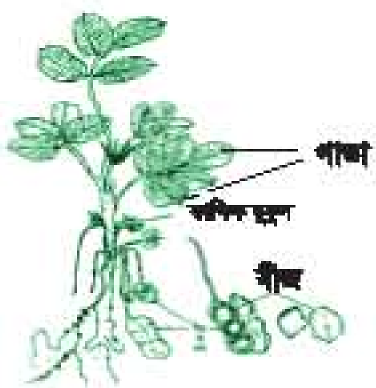

চিত্র : চিনা বাদামের গাছ, ফল ও বীজ

চিত্র : সয়াবিনের ফল ও বীজ

৬.১ বিভিন্ন তেল বীজের নাম ও জাত :

তেল ফসলের বিভিন্ন জাত। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে তেল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে তেলের ঘাটতি পূরণের জন্য তেল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তেল ফসলের উন্নত জাতসমূহ নিম্নে সারণিতে বর্ণনা করা হলো–

ক্র: নং	তেল ফসলের নাম	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য	ফসল/হেঃ (টন)
১	সরিষা	টরি- ৭	ফল দুই কক্ষ বিশিষ্ট বীজ গোলাকার ও পিঙ্গল বর্ণের। তেলের পরিমাণ ৩৮-৪১%	৯৫০-১০০০ কেজি
		সোনালি সরিষা (এস এস-৭৫	ফলে ৪টি কক্ষ থাকে। বীজ হলদে সোনালি, গোলাকার। তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%	১.৮-২০
		কল্যাণীয়া (টি এস-৭২)	বীজ গোলাকার। বীজে তেলের পরিম্যণ ৪০-৪২%। আগাম জাত	১.৪৫-১.৬৫
		দৌলত (আর এস-৮১)	খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল জাত। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%	১.১-১.৩
		বারি সরিষা-৬ (ধলি)	ফল দুই কক্ষ বিশিষ্ট। বীজের রং হলদে, বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%	১.৯-২.২
		বারি সরিষা-৭ (ন্যাপাস-৩১৪২)	ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট। গাছের পাতা বোঁটাহীন ফুলের পাপড়ি সাদা। তেলের পরিমাণ-৪২-৪৫%	২.০-২.৫ টন
		বারি সরিষা-৮ (ন্যাপাস-৮৫০৯)	ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট। ফুল হলদে, বীজের রং কালচে। তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৫%	২.১-২.৫ টন
		রাই - ৫	পাতা বোঁটাযুক্ত ও খসখসে। ফুল কুঁড়ির নিচে অবস্থান করে। বীজ লালচে বাদামি বীজে তেলের পরিমাণ-৩৯-৪০%	১.০-১.১ টন
		বারি-সরিষা-১১	খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু, পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল ও আরর্লিব্লাইট প্রতিরোধী, তেলের পরিমাণ ৪০-৪২।	২.০-২.৫
		বারি- সরিষা-১৪	আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%	১.৪-১.৬
		বারি সরিষা-১৫	আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%	১.৪-১.৭
		বারি সরিষা-১৬	পাতা ঝলসানো রোগ ও লবণাক্ততা সহনশীল ও আরোবাংকি প্রতিরোধী, তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%	২.২-২.৫
		বারি সরিষা-১৭	আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%	১.৭-১.৮
২.	চীনা বাদাম	মাইজচর বাদাম (ঢাকা-১)	পাতা হালকা সবুজ, প্রতি বাদামে ১-২টি দানা, দানার আকার মাধ্যম, গোলাকার, রং হালকা বাদামি	১.৮-২.০ টন রাবিতে ১.৬-১.৮ টন খারিফে
		বাসন্তী বাদাম (ডিজি-২)	রেগসহনশীল জাত, বীজের আকার বড়, লম্বা এবং রং লালচে বাদামি	
		ঝিঙ্গা বাদাম (এসিসি-১২)	বাদামে দানার সংখ্যা ৪টি, আকার মধ্যম, চ্যাপ্টা ও হালকা বাদামি, খরা সহনশীল জাত	২.৪-২.৬ টন
		ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১)	বাদামের শিরা উপশিরা খুব স্পষ্ট, দানার আকার বড়। বীজের সুপ্তিকাল ১০-১৫ দিন।	২.৭-৩.১ টন রবিতে ২.০-২.৫ টন খারিফে

		বারি চীনামাদাম-৫	বাদামের শিরা উপশিরা খুব স্পষ্ট, দানার আকার বড়। বীজের সুপ্তিকাল ১০-১৫ দিন।	২.৭-৩.১ টন রবিতে ২.০-২.৫ টন খারিফে
		বারি চীনাবাদাম-৬	খোসার উপরিভাগ মসৃণ পাতলা, বীজের রং হালকা বাদামি। পাতা গাঢ় সবুজ।	২.৫-২.৮ টনা রবিতে ২.০-২.৪ টন খারিফে
		বারি চিনাবাদাম-৮	পাতা দাগ রোগ সহনশীল ও শোষক পোকাসহনশীল এবং তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%	২.৩-২.৫ ২.০-২.২ (খারিফে)
		বারি চিনা	তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%	২.৩-২.৫

৬.২ তেল ফসলের পুষ্টিমান :

তেলের পুষ্টিমান : তেল ফসল বা তেলবীজ উদ্ভিজ চর্বির একটি উৎকৃষ্ট উৎস। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের আধিক্যের উপরই উদ্ভিজ্জ তেলের গুণাগুণ নির্ভর করে। ১ গ্রাম তেল থেকে ৯ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ তেল প্রয়োজনীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড সরবরাহ করে যা শরীরে উৎপন্ন হয় না এবং দীর্ঘদিন এর অভাবে একজিমা, চামড়ার অন্যান্য ও অস্বাভাবিকতা, রাতকানা রোগ হয় এবং দেহের ওজন বাড়ে না। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন 'এ' শরীরে গ্রহণ উপযোগী করার জন্য তেল বা চর্বি খুবই প্রয়োজন। নিচে বিভিন্ন প্রকার তেলের পুষ্টিমানের বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

(১) **সরিষার তেল :** সরিষা সাধারণত ৪০-৪৪% তেল এবং ২৪-২৫% আমিষ থাকে। এজন্য সরিষা থেকে প্রচুর তেল পাওয়া যায়। তেল নেওয়ার পর যে সরিষার ছোবড়া বা খৈল পাওয়া যায় তা একটি উত্তম গোখাদ্য। এতে ৪০ ভাগ আমিষ থাকে। সরিষার তেলের বর্ণ হলুদ এবং একটি বিশেষ গন্ধযুক্ত। অনেক স্থানে সরিষার তেল Salad Oil এবং কাসুন্দি হিসেবেও ব্যবহার হয়। সরিষার তেলে ইউরোসিক এসিড ছাড়া অন্যান্য যেসব ফ্যাটি এসিড আছে তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। ইউরোসিক এসিড বিষাক্ত এবং সহজে অপসারণ করা যায় না। সরিষা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং রাতাকানা রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। সেজন্য খাদ্যের সাথে সরিষা তেল সংযোজন করা ভালো।

(২) **তিলের তেল :** তিলে সাধারণত ৪২-৪৫ ভাগ তেল এবং ২ ভাগ আমিষ থাকে। তিলে ৩৫-৫০ ভাগ সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে যা স্বাস্থের জন্য ভালো। খোসা ছাড়ানো তিলে প্রায় ১৮.২ ভাগ আমিষ থাকে। তিল বীজে ভিটামিন-এ এবং খনিজ পদার্থ আছে যা রক্তশূন্যতা, রাতকানা ও একজিমা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। তিল বীজে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ খুব সামান্য। তিলের তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে। তিল তেল ঔষুধ ও কসমেটিক শিল্পেও ব্যবহার হয়।

(৩) **তিসির তেল :** তিসির বীজে ৩৫-৩৮% তেল ও তিসির খৈল ৭-১০% তেল থাকে। তিসির তেল ভোজ্য নয়।

(৪) **গর্জনতিলের তেল :** গর্জনতিল একটি ভোজ্যতেল ফসল। বীজে শতকরা ৩৮-৪২ ভাগ তেল, ২০-২৫ ভাগ আমিষ, ৪.৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এ তেলে মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের মধ্যে লিনোলিক এসিডের পরিমাণ ৫০ ভাগ এবং ফলিক এসিডের পরিমাণ ৩০ ভাগ। গর্জন তিলের গুণাগুণ ভোজ্য তেল হিসেবে খুবই ভালো। তবে এ দেশে গর্জন তিলের তেলের এখনও বেশি প্রচলন হয়নি। সরিষার বীজের মতো গর্জন তিল বা গুজির বীজ ঘানিতে ভাঙিয়ে তেল নিষ্কাশন করা যায়। এটি গন্ধহীন তেল। এ তেলের খৈল গবাদি পশুর জন্য উপাদেয় খাদ্য।

(৫) **চিনা বাদামের তেল :** চিনাবাদাম একটি পুষ্টিকর তেলজাতীয় খাদ্য। চীনাবাদামের তেলকে এরাকিস তেল বা পিনাট তেল বলে যা দেখতে হালকা হলুদ বর্ণের। এর বীজে ৪৮-৫০ ভাগ শর্করা, তেল ২৫-৩০ ভাগ, আমিষ ৪০-৪৫ ভাগ সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ১৫-২০ ভাগ, শর্করা এবং ৫-৭ ভাগ ছাই রয়েছে। এই তেলে প্রচুর পরিমণে অলিক এসিড, লিনোলিক এসিড ও ফরমিটিক এসিড থাকে। চীনাবাদামে যথেষ্ট ভিটামিন-বি, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন-ই এবং অল্প পরিমাণে ভিটামিন-এ, সি ও ডি রয়েছে। গুণাগুণের দিক দিয়ে চীনাবাদামের তেল সরিষার তেলের চেয়ে ভালো। কিন্তু রান্নার তেল হিসেবে বাংলাদেশে এর ব্যবহার নাই। ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এখনও চীনাবাদাম তেল ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাদামের বর্তমান বাজার দরে চীনাবাদাম থেকে তেল নিষ্কাশন লাভজনক নয় বিধায় সরাসরি খাওয়া হয়। সুতরাং বাদাম তেল খাওয়ার চেয়ে আস্ত বাদাম খাওয়া অধিক লাভজনক। উৎপাদিত্ব চীনাবাদাম প্রধানত ভাজা বাদাম, মার্জারিন এবং বিভিন্ন কনফেকশনারি দ্রব্যে যেমন- চানাচুর, বিস্কুট তৈরিতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

(৬) **সূর্যমুখী তেল :** সূর্যমুখী বীজে ৪২-৪৪ ভাগ তেল এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমিষ থাকে। এ তেলে ৪০-৪৫ ভাগ লিনোলিক এসিড এবং ২৫-৩০ ভাগ অলিক এসিড থাকে। সূর্যমুখীর বীজে ১৫-২০ ভাগ আমিষ ও ২৫-৩০ ভাগ শর্করা থাকে। সূর্যমুখী বীজের খৈলে প্রচুর আমিষ থাকে, ফলে এটি উন্নতমানের গো-খাদ্য। সূর্যমুখী ফুলের বীজ কাঁচা ভেজে, লবণ দিয়ে বা গুঁড়া করে ময়দা বনিয়ে খাওয়া যায়। এ তেলের রং সরিষা তেলের চেয়ে হালকা রঙের। সূর্যমুখী তেল চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের একটি ভালো দ্রাবক। এ তেল রক্তের কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগীদের অত্যন্ত উপকার করে। এছাড়া দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে। এ তেল ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ।

(৭) **সয়াবিন তেল :** সয়াবিন বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনাময় তেল শস্য। সয়াবিন বীজে ৪০-৪৫ ভাগ আমিষ ২১-২২ ভাগ তেল এবং ২৪-২৬ ভাগ শ্বেতসার এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যারোটিন রয়েছে। অন্য কোনো ফসলে সয়াবিনের মতো এত আমিষ

নাই। সয়াবিনে অন্যান্য ডালের চেয়ে কম পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়, বিধায় এটি বহুমূত্র রোগীদের জন্য উপকারী। এ তেল রক্তের কোলেস্টেরল কমায় বলে এটি হৃদরোগীদের জন্য উপকারি। সয়াবিনের কিছু পুষ্টিবিরোধী উপাদান বা জৈব বিষ আছে। তবে অন্যান্য ডালের সাথে সয়াবিন মিশিয়ে রান্না করলে যে কোনো একক ডালের চেয়ে এর পুষ্টিমাণ বেড়ে যায়। সহজপাচ্য করতে হলে সয়াবিন অধিক সময় ধরে রান্না করতে হয়। সয়াবিন রান্না করার সময় আয়োডাইজড লবণ ব্যবহার করা উচিত।

(৮) **পাম অয়েল :** পাম গাছের বীজের মাংসল অংশ থেকে ৯ ভাগ ও বীজের শাঁস থেকে ১ ভাগ পাম কার্নেল তেল পাওয়া যায়। পাম তেল স্বাদহীন, গন্ধহীন ও এর রং স্বল্লাভ হলুদ। পাম তেলে বিটা ক্যারোটিন ও ভিটামিন-ই বেশি থাকে। পাম তেলে ১১% লিনোলিক এসিড ৪০% অলেয়িক এসিড আছে। মানুষের খাদ্যে কোলেস্টেরল বৃদ্ধিকারক মাইরিস্টিক এসিড পাম তেলে নগণ্য পরিমাণে আছে। Palm oil research instititute of malayasia (PORIM) এর মতে পাম তেলে কোলেস্টরল নেই।

(৯) **নারিকেল তেল :** বাংলাদেশে নারিকেল তেল মাথার চুলে মাখলেও ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস, শ্রীলংকা, মালায়েশিয়া ও ভারতের কর্ণাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন প্রদেশে ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(১০) **চালের কুঁড়ার তেল বা রাইস ব্রান অয়েল :** বর্তমানে বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে চালের কুঁড়া থেকে উন্নতমানের ভোজ্য তেল উৎপাদন শুরু হয়েছে। চালের কুঁড়া ২০-২৫% তেল থাকে। এই তেলে শূন্য মাত্রায় কোলেস্টেরল এবং আমিষ পাওয়া গেছে। এ তেল ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ। এতে শরীরে এন্টিবডি তৈরিসহ চর্মরোগ প্রতিরোধ করে। চাল তৈরির ৮ ঘন্টার মধ্যে কুঁড়া থেকে তেল আহরণ করলে তেলের মান ভালো হয়। ভারতে চালের কুঁড়া থেকে সয়াবিনের চেয়ে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত ভোজ্যতেল উৎপদান হচ্ছে। নিম্নে সারণিতে তেল বীজের পুষ্টিমানের তালিকা দেওয়া হলো।

২০২২

সারণি: বিভিন্ন তেলবীজের পুষ্টি তালিকা :

ক্রঃ নং	তেল ফসল	আমিষ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	শক্তি (কিলোক্যালরী)	চর্বি (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	জলীয় পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	ফসফরাস (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	ক্যারোটিন (মি. গ্রাম)	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	রিবোফ্লাভিন (মি. গ্রাম)	নায়াসিন (মি.গ্রা)	ভিটামিন সি
১	চীনাবাদাম	২৫.৩	২৬.১	৫৬৭	৪০.১	২.৪	৩.০	৩.১	৯০	৩৫০	২.৮	৩৭	০.৯০	০.১৩	১৯.৯	০
২	সরিষা	২০.০	২৩.৮	৫৪১	৩৯.৭	৪.২	৮.৫	১.৮	৪৯০	৭০০	১৭.৯	১৬২	০.৬৫	০.২৬	৪.০	০
৩	তিল	১৮.৩	২৫.০	৫৬৩	৪৩.১	৫.২	৫.৩	২.৯	১৪৫০	৫৭০	১০.৫	৬০	১.০১	০.৩৪	৪.৪	০
৪	তিসি	২০.৩	২৮.৯	৫৩০	৩৭.১	২.৪	৬.৫	৪.৮	১৭০	৩৭০	২.৭	৩০	০.২৩	০.০৭	১.০	০
৫	গর্জন তিল	২৩.৯	১৭.১	৫১৫	৩৯.১	৪.৯	৪.২	১০.৯	৩০০	২২৪	৫৬.৬	-	০.০১	০.০৭	৮.৪	০
৬	কুসুম ফুল	১৩.৫	১৭.৯	৩৫৬	২৫.৬	২.৬	৫.৫	৩৪.৯	২৩৬	৮২৩	-	-	-	-	-	-
৭	সূর্যমুখী	১৯.৮	১৭.৯	৬২০	৫২.১	৩.৭	৫.৫	১.০	২৮০	৬৭০	৫.০	০	০.৮৬	০.২০	৪.৫	১
৮	সয়াবিন	৪৩.২	২০.৯	৪৩২	১৯.৫	৪.৬	৮.১	৩.৭	২৪০	৬৯০	১১.৫	৪২৬	.৭৩	০.৩৯	৩.২	-
৯	নারিকেল (শুষ্ক)	৬.৮	১৮.৪	৬৬২	৬২.৩	১.৬	৪.৩	৬.৬	৪০০	২১০	২.৭	০	০.০৮	০.০১	৩.০	৭

৬.৩ তৈল বীজ সংরক্ষণ :

(১) **সরিষা বীজ :** পরিষ্কার ও শুকনা বীজ প্রায় দুই বছর পর্যন্ত বায়ুরোধী পাত্রে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এ জন্য কেরোসিন টিন বা মুখ বন্ধ করার উপযোগী মাটির পাত্র ব্যবহার করা যায়। বীজ সংরক্ষণের জন্য ৮ ভাগ বা এর কম আর্দ্রতা হলে বীজের ক্ষতি হয় না। তাই ৮-১০ ভাগ আর্দ্রতায় বীজ শুকানো উচিত।

(২) **তিল বীজ :** বীজ শুকায়ে তাড়াতাড়ি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। বায়ুরোধী মাটির পাত্র, টিন, বা পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণ পাত্র ভালোভাবে শুকানো না হলে পাত্রের গায়ের সংস্পর্শে থাকা ছত্রাক বীজগুলোতে আক্রমণ করে।

(৩) **চিনা বাদাম বীজ :** চিনাবাদামের বীজ বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে। তাই ৮-১০ ভাগ আর্দ্রতায় শুকানো বীজ খোসাসহ (Pod) প্লাস্টিক ব্যাগে ভর্তি করে মুখ বায়ুরোধী করতে হবে। বায়ু নিয়ন্ত্রিত গুদামে রাখা হলে বীজ দীর্ঘদিন অক্ষত থাকে। গুদামে ২-৮°C তাপমাত্রা ও ৬৫ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় রাখা হলে চীনাবাদাম বীজ দুই বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। এছাড়া প্রতি ১০০ কেজি বীজে ৩০০-৪০০ গ্রাম শুকনা চুন ($CaCO_3$) ছিদ্রযুক্ত কোটায় ভরে বায়ুরোধী চীনাবাদাম প্যাকেটের মধ্যে রাখা হলেও চীনাবাদাম ভালো থাকে।

(৪) **সূর্যমুখী বীজ :** বীজ শুকিয়ে ৮ ভাগ আর্দ্রতায় আসার পর ঠাণ্ডা করে বায়ুরোধী পাত্রে (কেরোসিন টিন, প্লাস্টিক লাইনার যুক্ত ব্যাগ বা মটকা ইত্যাদি) রাখা যায়। বীজ পাত্রটি ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখতে হয় এবং প্রয়োজনে প্রতি মাসে একবারে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। সূর্যমুখী বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে তেলের হার কমে যায়।

(৫) **সয়াবিন বীজ :** সয়াবিন বীজের সুপ্ততা খুব কম। তাই ভালোভাবে শুকায়ে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সয়াবিন বীজের বীজত্বক পাতলা, ফলে আঘাত পেলে বীজের ক্ষতি হয়। উষ্ণ মণ্ডলীয় দেশসমূহে সয়াবিন বীজ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা না হলে ৩-4 মাসের মধ্যেই সুপ্ততা নষ্ট হয়ে যায়। তবে বায়ুরোধী শুষ্ক পলিব্যাগে বা ড্রামে ৮ ভাগ আর্দ্রতাসম্পন্ন বীজ প্রায় ৬ মাস পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় রাখা যায়।

(৬) **তিসির বীজ :** তিসির বীজের ত্বক পাতলা হওয়ায় বেশি শুকালে ভঙ্গুর হয়। সংরক্ষণের জন্য নাড়াচাড়ায় বীজের গায়ে ফাটল ধরতে পারে। তাতে বীজে রোগজীবাণু আক্রমণ করতে পারে এবং সহজেই বীজের সুপ্ততা নষ্ট হতে পারে। তাই সতর্কতার সাথে রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে ভালোভাবে গুদামে সংরক্ষণ করলে ১০ বছর পর্যন্ত বীজ ভালো থাকে।

(৭) **গর্জন তিলের বীজে :** বীজ ২-৩ দিন ভালোভাবে শুকানোর পর ঠাণ্ডা করে বায়ুরোধী পলিব্যাগে বা পলিথিন লাইনারযুক্ত চটের ব্যাগে বা টিনে বা মটকায় সংরক্ষণ করা যায়। বীজ পাত্রটি শুকনা, ঠাণ্ডা ও উঁচু স্থানে রাখতে হবে।

৬.৪ ও ৬.৫ গোলজাত তেলবীজের ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের আক্রমণ ও দমন :

গোলজাত তেলবীজের ক্ষতিকারক পোকামাকড় হিসেবে সুনির্দিষ্ট কোনো পোকামাকড় চিহ্নিত করা নাই। তবে দানা শস্য হিসেবে চাল, গম ও বাদামে যে সকল পোকা আক্রমণ করে সেগুলোই তেলবীজেও আক্রমণ করে থাকে। যেমন- লাল শুসরী পোকা, খাপড়া বিটল ও সুরুই পোকা। এদের দমন ব্যবস্থা ধানের গোলাজাত পোকামাকড়ের মতোই যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.৬ তেলবীজ ভাঙানো বা মিলিং :

তেলবীজ মিলিং : তেলবীজ মিলিং বা ভাঙানোর পর আমরা তেল পেয়ে থাকি। তেলবীজ মিলিং এর চারটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন-

(১) ঘানি (২) এক্সপেলার (৩) সলভেন্ট এক্সট্রাকশন প্লান্ট ও (৪) রিফাইনারি ও হাইড্রোজিনেশন ইউনিট।

(১) **ঘানি :** এটি তেলবীজ ভাঙানোর গ্রামীণ ও পুরাতন পদ্ধতি। ঘানি সাধারণত মানুষ বা পশু চালিত হয়ে থাকে। সরিষা ও তিল সাধারণত ঘানিতে ভাঙানো হয়ে থাকে। ঘানিতে সর্বাধিক ৭০% তেল নিষ্কাশন হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ কাঠের অবকাঠামোতে হামান দিস্তার ন্যায় ঘানি দ্বারা বীজ চূর্ণকরণ ও পেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তেলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়। ঘানির তেলে ঝাঁঝালো গ্লুকোসিনোলেট (Glucosinolate) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধ সৃষ্টি হয়। এখনো গ্রামীণ এলাকায় মাঝে মাঝে ঘানির অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে বর্তমানে বৈদ্যুতিক তেল নিষ্কাশন যন্ত্র বা এক্সপেলার (Expeller) এর প্রচলনে ঘানির ব্যবহার বিলুপ্তপ্রায়। ঘানির অবকাঠামোগত উন্নতি করা গেলে এ পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের কর্মসংস্থান বজায় রাখা সম্ভব হবে।

চিত্রঃ (দেশীয় পদ্ধতিতে) তেল ঘানিতে নিষ্কাশন।

(২) **এক্সপেলার :** ঘানির উন্নত ও আধুনিক যান্ত্রিক সংস্কারণই হচ্ছে এক্সপেলার। এটি বিদ্যুৎ বা ডিজেল জাতীয় জ্বালানি দ্বারা চালিত। বর্তমানে এই নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারাই বেশির ভাগ তেলবীজ মিলিং করা

হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় পাঁচ হাজার এক্সপেলার ব্যবহৃত হচ্ছে। এ যন্ত্রে তেল নিষ্কাশনের হার প্রচলিত ঘানি অপেক্ষা বেশি। এ যন্ত্রে তেল নির্গমন পথে ফিল্টার দিয়ে তেল পরিষ্কার করা হয়। এক্সপেলারের তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি প্রচলিত ঘানির অনুরুপ। বাংলাদেশে চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার নিজস্ব দুইটি তেল নিষ্কাশন এক্সপেলার ইউনিট রয়েছে যা নারায়ণগঞ্জ ও কুলিয়ারচরে অবস্থিত । এখানে শুধু চীনাবাদম তেল নিষ্কাশন করা হয়।

চিত্র: এক্সপেলার

(৩) **সলভেন্ট এক্সট্রাশন প্লান্ট :** তেল বীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে অবশিষ্ট খৈল পড়ে থাকে তা থেকে সলভেন্ট এক্সট্রাকশন বা দ্রাবক আহরণ পদ্ধতিতে বাকি তেল নিষ্কাশন করা হয়। প্রাপ্ত খৈলকে গুঁড়া করে তাতে ফুড গ্রেড হেক্সেন দ্রাবক যোগ করা হয়। অতঃপর ৯৩-১০৪°C তাপমাত্রায় ভালো করে মিশ্রিত করা হয়। পাতন পদ্ধতিতে তেল ও দ্রাবক আলাদা করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত তেলকে ক্রুড ওয়েল (Crude oil) বা অপরিশোধিত তেল বলে। এ ধরনের দুটি প্লান্ট বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরে চালু রয়েছে। চট্টগ্রামে সরিষার খৈল থেকে এবং দিনাজপুরে চালের কুঁড়া থেকে তেল নিষ্কাশন করা হচ্ছে। আরও দুইটি এ ধরনের প্লান্ট একটি নারায়ণগঞ্জ ও অপরটি পাবনায় বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ দুইটি দ্বারা চীনাবাদাম, তিল, নারিকেল ও চালের কুঁড়া থেকে তেল নিষ্কাশন করা হবে। তুলাবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন প্লান্ট কুষ্টিয়ায় চালু আছে।

(৪) **রিফাইনারি ও হাইড্রোজিনেশন ইউনিট :** এ ধরনের প্লান্টে সাধারণত তেল বা চর্বি থেকে ফ্রি ফ্যাটি এসিড (Free fatty Acid) কমানো হয়ে থাকে। সর্বপ্রথম ধাপে ছাঁকন বা আস্রাবণ পদ্ধতি দ্বারা নিষ্কাশিত তেল থেকে অদ্রাব্য পদার্থ দূর করা হয়। ছাঁকার জন্য ফিল্টার প্রেস (Filter Press) যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং প্রাণিজ কয়লা বা অ্যাক্টিভেটেড কার্বন (Activated Carbon) তেলের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। গাম জাতীয় পদার্থ দূরীকরণ বা ডিগামিং (Deguming) এর জন্য ৮২°C তাপমাত্রায় উপর থেকে পানি ঢেলে দেওয়া হয় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দ্বারা নাড়া হয়, তাতে বিজলা ও ঘোলা পদার্থ বা কলয়েডস ও ফসফো লিপিডস (Colloids, Phospholipids) নিচে পতিত হয়। তেল নিরপেক্ষ বা অ্যালকালি রিফাইনিং (Alkali refining) কাজে NaOH (সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড) দ্রবণ বা চুনের পানি দ্বারা নিরপেক্ষ কারা হয়। বিরঞ্জন বা Bleaching (ব্লিচিং) করতে ফুলার্স আর্থ ও অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ব্যবহার করে এন্থোসায়ানিন, ক্যারটিনয়েড, ক্লোরোফিল, লেসিথিন, পিগমেন্ট দূর করা হয়। তেল সাদা ও বর্ণহীন করে ভোজ্যতেলে, সালাদ তেলে ও মার্জারিনে ব্যবহার করা হয়।

নির্গন্ধকরণ বা ডিওডোরাইজেশন (Deodorization) তেলের জন্য বাঞ্ছনীয়। অপরিষ্কার, ময়লা, নিকৃষ্ট গুদাম ও তেলের মৌলিক অংশ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ তেলে অবস্থানের

কারণে তেল দুর্গন্ধ হয়। বন্ধ নলে উচ্চ তাপের স্টিম (Steam) দ্বারা উত্তাপ দিয়ে বাষ্পপাতন বা স্টিম ডিস্টিলেশন (Steam distallation) করে নির্গন্ধকরণ করা যায়। অতঃপর হাইড্রোজিনেশন (Hydrogenation) করে তেলের রাসায়নিক পরিবর্তন করা হয়। এতে তেলের বর্ণ ও গন্ধ দূর হয়। এটা তেলকে বিশোধন করে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির সাথে মিশ্রণ বা ইমালশন ঘটিয়ে কোমল করে যাতে কোনো তেল রান্নার কাজে, কোনো তেল রুটি , বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি শিল্পের উপযোগী করা হয়। তেলকে হাইড্রোজিনেশন করে মার্জারিন বা ডালডা তৈরি করা হয়।

চিত্রঃ আধুনিক রিফাইনারি মেশিন।

তেল রিফাইনিং ও হাইড্রোজেনশনের প্রবাহচিত্র নিম্নরূপ :

২০২২

বর্তমানে আমাদের দেশে ১০টি রিফাইনিং কারখানা আছে। যেখানে ভোজ্যতেলের হাইড্রোজিনেশন ইউনিট কাজ করছে।

তেলবীজ মিলিং এর উপরোক্ত ৪টি পদ্ধতির মধ্যে কোন তেলবীজ কীভাবে মিলিং করা হয় তা নিম্নে বর্ণিত হল-

(ক) সরিষা মিলিং : সরিষা ব্যবহারের পূর্বে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা এবং ভাঙা ও অপরিপক্ব দানা চালনি দ্বারা চেলে ফেলতে হবে। প্রচলিত ঘানি এবং বৈদ্যুতিক এক্সপেলার দ্বারা সরিষা তেল নিষ্কাশন করা হয়। প্রচলিত ঘানির চেয়ে ভালোভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করলে এক্সপেলার দ্বারা ৩-৪% বেশি তেল পাওয়া যায়। দেশীয় ঘানিতে সরিষা ভাঙলে ৩৩ ভাগ তেল, বিদ্যুৎ চালিত ঘানি বা এক্সপেলারে ভাঙলে ৩৫ ভাগ তেল এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভাঙালে ৩৬-৩৮ ভাগ তেল পাওয়া যায়। ঘানি দ্বারা নিষ্কাশিত তেলে আইসোথিওসায়ানেট বেশি এবং এক্সপেলার দ্বারা নিষ্কাশিত তেলে আইসোথিওসায়ানেট কম থাকে।

(খ) তিল মিলিং : আমাদের দেশে তিল প্রধানত দেশীয় ঘানির দ্বারা নিষ্কাশন করা হয়। এখানে খোসাসহ তিল ব্যাহারের ফলে তেল ঘোলা, তিতা স্বাদ, উচ্চ আঁশ ও অক্সালেট দ্বারা দূষিত হয়। উচ্চমান সম্পন্ন তিল তেল ও খৈল পাওয়ার জন্য খোসা অপসারণ করে তেল নিষ্কাশন করা উচিত। খোসাহীন বীজে তেলের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু আঁশ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, আয়রন, থায়ামিন, ও রিবোফ্লোবিনের পরিমাণ কমে।

বীজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে খোসা ছাড়িয়ে সামান্য পানি ব্যবহার করে ঘানিতে তেল নিষ্কাশন করতে হয়। ময়লা ও অন্যান্য পদার্থ তেলের নিচের দিকে তলানিতে জমার জন্য নিষ্কাশনের পর একটি পাত্রে ২-৩ দিন রেখে দিতে হয়। শুকনা কাপড়ের সাহায্যে তেল ছাঁকা যেতে পারে। কোনো কোনো সময় পাত্রে জমা তলানি আবার ঘানিতে দিয়ে অধিক তেল নিষ্কাশন করা যায়। আধুনিক উপায়ে হাইড্রোলিক পদ্ধতি ও দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতির সাহায্যে ঘানির চেয়ে বেশি পরিমাণ তেল পাওয়া সম্ভব।

ফিল্টারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তেল উচ্চ মানসম্পন্ন হয়। পরিশোধিত তেলের রং হালকা হলুদ, যা সরাসরি সালাদ তেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় বারের নিষ্কাশিত তেল অতি উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট। এই তেল শোধনের পর খাওয়া যায়। তলানি থেকে তৃতীয় বারে নিষ্কাশিত তেল নিচু মানের যা খাওয়া যায় না। তবে সাবান কারখানায় ব্যবহার করা যায়।

(গ) চীনাবাদাম মিলিং : চীনাবাদাম থেকে তেল বের করতে হলে প্রথমে বাদামের খোসা ছাড়াতে হবে। হাতে বা মেশিনে খোসা ছাড়ানো সম্ভব। হাতে খোসা ছাড়ালে ১ জন লোক দৈনিক প্রায় ১০ কেজি বাদামের খোসা ছাড়াতে পারে যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও খোসা ছাড়ানো যায়।

২০২২

চিত্র: স্ক্রু প্রেস যন্ত্র দ্বারা চীনাবাদামের তেল নিষ্কাশন

খোসাহীন বাদামের উপরে লাল রঙের পর্দাজাতীয় আবরণ তুলে ফেললে সহজে হজম হয়। চীনাবাদামের তেল নিষ্কাশনের পর যে খৈল উপজাত হিসেবে থাকে তাকে চীনাবাদামের ময়দা বলে। এটি আমিষের একটি ভালো উৎস। বাদামের তেল থেকে মার্জারিন, মাখন, বনস্পতি তৈরি করা যায়। চীনাবাদাম মিলিং করে ময়দা তৈরির প্রাবাহচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো-

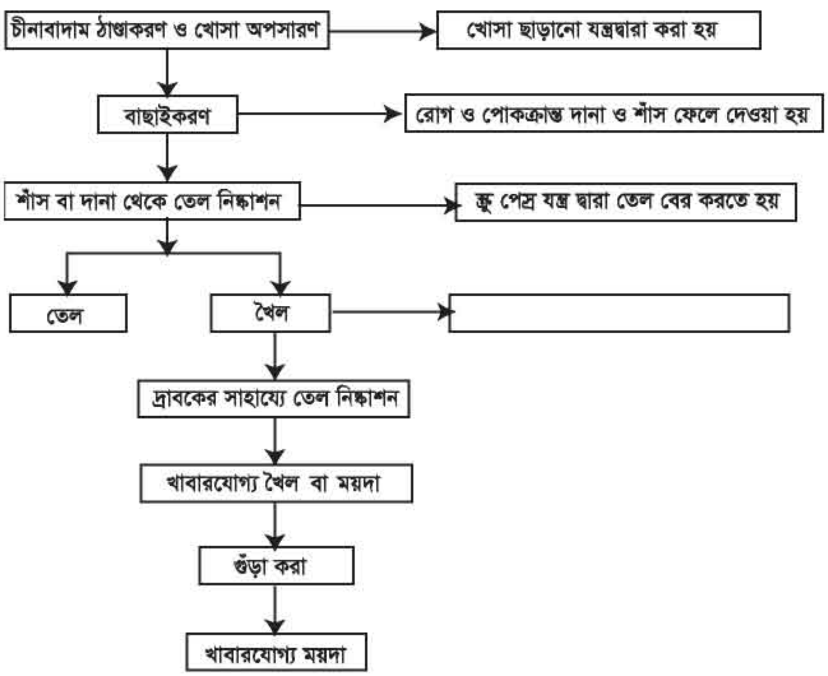

চিত্র : চীনাবাদাম মিলিং এর ফ্লোচার্ট

(ঘ) **সূর্যমুখী বীজ মিলিং :** সূর্যমুখীর বীজ থেকে তিন পদ্ধতিতে তেল নিষ্কাশন করা যায়। যথা- ঘানি, এক্সপেলার ও কায়িকভাবে। দেশীয় পদ্ধতিতে তেল নিষ্কাশনের হার ৩৫%, ঘানিতে তেল নিষ্কাশনের হার ২৫% এবং এক্সপেলার দ্বারা নিষ্কাশনের হার ৪০%। ঘানিতে ভাঙিয়ে সরাসরি এ তেল ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই তেলে কোলেস্টরলের পরিমাণ খুবই কম থাকে। এ তেলের লিনোলেনিক এসিডের পরিমাণ খুবই কম। তাই হাইড্রোজিনেশন না করলেও ক্ষতি নেই। এ তেল বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়, এতে কোনো বাজে দুর্গন্ধ হয় না। দৈনিক রান্নার কাজে পৃথিবীর বহু দেশে সূর্যমুখী তেলের ব্যবহার হচ্ছে।

সূর্যমুখী বীজ খোসাসহ চূর্ণ করে পানি দ্বারা মণ্ড তৈরি করা হয়। খোসা ছাড়িয়েও করা যায়। মণ্ড বা দ্রবণ গরম করতে হয়। দ্রবণে গরম পানি দিতে হবে ও আস্তে আস্তে নাড়তে হবে। এরপর চুলা থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। এ ঠাণ্ডা দ্রবণের উপর তেল ভেসে উঠবে। ফিল্টারের সাহায্যে উপর থেকে তেল ছেঁকে নিতে হবে। তেলের বোতলে বা পাত্রে এক চিমটি লবণ ফেলে দিলে অনেকদিন ভালো থাকে। বনস্পতি, মার্জারিন, মেয়োনেজ তৈরিতে বিশ্বব্যাপী এই তেল ব্যবহার হয়। কনফেকশনারি ও স্ন্যাকস জাতীয় খাবারে সূর্যমুখীর বিশেষ জাতের বীজের শাঁস ব্যবহার হয়।

(ঙ) **কুসুম ফুলের বীজ মিলিং :** এর তেল নিষ্কাশন করা খুবই কঠিন। সরিষা বা অন্যান্য তেলের মতো দেশি ঘানিতে এর তেল নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় না। ভালো এক্সপেলার দিয়ে ২৮% এর বেশি উৎপদান সম্ভব নয়। কুসুম ফুলের বীজের খোসা মোটা হওয়ায় এক্সপেলার দিয়ে তেল ভাঙানো সহজ হয়।

অনুশীলনী-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. খাদ্যে তেলের আসল কাজ কী?

২. আমাদের দেশের তেল সমৃদ্ধ ফসল গুলো কী কী?

৩. আমাদের দৈনিক কতটুকু তেল খাওয়া প্রয়োজন?

৪. উদ্বায়ী তেল কাকে বলে?

৫. অনুদ্বায়ী তেল কাকে বলে?

৬. খাঁটি তেল দ্বারা রান্নার ফলে কী উপকার হয়?

৭. উদ্ভিজ্জ তেলের মধ্যে কোনগুলো দামী ও উন্নতমানের তেল?

৮. আমরা কেন দেশীয় সরিষার তেল বাদ দিয়ে সয়াবিন ব্যবহার করি?

৯. খাঁটি তেল চেনার উপায় কী?

১০. বারি সরিষা-১৬ এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

১১. বারি চীনাবাদাম-৮ এর ফলন কত?

১২. উদ্ভিজ্জ তেলের গুণাগুণ কিসের উপর নির্ভর করে?

১৩. উদ্ভিজ্জ তেলের অভাবে শরীরে কী প্রভাব পড়ে?

১৪. ১ গ্রাম তেল থেকে কত ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়?

১৫. সরিষার বীজে কতটুকু আমিষ ও তেল আছে?

১৬. সরিষার তেলে যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তার নাম কী?

১৭. তিল তেল শরীরের কোন কোন রোগ প্রতিরোধ করে?

১৮. গর্জন তিলে মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয় লিনোলিক এসিডের পরিমাণ কত?

১৯. চীনাবাদামে কী কী উপকারী ফ্যাটি এসিড থাকে?

২০. দেশে রান্নার তেল হিসেবে চীনাবাদামের ব্যবহার নাই কেন?

২১. সূর্যমুখী বীজে তেলের পরিমাণ কত?

২২. সূর্যমুখী তেলে লিনোলিক ও অলিক এসিডের পরিমাণ কত?

২৩. সূর্যমুখী তেল কী কী উপকার করে?

২৪. কোন ভোজ্যতেলে সর্বাধিক আমিষ থাকে?

২৫. সয়াবিন তেল কেন বহুমূত্র ও হৃদরোগীদের জন্য উপকারী?

২৬. সয়াবিন তেলে কী লবণ ব্যবহার করা উচিত?

২৭. কোন কোন দেশে নারিকেল তেল ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার হয়?

২৮. কীভাবে সংরক্ষণ করলে চীনাবাদাম বীজ ২ বছর পর্যন্ত রাখা যাবে?

২৯. ভালোভাবে সংরক্ষণ করলে তিসির বীজ কতদিন থাকে?

৩০. তেলবীজ মিলিং-এর ৪টি পদ্ধতি কী কী?

৩১. ঘানিতে সর্বাধিক কত ভাগ তেল নিষ্কাশন করা যায়?

৩২. এক্সপেলার কী?

৩৩. মেশিনে তেল ছাকার যন্ত্রকে কী বলে?

৩৪. তেল রিফাইনিং বা নিরপেক্ষ করার কাজে কী ব্যবহার হয়?

৩৫. ঘানি, এক্সপেলার ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে সরিষার তেল নিষ্কাশনের হার কত?

৩৬. খোসাসহ তিল মিলিং এ কী ঘটে?

৩৭. চীনা বাদামের তেল থেকে কী কী তৈরি করা যায়?

৩৮. সূর্যমুখী বীজের দেশীয় পদ্ধতি, ঘানি ও এক্সপেলারে তেল নিষ্কাশনের হার কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. খাদ্যে তেল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?
২. উদ্বায়ী, অনুদ্বায়ী ও ভোজ্যতেল বলতে কী বুঝায়?
৩. খাটি তেলের বৈশিষ্ট্য ও শনাক্তকরণের উপায় কী?
৪. ২টি করে সরিষা, চীনাবাদাম ও সয়াবিনের উন্নত জাতের নাম লিখ?
৫. সরিষার তেলের পুষ্টিমান বর্ণনা কর।
৬. তিল ও তিসির তেলের পুষ্টিমান লিখ।
৭. গর্জন তিলের তেল উন্নত মানের, কারন কী?
৮. সূর্যমুখী তেলের পুষ্টিমান ও উপকারিতা লেখ।
৯. চীনাবাদাম তেলের গুণাগুণ উল্লেখ কর।
১০. রাইস ব্রান অয়েলের গুণাগুণ বর্ণনা কর।
১১. চীনাবাদাম বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১২. ঘানি দিয়ে কীভাবে তেল নিষ্কাশন করে?
১৩. এক্সপেলারে তেল নিষ্কাশন লাভজনক, কারন কী?
১৪. সলভেন্ট এক্সট্রাকশন প্লান্টে তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১৫. তেল রিফাইনিং ও হাইড্রোজিনেশনের প্রবাহ চিত্র লেখ।
১৬. চীনাবাদম তেল মিলিং করে ময়দা পাওয়ার প্রবাহ চিত্র লেখ।
১৭. দেশীয় পদ্ধতিতে সূর্যমুখী তেল মিলিং বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. তেলের গুরুত্ব, শ্রেণিবিভাগ ও খাঁটি তেল শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া লেখ।
২. সরিষা, তিল ও গর্জন তিলের পুষ্টিমান উল্লেখ কর।
৩. চীনা বাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবিন তেলের পুষ্টি গুণাগুণ বর্ণনা কর।
৪. সরিষা, চীনাবাদাম সূর্যমুখী ও সয়াবিন তেল বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. ঘানি ও এক্সপেলারের মাধ্যমে তেল নিষ্কাশন বর্ণনা কর।
৬. রিফাইনারিও হাইড্রোজিনেশন ইউনিটের তেল নিষ্কাশন প্রক্রিয়া প্রবাহ চিত্রটি লেখ।
৭. সরিষা ও তিল তেলবীজ এর তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৮. চীনাবাদামের মিলিং প্রক্রিয়া ও এর প্রবাহচিত্র বর্ণনা কর।

২০২২

অধ্যায় ৭

তেলবীজ থেকে উৎপাদিত খাদ্য

ভূমিকা : সরিষা থেকে খাদ্য : ভারতীয় উপমহাদেশে সরিষা মিলিং করা তেল অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রধানত রান্নার কাজে সরিষার তেল ব্যবহার করা হয়। গ্লুকোসিনোলেট (Glucosinolate)-এর জন্য সরিষার তেল ঝাঁঝযুক্ত হয়। সরিষার তেলে আইসো থায়োসায়ানেট তৈরি হলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। ইরুসিক এসিড (Erucic Acid) মানবদেহের জন্য অপকারি। বর্তমানে 'ক্যানোলা' নামে ইরুসিক এসিডমুক্ত জাতের সরিষার তেল পাওয়া যাচ্ছে। ক্যানোলার তেল মার্জারিন, সালাদ ও রান্নার তেল হিসেবে বিদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সরিষার তেলে ভেজাল : ইদানীং ঘানিতে ভাঙা খাটি সরিষার তেল প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। এ সুযোগে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সরিষার তেল বোতলজাত করে ক্রেতাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। সাধারণত সরিষার তেলে যে সকল তেল ভেজাল দেয়া হয় তা নিম্নরূপ–

ক) রেপসিড তেল
খ) নিম্নমানের পাম তেল।
গ) শেয়ালকাটা বীজের তেল
ঘ) কম দামী তিসির তেল
ঙ) তুলা বীজের তেল ইত্যাদি

৭.১ সরিষা থেকে পাউডার ও কাসুন্দি :

ক) সরিষার পাউডার : সরিষার বীজ ভালো করে বাছাই করে রোদে শুকাতে হয়। তারপর তা কড়াইতে ভালোভাবে ভেজে নিতে হয়। শিল-পাটা বা গ্রাইন্ডিং মেশিনে সরিষার দানাগুলো ভেঙে নিতে হয়। এভাবে যে সরিষার গুঁড়া পাওয়া যাবে তা রান্নার কাজে, আচার ও স্যান্ডউইচ বানাতে ব্যবহার করা যায়। মাছ, মাংস ও শাকসবজি রান্নাতেও এই পাউডার ব্যবহার করা যায়।

খ) সরিষার কাসুন্দি : কাসুন্দি তৈরির প্রধান উপকরণ হচ্ছে রাই সরিষা। এটি একটি প্রাচীন দেশীয় খাবার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি হয় না বিধায় বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না। কাসুন্দি তৈরিতে সরিষা, হলুদ, মরিচ, আদা, জিরা, লবণ ও প্রিজারভেটিব এর প্রয়োজন হয়। প্রথমে সরিষা ধুয়ে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে তা শিলপাটায় বা গ্রাইন্ডিং মেশিন (Grinding Machine) এ গুঁড়া করে নিতে হয়। কড়াইতে পানি ফুটিয়ে তাতে সরিষার গুঁড়া, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া, আদা বাটা ও লবণ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। চুলা থেকে নামানোর পূর্বে প্রতি কেজিতে ২–৩ গ্রাম সাইট্রিক এসিড (Citric acid) মিশাতে হয়। সাইট্রিক এসিডের পরিবর্তে কয়েক টুকরা কাঁচা আম ব্যবহার করা যায়। এরপর কাসুন্দি মাটির পাতিলে ভরে পাতিলের মুখ বন্ধ করে ২-৩ দিন রেখে দিতে হয়। কাসুন্দি রাখার জন্য কাচের

চিত্র : এক বৈয়াম কাসুন্দি

বৈয়াম গরম পানিতে জাল দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। বোতলের উপরিভাগে ১/৮ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে বায়ুরোধী করে ছিপি আটকিয়ে রাখতে হয়। কাসুন্দি ভর্তি বোতল ৫-৭ দিন রোদে দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। কাসুন্দি খেতে যেমন ভালো তেমনি এর উপকারিতাও কম নয়। সর্দি, কাশির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মুখের রুচিও বাড়ায়। বর্তমানে অনেক খাবার প্রস্তুতকারী কোম্পানি বাণিজ্যিক ভাবে কাসুন্দি প্রস্তুত ও বাজারজাত করেছে। প্রায় সব ধরনের আচার তৈরিতে সরিষার তেল ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হয়।

৭.২ চীনাবাদাম থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য :

চীনা বাদাম থেকে খাদ্য : বিশ্বের অনেক দেশে চীনাবাদম খুবই জনপ্রিয় খাবার। একক বা অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে চীনাবাদাম মিশিয়ে আকর্ষণীয় খাবার তৈরি করা যায়। চীনাবাদাম থেকে সাধারণত যেসকল খাদ্য তৈরি করা যায় তা নিম্নে দেয়া হলো :

ক) চীনাবাদাম বালিতে ভাজা
খ) চীনাবাদাম তেলে ভাজা
গ) চানাচুর
ঘ) চীনাবাদামের বিস্কুট
ঙ) চীনাবাদামের মুড়কি বা চিক্কি
চ) চীনাবাদামের ময়দা
ছ) চীনাবাদামের দুধ
জ) চীনাবাদামের দুধের দৈ
ঝ) চীনাবাদামের মাখন
ঞ) চীনাবাদামের বার
ট) চীনাবাদাম থেকে শিশু খাদ্য।

ক) চীনাবাদাম ভাজা : সাধারণত চুলার উপরে কড়াইতে গরম বালুর মধ্যে, খোসাসহ বাদাম দিয়ে ভাজতে হয়। ভাজার সময় বাদামগুলো যখন বাদামি বা পোড়া বর্ণ ধারণ করে তখন ছাঁকনি হাতার সাহায্যে তুলে নিতে হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি হাটবাজার, শহর-বন্দর, রেলস্টেশন, পার্ক প্রভৃতি স্থানে চীনাবাদাম বিক্রির দৃশ্য অতি পরিচিত। হাতে বাদাম নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে দানা সামান্য ঘষে ফুঁ দিয়ে আমরা চীনাবাদাম খেয়ে থাকি। আমাদের দেশে উৎপাদিত কাঁচা চীনাবাদামের বেশির ভাগই ভেজে খাওয়া হয়। সামান্য পরিমাণে বিস্কুট কারখানার ব্যবহার করা হয়।

খ) চীনাবাদাম তেলে ভাজা : চীনাবাদামের খোসা ছাড়িয়ে পুষ্ট ও পরিপক্ব কাঁচা দানা সংগ্রহ করতে হয়। বাজারে খোসা ছাড়ানো কাঁচা বাদামের দানা পাওয়া যায়। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে বাদামগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হয়। ঝাঁঝরি চামচ দিয়ে তেল থেকে বাদামগুলো তুলে তেল ঝরিয়ে নিতে হয়। অতঃপর তা বড় গামলায় রেখে বাদামের সাথে, মরিচ, জিরা, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ ও সাইট্রিক এসিড ভালো করে মিশাতে হয়। তারপর তা পলিব্যাগে ভরে মুখ আটকিয়ে বাজারজাত করা হয়।

ঘ) চীনাবাদাম মুড়কি বা চিক্কি : চিনি বা গুড় পাতিলে গুলিয়ে দ্রবণ তৈরি করে ছেকে নেওয়া হয়। তারপর জ্বাল দিয়ে সিরাপ তৈরি করা হয়। সিরাপ ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে কড়াইয়ে ঢালা হয়। অন্য চুলায় চীনাবাদামের শাঁস তেলে ভালো করে ভেজে নিয়ে গরম কড়াইতে ঢেলে দেওয়া হয়। চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে মুড়কি তৈরি করা হয়।

ঙ) চীনাবাদামের থেকে শিশু খাদ্য : চীনাবাদামের ময়দা, ভুট্টার ময়দা, সমপরিমাণ সয়াবিন ময়দা, গুঁড়া চিনি ও গুঁড়া দুধ ভালোভাবে মিশিয়ে টিনের কৌটায় বা পলিথিন প্যাকেটে বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। শিশুকে খাওয়ানোর সময় পরিমাণমতো গরম পানি ও উক্ত খাদ্যের মিশ্রণ মিশিয়ে নিতে হয়। সসপ্যানে উক্ত খাদ্যের মিশ্রণ নিয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিতে হয়। চুলা থেকে নামিয়ে হালকা গরম অবস্থায় শিশুকে খাওয়ানো হয়। এটা শিশুর সুষম খাদ্য। ভালোভাবে সংরক্ষণ করলে ৬ মাস পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

ঝ) চীনাবাদামের বাটার : ১ কেজি চীনাবাদাম, ১০০ গ্রাম চিনি ও ৫০ গ্রাম সয়াবিন তেল নেওয়া হয়। শিলপাটা খুব ভালো করে ফুটানো পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ভাজা চীনাবাদামের খোসা ফেলে শাঁসগুলোর পাতলা লাল আবরণ ফেলে দিতে হয়। বাদাম পাটায় অল্প অল্প চিনি দিয়ে বাটা হয়। বাটা বাদাম সয়াবিন তেল দিয়ে ফেটানো হয়। উচ্চ মাত্রায় ঘূর্ণনের ফলে তেল মিশে গেলে বাদামের প্রোটিন ও মাখন আলাদা হয়ে যায়। জীবাণুমুক্ত বোতলে মাখন ভরে বায়ুরোধী করে রাখতে হয়। এ মাখন বেশিদিন রাখা যায় না।

তেল মাখন বিস্কুট

চিত্র : চীনাবাদামের খাদ্য

৭.৩ তিল থেকে বিভিন্ন খাদ্য :

তিল বীজ থেকে খাদ্য : আমাদের দেশে তিল তেল অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রামাঞ্চলে রান্নার কাজে তিল তেল ব্যবহার করা হয়। বিস্কুট কারখানায় পাউরুটি, রোল, বন, কেক, কুকি ও ক্যান্ডিতে খোসা ছাড়ানো সাদা তিল বীজ ব্যবহার হয়। অন্যান্য তেলের চেয়ে তিল তেলে ভাজা খাদ্য যেমন– পটেটো চিপস দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। মাছ, মাংস, মুরগির মাংস, সবজি প্রভৃতি খাদ্য সুগন্ধময় করার জন্য তিল তেল ব্যবহার করা হয়। অলিভ অয়েলের বিকল্প হিসেবে তিল তেল ব্যবহার করা যায়। জাপানি ও কোরিয়ানদের নিকট তিল অতি পছন্দীয় খাবার।

তিলের নাড়ু : তিল উত্তমরূপে ঝেড়ে ও বেছে নেওয়া হয়। কড়াইতে তেল দিয়ে তিলগুলো ভেজে নেওয়া হয়। চুলায় কড়াইতে পানি নিয়ে গুড় বা চিনি দিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। চিনির পানি ঘন হয়ে এলে অর্থাৎ সিরা হয়ে আসলে ভাজা তিলগুলো ছেড়ে দিয়ে উত্তমরূপে নেড়েচেড়ে নামাতে হয়। গরম থাকা অবস্থায় তিলের নাড়ু পাকিয়ে ঠাণ্ডা করে কোটায় সাজিয়ে রাখতে হয়। এ তিলের সাথে চালের গুঁড়া মিশিয়ে একটু শক্ত নাড়ু করা যায়।

তিলের খাজা : এটি তৈরি করতে ঘি, চিনি ও ময়দা প্রত্যেকটি ১ কেজি করে লাগবে। ১ কেজি ময়দার ২৫০ গ্রাম ঘি ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে উত্তমরূপে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। অতঃপর 2"-3" লেচি কেটে তা বেটে 6"-7" লম্বা করতে হবে। এই লেচিতে ঘি এর প্রলেপ দিয়ে দু'ভাজ করতে হবে। এরপর একটি ঠুঙ্গি মতো করতে হয়। উক্ত ঠুঙ্গি গোল পিঁড়ির উপর চতুর্দিকে সাজিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর হাত দিয়ে ঠুঙ্গি গোল চ্যাপ্টা করতে হবে। এভাবে কয়েকবার কুন্ডলী পাকাতে হবে এবং চ্যাপ্টা করে ঘি মাখাতে হবে। শেষে লেচি বা রুটি বানিয়ে তা ঘিতে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তা অন্য পাত্রে ঘি ঝরবার জন্য রাখতে হবে। এরপর ভাজা খাজাকে চিনির সিরায় ডুবিয়ে তারপর সাদা তিল খাজার সম্পূর্ণ শরীরে লাগিয়ে সাজিয়ে রেখে দিতে হবে।

তিলের টিক্কি : প্রথমে তিলকে ভালো করে ভেজে নিতে হয়। চুলায় কম আঁচে চিনি ও পানি গরম করা হয়। মিশ্রণ নাড়তে নাড়তে যখন ঘন হয়ে আসে তখন পরিমানমতো তিল দিয়ে দিতে হয়। নরম থাকা অবস্থায় সামান্য লেবুর রস দিয়ে ঘি মাখানো ট্রে-এর উপর ঢেলে পুরু করে রুটির মতো বেলে নিতে হয়। তারপর গরম থাকা অবস্থায় ছুরি দিয়ে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করা যায়।

মার্জারিন (Margarine) : একে উদ্ভিজ্জ তেলের মাখন বলে। আজকাল বিদেশে রান্নার কাজে মার্জারিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম তাপে স্থায়ী এমন উদ্ভিজ্জ তেলগুলোর ঘনত্ব বাড়িয়ে এবং সেই সঙ্গে ৩% লবণ মিশ্রণের মাধ্যমে মার্জারিন তৈরি করা হয়। তিল, নারিকেল, পাম, সূর্যমুখী, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেল থেকে মার্জারিন তৈরি করা হয়। হৃদরোগীদের বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ব্যক্তিদের প্রাণিজ চর্বি ব্যবহার না করে মার্জারিনের ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।

চিত্র : তিলের নাড়ু ও খাজা

অনুশীলনী-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. কোন এসিডের কারণে সরিষার তেল ঝাঁঝযুক্ত হয়?

২. সরিষার তেলে কখন দুর্গন্ধ হয়?

৩. সরিষার তেলে অবস্থিত মানবদেহের জন্য অপকারী পদার্থটি কী?

৪. ক্যানোলা কী?

৫. ক্যানোলা কী কী কাজে ব্যবহার হয়?

৬. সরিষার তেলে কী কী ভেজাল তেল থাকে?

৭. সরিষার পাউডার কী কাজে লাগে?

৮. কাসুন্দি তৈরি করার প্রধান উপকরণ কী?

৯. কাসুন্দি তৈরিতে কী উপকরণ লাগে?

১০. চুলা থেকে নামানোর পূর্বে কাসুন্দিতে কী দিতে হয়?

১১. কাসুন্দি তৈরিতে কাঁচা আম কখন ও কোথায় দিতে হয়?

১২. কাসুন্দি তৈরির পর কত দিন রোদে দিতে হয়?

১৩. চীনা বাদামের শিশু খাদ্য তৈরির উপরকণগুলো কী কী?

১৪. তিল কোথায় ব্যবহার হয়?

১৫. কোনো তেলের বিকল্প হিসেবে তিল তেল ব্যবহার হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সরিষার তেলের উপকারিতা ও অপকারিতা লেখ।

২. খাঁটি সরিষার তেলে কীভাবে ভেজাল দেয়া হয়?

৩. সরিষার পাউডার তৈরি পদ্ধতি লিখ।

৪. চীনাবাদাম থেকে কী কী খাদ্য তৈরি হয়?

৫. চীনাবাদাম বালুতে ভাজা ও তেলে ভাজা পদ্ধতি লিখ।

৬. চীনা বাদামের বাটার কীভাবে তৈরি করে?

৭. তিলের চিক্কি কীভাবে তৈরি করে লিখ।

৮. মার্জারিন কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সরিষার তেলের উপকারিতা, ভেজাল ও বিভিন্ন খাদ্য তৈরি বর্ণনা কর।

২. চীনাবাদামের কীকী খাদ্য হয় এবং যেকোনো ৫টি খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩. মার্জারিন কী? তিল থেকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অধ্যায় ৮

সয়াবিনের পুষ্টি ও বিভিন্ন সয়া খাদ্য

ভূমিকা : সয়াবিন বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি তৈলবীজ ফসল। এটি লিগুমিনেসি গোত্রের প্যাপিলিয়নেসি উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত ফসল। এর বীজ থেকে উৎকৃষ্ট মানের ভোজ্যতেল ও প্রোটিন পাওয়া যায়। সয়াবিনের খৈল প্রোটিন সমৃদ্ধ। গবাদি পশু, মাছ এবং পোল্ট্রি ফিড হিসেবে সয়াবিন বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

সয়াবিন বীজে ৪২-৪৫% প্রোটিন এবং ২০-২২% তেলে থাকে। এই তেলে শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড যেমন- অলিক এসিড ও লিনোলিক এসিড উচ্চ মাত্রায় থাকে। ক্ষতিকর লিনোলেনিক এসিড থাকে মাত্র ৯%। সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ অন্যান্য ডালের তুলনায় দ্বিগুণ, গমের চেয়ে চারগুন ও দুধের চেয়ে বারোগুন বেশি। সয়াবিনের তেল নিষ্কাশনের পর খৈল (Oil Cake) গুঁড়া করে ময়দা পাওয়া যায় এতে ৫৫-৬০% আমিষ থাকে। এই আমিষ দিয়ে উন্নত বিশ্ব বিভিন্ন খাদ্য তৈরি করে প্রানিজ আমিষ পরিহার করতে চেষ্টা করছে। ভারতে সয়াবিন থেকে নিউট্রিনাগেট ও নিউট্রেলা (প্রোটিন স্ন্যাক্স) জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে। চীনা জনগণের কাছে সয়াবিনের দুধ, পনির, অঙ্কুরিত বীজ, ময়দা, কাচা সয়াবিন বহুল প্রচলিত। জাপানিদের নিকট সয়াসস, টফু (দই) অধিক পছন্দীয়। ইন্দোনেশিয়দের নিকট সয়াবিনের ফার্মেন্টেড কেক অতি লোভনীয়। তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডে কোমল পানীয় মতো সয়াদুধ অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা ও অপুষ্টির হাত হতে রক্ষার জন্য এদেশে সয়াবিনের আবাদ বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। এদেশের আবহাওয়া ও মাটি সয়াবিন চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বহু খাদ্য ও পুষ্টিগুণের অধিকারী সয়াবিনকে আগামী দিনের বিস্ময়কর খাবার (Wonder Food) বলা হয়ে থাকে।

চিত্রঃ সয়াবিনের শুটি ও সয়াবিন গাছ।

৮.১ সয়া খাদ্যের পরিচিতি ও শ্রেণিবিন্যাস :

সয়া খাদ্য : সয়াবিনে আমিষ ও তেল অন্যান্য ডাল জাতীয় শস্য থেকে প্রচুর পরিমাণে বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু কম পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায় বিধায় এটি বহুমূত্র ও হৃদরোগীরা বেশি খেতে পারে। অন্যান্য ডালের চেয়ে সয়াবিনে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ক্যারোটিন ও আয়রন অত্যন্ত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য ডালের সাথে সয়াবিন মিশিয়ে রান্না করলে যে কোনো একক ডালের চেয়ে এর পুষ্টিমান বেড়ে যায়। সয়াবিনের পুষ্টিবিরোধী পদার্থ দূরীকরণের জন্য সয়াবিন অধিক সময় ধরে নিয়মানুযায়ী রান্না করতে হয়। সয়াবিন মেশিনে ভেঙে সহজেই খাদ্যে ব্যবহার করা যায়। সয়াবিন রান্না করার সময় আয়োডাইজড লবণ ব্যবহার করা উচিত। সয়াবিন থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যগুলো নিম্নরূপ :-

সয়াবিনের খাদ্য :

(১) সয়া ময়দা
(২) সয়া ছাতু
(৩) সয়া ময়দা ও আটা মিশ্রিত চাপাতি
(৪) সয়া ডাল
(৫) সয়াবিনের মিশ্রডাল
(৬) সয়াবিনের সবজি বা তরকারি
(৭) সয়া খিচুড়ি
(৮) সয়া তেহারি

সয়াবিনের নাস্তা এবং মিষ্টান্ন :

(১) সয়া ময়দার নাড়ু
(২) সয়া বাদাম বরফি
(৩) জিলাপি
(৪) সয়া বুন্দিয়া
(৫) সয়াবিন বাদামের বিস্কুট
(৬) সয়াবিনের সমুচা
(৭) সয়াবিনের বড়া ও পেঁয়াজু
(৮) সয়া মিশ্র ডালের চাপড়ি।

সয়াবিন খাদের শ্রেণিবিন্যাস : পূর্বেই বলা হয়েছে সয়াবিন একটি উঁচুমানের প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার। সয়াবিন দিয়ে নানা রকম পুষ্টিকর খাবার ঘরে ও শিল্প পর্যায়ে তৈরি করা যায়। এই সব পদ্ধতির মধ্যে ৫০টির বেশি খাবার তৈরি করা যায়। নিম্নে সয়াবিন থেকে তৈরি খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো। সাধারণত সয়া খাদ্যকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

২০২২

(১) গাজন ছাড়া সয়া খাদ্য (Non fermented)

(২) গাজন প্রক্রিয়াজাত সয়া খাদ্য (fermented)

(৩) সয়া আমিষযুক্ত খাদ্য ও

(৪) সয়া তেলজাত খাদ্য

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার খাদ্যের উদাহরণ দেওয়া হলো

গাজন ছাড়া সয়া খাদ্য :

(১) কাঁচা সয়াবিন

(২) সয়াদুধ

(৩) অঙ্কুরিত সয়াবিন

(৪) সয়া নাট

চিত্র: টফু বা সয়া দৈ

গাজন প্রক্রিয়াজাত সয়া খাদ্য

(১) সয়া সস

(২) মিসো

(৩) টেমপেহ

(৪) টফু বা সয়া দৈ

(৫) সয়া নাগেটস

(৬) নাট্টো

চিত্র: মিসো

সয়া আমিষযুক্ত আধুনিক খাদ্য

(১) সয়া ময়দা, ফ্লেকস

(২) সয়া আমিষ কনসেন্ট্রেট

(৩) টেক্সচারড সয়া আমিষ খাদ্য

চিত্র : টেমপেহ

সয়া তেলজাত খাদ্য

(১) সয়া সালাদ তেল এবং রান্নার তেল

(২) সয়া তেলের মার্জারিন

(৩) সয়া তেলের সর্টেনিং

(৪) সয়া লেচিথিন ইত্যাদি

সাশ্রয়ী মূল্যে সয়া খাবার সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, গমের ময়দার সাথে সয়া-ময়দা মিশিয়ে তৈরি খাবারের স্বাদ গমের ময়াদার মতোই অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু খাবারে পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বেসন হিসেবেও সয়া-ময়দা ব্যবহার করা যেতে পারে। ময়দার বিকল্প হিসেবে নির্দিষ্ট অনুপাতে ব্যবহার করে পুষ্টিকর পাউরুটি, বিভিন্ন প্রকার বিস্কুক, বনরুটি, কেক তৈরি করা হয়। সারনিতে বিভিন্ন সয়া খাদ্যের গঠন পুষ্টি উপাদান দেখানো হলো।

সারণি : সয়াবিন থেকে প্রস্তুতকৃত সয়া খাদ্যের গঠন উপাদান (গ্রাম/১০০ গ্রাম) :

ক্রঃ নং	সয়াফুডের নাম	পানি	কিলোক্যালরি	আমিষ	চর্বি	শর্করা	আঁশ
১.	মিজো	৪১.৫	২০৬	১১.৮	৬.১	২৮.০	২.৫
২.	সয়াবিন (ননিহীন)	৭.৩	৩২৯	৪৭.০	১.২	৩৮.৪	৪.৩
৩.	সয়াময়দা (পূর্ণ ননিযুক্ত)	৫.২	৪৩৬	৩৪.৫	২০.৬	৩৫.২	৪.৭
৪.	সয়াময়দা (পূর্ণ ননিযুক্ত ভাঙ্গা)	৩.৮	৪৪১	৩৪.৮	২১.৯	৩৩.৭	২.২
৫.	সয়াময়দা (অর্ধননিযুক্ত)	২.৭	৩২৬	৪৬.৫	৬.৭	৩৮.০	৪.২
৬.	সয়া মিল (ননিহীন)	৬.৯	৩৩৯	৪৫.০	২.৪	৪০.১	৫.৮
৭.	সয়াপ্রোটিন (ঘন)	৫.৮	৩৩২	৫৮.১	০.৫	৩১.২	৩.৮
৮.	সয়া সস	৭৫.৭	৪১	২.৪	০.১	৭.৭	-
৯.	সয়া বিনস (সিদ্ধ)	৬২.৬	১৭৩	১৬.৬	৯.০	৯.৯	২.০
১০.	সয়া বিনস (শুকনা ভাজা)	০.৮	৪৫০	৩৯.৬	২১.৬	৩২.৭	৫.৪
১১.	সয়াবিন	৮.৫	৪১৬	৩৬.৫	১৯.৯	৩০.২	৫.০
১২.	সয়া দুধ	৯৩.৩	৩৩	২.৮	১.৯	১.৮	১.১
১৩.	টেমপেহ	৫৫.০	১৯৯	১৯.০	৭.৭	১৭	৩.০
১৪.	টফু (দই)	৬৯.৮	১৪৫	১৫.৮	৮.৭	৪.৩	০.২

উৎস : বাংলাদেশে তেলজাতীয় ফসলের চাষাবাদ-মানিক লাল দাস-২০০৭ ইং

সারণি : সয়াবিন থেকে প্রস্তুতকৃত সয়াখাদ্যের ভিটামিন ও খনিজ উপাদান (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)

ক্রঃ নং	সয়াফুডের নাম	ক্যালসিয়াম	আয়রন	জিংক	থায়ামিন	রিবোফ্লাবিন	নায়াসিন	ভিটামিন-বি৬
১.	মিজো	৬৬	২.৭৪	৩.৩২	০.১০	০.২৫	০.৮৫	০.২২
২.	সয়াবিন (ননিহীন)	২৪১	৯.২৪	২.৪৬	০.৭০	০.২৫	০.৬১	০.৫৭
৩.	সয়াময়দা (পূর্ণ ননিযুক্ত)	২০৬	৬.৩৭	৩.৯২	০.৫৮	১.১৬	৪.৩২	০.৪৬
৪.	সয়াময়দা (পূর্ণ ননিযুক্ত ভাঙ্গা)	১৮৮	৫.৮২	৩.৫৮	০.৪১	০.৯৪	৩.২৯	০.৩৫
৫.	সয়াময়দ (অর্ধননিযুক্ত)	১৮৮	৫.৯৯	১.১৮	০.৩৮	০.২৯	২.১৬	০.৫২
৬.	সয়া মিল (ননিহীন)	২৪৪	১৩.৭	৫.০৬	০.৬৯	০.২৫	২.৫৯	০.৫৭
৭.	সয়াপ্রোটিন (ঘন)	৩৬৩	১০.৭	৪.৪০	০.৩২	০.১৪	০.৭২	০.১৩
৮.	সয়া সস	৫	১.৪৯	০.৩১	০.০৪	০.১১	২.৮৩	০.১৪
৯.	সয়া বিনস (সিদ্ধ)	১০২	৫.১৪	১.১৫	০.১৬	০.২৯	০.৪০	০.২৩
১০.	সয়া বিনস (শুকনা ভাজা)	২৭০	৩.৯৫	৪.৭৭	০.৪৩	০.৭৬	১.০৬	০.২৩
১১.	সয়াবিন	২৭৭	১৫.৭০	৪.৮৯	০.৮৭	০.৮৭	১.৬২	০.৩৮
১২.	সয়া দুধ	৪	০.৫৮	০.২৩	০.১৬	০.০৭	০.১৫	০.০৪
১৩.	টেমপেহ	৯৩	২.২৬	১.৮১	০.১৩	০.১১	৪.৬৩	০.৩০
১৪	টফু (দই)	২০৫	১০.৪৭	১.৫৭	০.১৬	০.১০	০.৩৮	০.০৯

উৎস : বাংলাদেশে তেল জাতীয় ফসলের চাষাবাদ-মানিক লাল দাস-২০০৭ ইং

৮.২ সয়াবিনের পুষ্টিমান :

সয়াবিনের পুষ্টিমান : ভোজ্যতেল ও প্রোটিনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাপী সয়াবিন চাষ করা হয়। সয়াবিনে আমিষ, তেল, শর্করা, সেলুলোজ, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন পাওয়া যায়। তবে এসব উপাদানের পরিমাণ, জাত ও আবহাওয়াভেদে কম বেশি থেকে পারে। সয়াবিন বীজে ৪২-৪৫% আমিষ এবং ২০-২২% তেল থাকে। সয়াবিন তেলে সুস্বাস্থ্যের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সয়াবিন তেল রক্তে কোলেস্টেরল জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে। সয়াবিনে ভিটামিন-এ এও রিবোফ্লাভিন, নায়াসিন, প্যানটোথেনিক এসিড, ক্যারোটিন পাওয়া যায়। সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসলের পুষ্টিগুণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো :-

সারণি : সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসলের পুষ্টিগুণ (প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ) :

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদাণ	ফসল				
		সয়াবিন	ছোলা	মুগডাল	মসুর	অড়হর
১.	ক্যালরি	৪৩২	৩৭২	৩৪৮	৩৪৩	৩৩৫
২.	প্রোটিন (গ্রাম)	৪৩.২	২০.৮	২৪.৫	২৫.১	২২.০
৩.	তেল বা চর্বি (গ্রাম)	১৯.৫	৫.৬	১.২	০.৭	১.৭
৪.	খনিজ পদার্থ (মি-গ্রাম)	৪.৬	২.৭	৩.৫	২.১	৩.৫
৫.	ক্যালসিয়াম (মি-গ্রাম)	২৪০	৫৬	৭৫	৬৯	৭৩
৬.	ফসফরাস (মি-গ্রাম)	৬৯০	৩৩১	৪০৫	২৯৩	৩০৪
৭.	আয়রন (মি-গ্রাম)	১১.৫	৯.১	৮.৫	৪.৮	৫.৮
৮.	ক্যারোটিন (মাইক্রো গ্রাম)	৪২৬	১২৯	৯৪	২৭০	১৩২
৯.	রাইবোফ্লাবিন (ঐ)	০.৩৯	০.১৮	০.২৭	০.২০	০.১৯
১০.	নায়াসিন (ঐ)	৩.২	২.৪	২.১	২.৬	২.৯

সয়াবিনের অপুষ্টিকর পদার্থ : সয়াবিন তেলে কিছু অপুষ্টিকর পদার্থ থাকে যেমন- ট্রিপসিন ইনহিবিটর, হেমাগ্লুটানিন ও অলিগো স্যাকারাইড। এতে আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না এবং পেট ফাঁপার মতো অস্বস্থিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়া সয়াবিনজাত খাদ্যে এক ধরনের ঘাস ঘাস গন্ধ থাকে যা বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশসহ অনেক দেশের লোকেরা পছন্দ করে না। এটি আমাদের দেশের সয়াবিনজাত খাদ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যা। সয়াবিনের 'লাইপো অক্সিজেন' নামক পদার্থের কারণে সয়াবিনের দুধের স্বাদ গন্ধযুক্ত এবং তিতা হয়।

অপুষ্টিকর পদার্থ দূরীকরণের উপায় :

(১) সয়াবিন রান্নার পূর্বে কমপক্ষে ২০ মিনিট গরম পানিতে ভালোভাবে ফুটিয়ে পরে পানি ফেলে দিতে হবে।

(২) ১০ মিনিট ধরে রোস্টিং (Roasting) করতে হবে।

(৩) সয়াবিনের খোসা ছাড়িয়ে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ($NaHCO_3$) এর সহযোগে সারারাত (১২ ঘণ্টা) পানিতে ভিজিয়ে রেখে পানি ফেলে দিতে হবে। তারপর গরম পানিতে ফুটালে এবং পরবর্তীতে ফুটানো পানি ফেলে দিলে সয়াবিনের অপুষ্টিকর পদার্থ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় কমানো যায়।

৮.৩ গ্রামীণ পর্যায় বা ঘরোয়া পদ্ধতিতে সয়া খাবার :

সমস্ত সয়া খাদ্যকে দুই ভাবে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) গ্রামীণ পর্যয়ের সয়া খাদ্য- পেঁয়াজু, শিঙাড়া, সয়ানাট, সয়া ঘুঘনি, সয়া চটপটি ইত্যাদি।

(খ) শিল্প পর্যায়ে সয়া খাদ্য - চানাচুর, সেমাই, বিস্কুট, শিশু খাদ্য, কেক ইত্যাদি।

গ্রামীন পর্যায়ের সয়া খাদ্য :

১. **সয়া বাটা তৈরি :** মুখ খোলা পাত্রে দুই লিটার পানি নিয়ে তাতে ০.৫% সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ও সয়াবিন নিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ হলে ঠাণ্ডা পানিতে ডলে সয়াবিনের খোসা ছাড়াতে হয়। খোসা পরিষ্কার করে ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে শিল পাটায় বেটে কাই বা মণ্ড তৈরি করলে সয়াবাটা তৈরি হয়।

২. **সয়া পিঁয়াজু :** সদ্য প্রস্তুত সয়া বাটার সাথে পিঁয়াজুর তৈরির সকল উপকরণ যেমন- গমের ময়দা বা চালের গুঁড়া, শুকনা মরিচ বা মরিচ বাটা, কাঁচা মরিচ কুচি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, আদা বাটা ভালো করে মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করতে হয়। চুলায় কড়াই দিয়ে তেল গরম করা হয়। তেল গরম হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য মণ্ড থেকে সামান্য কিছু নিয়ে তেলে ছেড়ে দিতে হয়। ছোট টুকরাটি যদি বুদবুদ আকারে ফুটতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তেল গরম হয়েছে। তেল গরম হলে বেশি পাতলা না করে অর্থাৎ সামন্য মোটা করে বড় বা মাঝারি সাইজের মণ্ড তেলে ছেড়ে দিতে হবে। অল্প আঁচে জ্বাল দেওয়ার পর পেঁয়াজু বাদামি রং ধারণ করলে তখন ছিদ্রযুক্ত চামচ দ্বারা নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

৩. **সয়া নাট :** এটি তৈরি করতে সয়া ডাল, তেল, মরিচ গুঁড়া ও বিট লবণের গুঁড়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমে একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে সয়া ডালকে ১৫-২০ মিনিট ভালোভাবে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। তারপর তেল গরম করে সয়াডালকে ১০-১৫ মিনিট ডুবোতেলে ভেজে তুলতে হয়। খবরের কাগজের উপর বিছিয়ে দিলে ডালের গায়ের অতিরিক্ত তেল শুষে যাবার পর মরিচ গুঁড়া, বিট লবণ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও গোলমরিচ বা এলাচ গুঁড়া মিশিয়ে প্যাকেট বন্ধ করা হয়। এ সয়াডালকে সয়ানাট বলে।

৪. **সয়া ময়দা :** ময়দা করার জন্য পরিমাণমতো সয়াবিন সংগ্রহ করে ততে নষ্ট ও বিবর্ণ দানাগুলো বেছে বাদ দিতে হবে। পরিষ্কার পানিতে ২-৩ বার ধুয়ে ৬-৮ ঘণ্টা ভিজাতে হবে। ভেজানো সয়াবিন একটি লোহার জালের উপর রেখে হাত দিয়ে ভালোভাবে ঘষে খোসা ছড়িয়ে নিতে হবে। শুধু হাত দিয়েও খোসা ছাড়ানো যেতে পারে। পানিতে দিলে খোসা ভেসে উঠবে এবং তা ফেলে দিতে হবে। খোসা ছাড়ানো সয়াবিন ১৫ মিনিট ধরে গরম পানিতে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটানো সয়াবিন পানি ঝরিয়ে একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ের স্তর বিছিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হভে। ভালোভাবে শুকানো পর তা আটা/ময়দার মিলে ভাঙিয়ে বা যাঁতায় পিষে সয়া ময়দা তৈরি করা হয়।

২০২২

৫. সয়া ভাত : সয়া ভাত রান্নার জন্য ১ ভাগ সয়া বাটা বা সয়া ময়দা ও ৯ ভাগ চালের প্রয়োজন হয়। চাল ভালো করে ধুয়ে হাঁড়িতে চাপাতে হয়। ভাত যখন অর্ধেক সিদ্ধ হয় আসবে তখন সয়া বাটা বা ময়দা দিয়ে ভালোভাবে ভাতের সাথে চামচ দিয়ে নেড়ে দিতে হয়। উত্তমরূপে ভাত সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতে হয়। ভাতের সাথে পানির পরিমাণ এমন থেকে হবে যাতে মাড় না ফেলেই ভাত ঝরঝরে অবস্থায় নামানো য়ায়। এই ভাতে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

৬. সয়া খিচুড়ি : পুষ্ট ও পরিপক্ক সয়াবিন ভালোভাবে ভেজে খোসা ছাড়িয়ে আধাভাঙা করে নিতে হয়। একটি পাত্রে ঘি বা ডালডা নিয়ে গরম করতে হয়। পেঁয়াজকুচি করে ভেজে নিতে হয়। তারপর হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, জিরা, আদাবাটা, তেজপাতা, এলাচি, মসলা দিয়ে ডালের সাথে ভালো করে নাড়তে হয়। এরপর পরিমাণমতো পানি ও চাল দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। খিচুড়ি সিদ্ধ হওয়ার পূর্বে ধনে পাতা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে পানি শুকিয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরবেশেন করতে হয়।

৭. সয়া চটপটি : বিকালের নাস্তা হিসোবে সয়াবিন চটপটি পরিবেশন অতি উত্তম থেকে পারে। এ জাতীয় খাবারের যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ বিদ্যমান আছে। চটপটির উপকরণ হিসেবে সয়াবিন ২৫০ গ্রাম, হলুদ পরিমাণমতো, আলু-মাঝারি সাইজের দুইটি, ডিম ৪টি, শুকনো মারিচের গুঁড়ো ভাজা-১৫ গ্রাম, জিরার গুঁড়ো-১০ গ্রাম, ভিনেগার-১০ মিলি, পেঁয়াজ কুচি ৬টি, মাঝারি সাইজের কাঁচা মরিচ কুচি ১০টি, লবণ প্রয়োজনমতো তেঁতুল বা লেবুর রস প্রয়োজনমতো, পানি পরিমাণমতো নিতে হয়। প্রথমে সয়াবিন কিছুক্ষণ পানিতে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর ঠাণ্ডা পানিতে সারারাত বা কমপক্ষে ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভিজানো পর পরিষ্কার পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। ধোয়া সয়াবিনের সাথে বাটা হলুদ পরিমাণমতো মিশিয়ে চুলায় ১ ঘন্টা সিদ্ধ করতে হয়। আলু ও ডিম সিদ্ধ করে খোসা ছাড়য়ে নিতে হয়। আলু ও ডিম পছন্দমতো আকারে টুকরা টুকরা করে কাটতে হয়। শুকনা মরিচ ও জিরা কড়াইতে দিয়ে অল্প জ্বালে ভেজে নিয়ে ঠাণ্ডা করে গুঁড়ো করতে হয়। অপর দিকে সিদ্ধ সয়াবিনের সাথে বাকি আলু, সিরকা বা ভিনেগার, লবণ ও অর্ধেক পরিমাণ শুকনো ভাজা মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আবার জ্বাল দিতে হয়। পানি এমনভাবে দিতে হবে যাতে এ মিশ্রণগুলো ডুবো ডুবো অবস্থায় থাকে। এ মিশ্রণ যখন ফুটতে আরম্ভ করবে তখন কাঁচা পেঁয়াজ ও কাটা কাঁচা মরিচ ছেড়ে দিতে হয়। কিছুক্ষণ ফুটার পর চুলা নিভিয়ে সয়াবিন চটপটি নামাতে হয়। চটপটি খাবার জন্য অন্য পাত্রে ঢেলে নিয়ে ডিম (স্লাইস করে কাটা) লেবুর রস এবং অবশিষ্ট জিরা ও মরিচের গুঁড়ো উপরে ছিটিয়ে দিয়ে প্রস্তুত করতে হয়।

৮. সয়া শিঙাড়া : গমের ময়দা দিয়ে শিঙাড়া তৈরি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে সকল উপকরণ অপরিবর্তিত রেখে সয়া ডাল ও গমের ময়দা ১২০ গ্রাম করে নিতে হবে। শিঙাড়া তৈরির প্রক্রিয়া একই রকম।

৯. সয়া জিলাপি : গমের ময়দা দিয়ে জিলাপি তৈরির প্রক্রিয়ার অনুরূপ এখানে শুধু সয়া ময়দা যোগ করতে হবে। ১ : ১ অনুপাতে সয়া ময়দা গমের ময়দা মিশিয়ে জিলাপি তৈরি করতে হবে।

২০২২

১০. সয়া রুটি বা পরোটা : এক ভাগ সয়া ময়দা ও চার ভাগ গমের ময়দা সহযোগে সয়া রুটি ও পরোটা তৈরি কারা যায় । একটি পাতিলে সয়া ময়দা ও গমের ময়দা মিশিয়ে পরিমাণমতো লবণ ও পানি মাখায়ে রুটি তৈরির খামির তৈরি করতে হয়। এ খামির থেকে সাধারণ রুটি তৈরির মতো বেলে রুটি তৈরি করতে হয়। পরোটা জন্য খামির থেকে ছোট বল নিয়ে তাতে চাপ দিয়ে ভিতরে ও বাইরে সমান্য ডালডা মাখিয়ে কয়েকবার ময়দা দিতে হয়। এরপর বেলে রুটি বানাতে হয়। তেল ব্যবহার করে মোটা শীটের মতো বানানো হলে সেটি পরোটা এবং তেল ছাড়া পাতলা করে বানানো হলে সেটি রুটি হয়। এরপর তা ভেজে নিতে হয়। একই ভাবে সয়ালুচি, সয়া শিঙারা, সয়া পুরি, সয়া নিমকি, সয়া সেমাই ইত্যাদি সয়াখাদ্য স্বাভাবিক নিয়মে তৈরি করা যায়।

৮.৪ শিল্পজাত সয়া খাদ্য :

সয়াবিন থেকে শিল্প পর্যায়ে খাবার তৈরি করতে হলে প্রথমে সয়াবিন ময়দা তৈরি করতে হয়। তারপর ময়দা দ্বারা সয়া চানাচুর, সয়া নাগেট, সয়া ছানা, সয়া দধি সয়া দুধ, মাংস ইত্যাদি বানানো যায়।

(১) সয়া ময়দা : ফুটন্ত পানিতে সয়াবিন ২০ মিনিট কাল সিদ্ধ করতে হয়। তবে পানি ফুটিয়ে জ্বাল দেওয়ার সময় ০.৫% সোডিয়াম বাই কার্বোনেট মিশিয়ে নিলে সয়াবিনে ক্ষতিকারক উপাদান অপসারিত হয়। সিদ্ধ সয়াবিন পরিষ্কার পানিতে ডলে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয় অতঃপর তা পাটিতে বা মাদুরে বিছিয়ে রোদে ভালোভাবে ২-৩ দিন শুকিয়ে নিতে হয়। সয়াবিন শুকিয়ে কটকটে থেকে হয়। দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কটকট শব্দ করবে এবং ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যাবে। এবার গম ভাঙানোর মেশিনে বেটে সয়া ময়দা তৈরি করা যায়। বায়ুরোধী অবস্থায় সয়াময়দা ৩ মাস সংরক্ষণ করা যায়। ৫°C তাপমাত্রায় ও ৫৯% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সয়া ময়দা পলিথিনে বায়ুরোধী করে রাখলে ভালো থাকে। শিল্প পণ্য তৈরিতে সময় সয়া ময়দার সাথে বিভিন্ন অনুপাতে গমের ময়দা মিশাতে হয়। কেননা সয়া ময়দায় গ্লুটেন না থাকায় গমের ময়দা (যা গ্লুটেনসমৃদ্ধ) বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য তৈরিতে সুবিধা হয়।

সয়া নাগেট

সয়া মাংস

সয়া দুধ

চিত্রঃ সয়াবিন থেকে নাগেট, মাংস, দুধ তৈরি ।

(২) সয়া চানাচুর : সয়া চানাচুরের জন্য সমপরিমাণ সয়া ময়দা, গমের ময়দা ও খেসারি বা ছোলার বেসন নিতে হবে। বেসন টাটকা হলে হাইড্রোজ লাগে না পুরানো বেসন হলে হাইড্রোজ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। 'সকল ময়দা, বেসন, সয়াবিন, তেল, লবণ, মশলার গুঁড়া ও পরিমাণমতো পানি দিয় মণ্ড বা খামির তৈরি করতে হয়। সামান্য রং গুলিয়ে মণ্ডের সাথে মিশিয়ে

দিতে হয়। এরপর খেসারি ডালের বেসন দিয়ে ঝুরি তৈরির মতো করে ঝুরি তৈরি করতে হয়। ঝুরির সাথে পরিমাণমতো বাদাম ভাজা, ডাল ভাজা, চিড়া ভাজা, মটর ডালভাজা প্রভৃতি মিশিয়ে ছোট ছোট প্যাকেট করে বিক্রির জন্য রাখা হয়। চানাচুরকে মুখরোচক করার জন জিরাভাজা গুঁড়ো বা অন্য কোনো মশলা মেশানো যেতে পারে।

(৩) **সয়া দুধ :** সাধারণত দুই পদ্ধতিতে সয়া দুধ তৈরি করা যায়া : যথা ক) সাধারণ পদ্ধতি ও খ) আইএমএফ পদ্ধতি।

(ক) সাধারণ পদ্ধতিতে সয়া দুধ : প্রথমে নিয়ামনুযায়ী সয়া ময়দা তৈরি করতে হবে। এছাড়া বেন্ডারে সয়াবিন মিহি করে গুড়া করা যায়। পানি মিশিয়ে শিলপাটার পেষা বা মেশিনে গুঁড়া করা সয়াবিন বেশ গাঢ় হয়। এ গাঢ় সয়াবিনকে লেই বলে। তারপর ৫:১ অনুপাতে ঈষদুষ্ণ পানি ও সয়াবিন মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিতে হয়। এরপর এ মিশ্রণ পাতলা পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে দুধ বের করে অন্য একটি পাত্রে নিতে হয়। ছাঁকার পর অবশিষ্ট সয়াবিনের কাই আলাদা করে অন্য খাবারে ব্যবহার করা যায়। প্রাপ্ত সয়া দুধে চিনি এবং মশলা মিশিয়ে মৃদু জ্বালে প্রায় ১৫-২০ মিনিট ফুটিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় খাওয়া যায়। এ দুধ সহজে হজমযোগ্য যা গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সয়া দুধের সাথে গরুর দুধ মিশিয়ে অথবা ভিটামিন বি$_{১}$, বা বি$_{১২}$ মিশিয়ে পুষ্টিমান বাড়ানো যায়। অনেক সময় সুগন্ধি মিশিয়ে রুচিসম্মত করা যায়।

(খ) আই, এম, এফ পদ্ধতিতে সয়া দুধ : পুষ্ট পরিপক্ব রোগমুক্ত বাছাই করা সয়াবিন ৯০°C তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট এয়ার ড্রায়ার (Air drier) মেশিনে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকানোর পর ডিহুলার (Dehuller) মেশিনে সয়াডাল ভাঙিয়ে এসপিরেটারের (Aspirator) সাহায্যে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়।

এ খোসা ছাড়ানো সয়া ডাল স্টিম জ্যাকেটেড কেটলিতে নিয়ে শতকরা ০.২৫ ভাগ বেকিং সোডা মিশিয়ে ফুটন্ত পানিতে ৫ মিনিট ফুটাতে হয়। ফুটানোর পর সম্পূর্ণ পানি ফেলে দিয়ে ৯৫°C তাপমাত্রায় গরম পানি দিয়ে ধুতে হয়। ধোয়া সয়াবিন পুনরায় ০.০৫ ভাগ বেকিং সোডা মিশানো ফুটন্ত পানিতে ৫ মিনিট ফুটিয়ে পানি ফেলে দ্বিতীয়বার ৯৫°C তাপমাত্রায় গরম পানিতে ধূতে হবে।

এখন ডিজইনটেগরেটর (Disintegrator) বা বিয়োজিত করা মেশিনের সাহায্যে গরম পানি সহযোগে স্লারি (Slurry) মণ্ড প্রস্তুত করতে হবে। রোলার সয়ামিল্ক এক্সট্রাক্টর (Roller Soya milk Extactor) সাহায্যে অর্থাৎ রোলারের চাপে দুধ নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। এ নিষ্কাশিত দুধ ৯৫°C তাপে ১৫-২০ মিনিট হালকাভাবে ফুটিয়ে নিতে হয়। অন্যদিকে দুধ নিষ্কাশনের পর ছাঁকনির উপর পড়ে থাকা অদ্রবণীয় পাউডার ও আঁশ জাতীয় পদার্থ অন্য খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

মৃদু জ্বালে হালকাভাবে ফুটানো দুধ এখন হোমজিনাইজার (Homoginizer) এর সাহায্যে প্রথম ধাপে ৩৫০০ পিএসআই এবং দ্বিতীয় ধাপে ৫০০ পি এস আই চাপে ৯৫°C তাপে হোমজিনাইজড সয়াবিনের দুধের সকল উপাদান ভেঙ্গে সংমিশ্রণ করে দুধের সান্দ্রতা সর্বত্র সমরূপ করা বা সমঘনত্ব করতে হয়। এরপর এয়ারকুলার (Air Cooler) বা ফ্যানের সাহায্যে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ১০°C তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করতে হয়ে। এ ঠাণ্ডা দুধ বাণিজ্যিক প্লাস্টিক বোতলে ৪°C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়।

আই এম এফ পদ্ধতিতে সয়াদুধ তৈরির প্রবাহ চিত্র–

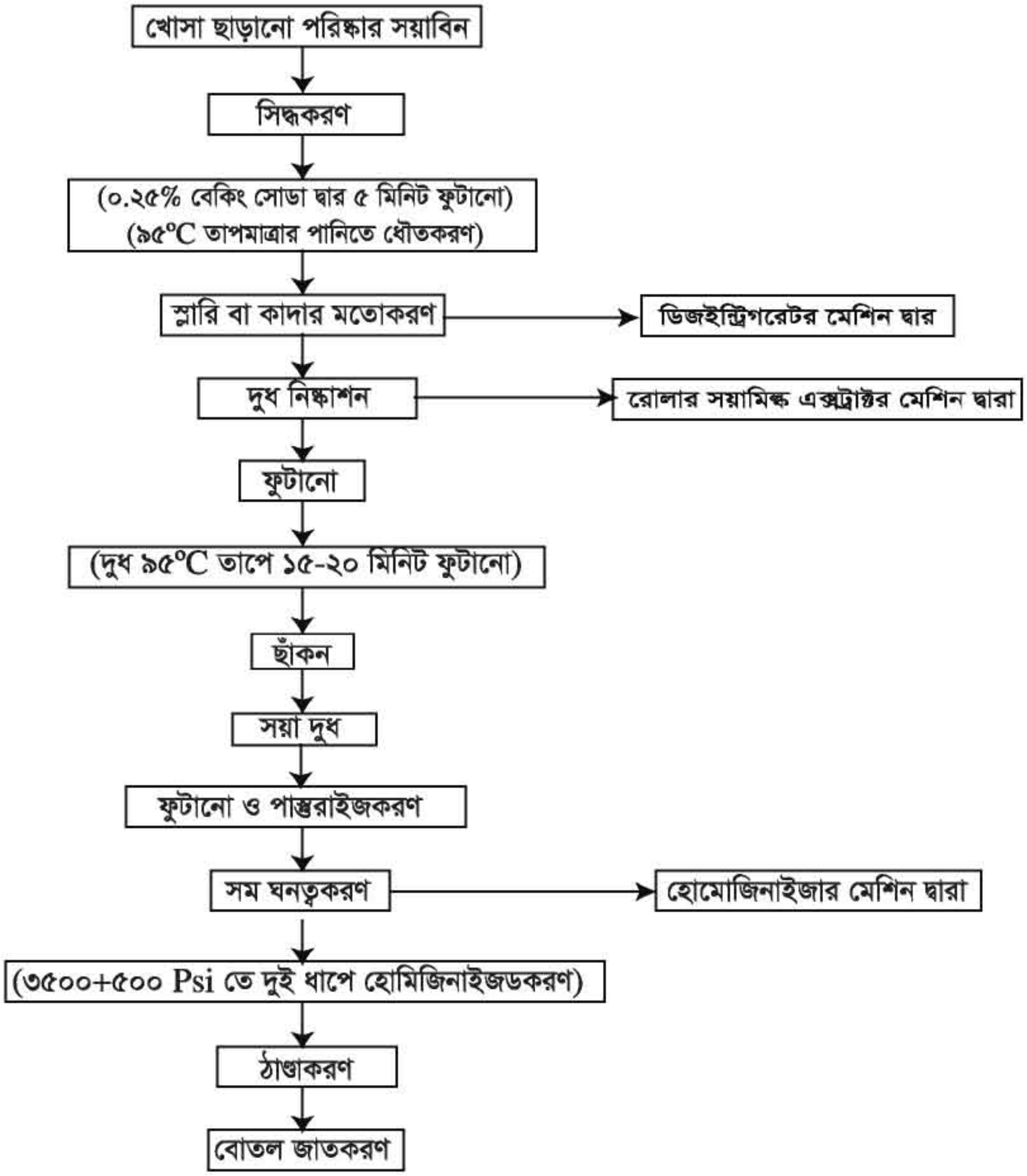

সয়াদুধ বোতলজাত করে কোমল পানীয়ের মতো বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করা হয়। ইদানীং এটি সিঙ্গাপুর, মালায়েশিয়া ও পার্শ্ববর্তী দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সয়াদুধের অবশিষ্টাংশের সাথে চালের গুঁড়া, গুড়, তেল, লবণ ও পানি দিয়ে পিঠা তৈরির নিয়মে সয়া মিষ্টি পিঠা তৈরি করা যায়। সয়াদুধের সাথে গাভি, মহিষ, ছাগির ও মাতৃদুগ্ধে বিদ্যমান পুষ্টিমানসমূহের তুলনা (প্রতি ১০০ মিলি লিটারে) নিম্নের ছকে দেখানো হলো-

ক্রমিক নং	পুষ্টি উপাদানসমূহ	সয়াবিন	গাভির দুধ	মহিষির দুধ	ছাগির দুধ	মাতৃদুগ্ধ
১.	আমিষ (গ্রাম)	৩.৫	৩.৪	৩.৮	৩.৩	১.২
২.	চর্বি (গ্রাম)	১.৫	৩.৭	৭.৫	৪.১	৩.৮
৩.	ক্যালরি (কিলোক্যারি	৩৫	৬৯	১০০	৭৬	৭১
৪.	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	২১	১২৫	২১০	১৩০	৩৩
৫.	ফসফরাস (মি. গ্রাম)	৪৮	৯৬	১৩০	১০৬	১৫
৬.	আয়রন (মি. গ্রাম)	০.৬৭	০.১০	০.২০	০.০৫	০.১৫
৭.	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	০.০৮	০.১০	০.০৫	০.০৫	০.০১৭
৮.	রিবোফ্লাবিন (মি. গ্রাম)	০.০৩	০.১৮	০.১০	০.১২	০.০৪
৯.	নিয়াসিন (মি. গ্রাম)	০.০২	০.০৮	০.২৮	০.১২	০.১৭
১০.	ভিটামিন এ (আই, ইউ)	১৮০	১৫৮	২০০	১২০	১৬০

উৎস: সয়াবিন থেকে তৈরি খাবার- বি.এ.আর.আই, ২০০৮ ইং

(৪) সয়ামাংস বা সয়া ছানা : দেড় লিটার সয়াদুধ জ্বাল দিয়ে ফুটন্ত দুধে পরিমাণমতো লেবুর রস বা সিরকা মিশিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে হয় এবং দুধ জমতে শুরু করলে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হয়। ২-৩ মিনিটের মধ্যে সবটুকু দুধ জমে যাবে। জমা দুধ পরিষ্কার পাতলা কাপড় দ্বারা ছেঁকে সবটুকু ছানা আলাদা করে নিতে হবে। কাপড় খুব জোরে চেপে যতটুকু সম্ভব পানি বের করে নিতে হবে। কাপড়টি ১৫-২০ মিনিট ঝুলিয়ে রাখার পর কাপড় থেকে ছানা বের করে নিতে হয়। উক্ত ছানা পছন্দ অনুযায়ী আকার দিয়ে ছোট ছেট টুকরা করে ভেজে মশলা মিশিয়ে তরকারিতে মাংসের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। টুকরোগুলো ঠাণ্ডা পানিতে রাখলে এবং প্রতিদিন পানি পাল্টালে ৫-৬ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

(৫) সয়া দধি : দেড় লিটার সয়াদুধের সাথে (১:৪) অনুপাতে গরুর দুধ বা গুঁড়া দুধ মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দেওয়ার সময় ৩০০ গ্রাম চিনি ও পছন্দমতো মশলা মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিতে হয়। দধি যে পাত্রে তৈরি করা হবে সে পাত্রটি প্রথমে ১ চা চামচ টক দধি দ্বারা মুছে কুসুম গরম দুধ ঢেলে নিয়ে ১০ মিনিট খোলা রাখতে হয়। পরে পাত্রের উপর পরিষ্কার সাদা কাগজ দ্বারা ঢেকে রাখলে ৬-৭ ঘণ্টা পর সম্পূর্ণ দধি প্রস্তুত হয়।

অনুশীলনী -৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সয়াবিন গাছ কোন পরিবারের অর্ন্তভুক্ত?

২। সয়াবিনের খৈল সারা বিশ্বে কী হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে?

৩। সয়াবিনের বীজে তেল ও আমিষের পরিমাণ কত?

৪। সয়াবিনে কোনো দুটি ফ্যাটি এসিড উচ্চ মাত্রায় থাকে? ২০২২

৫। সয়াবিনে আমিষ, ডাল, গম ও দুধ থেকে কত বেশি পরিমাণে থাকে?

৬। সয়াবিনের খৈল থেকে গৃহীত ময়দায় কত ভাগ আমিষ থাকে?

৭। ভারতে উৎপাদিত সয়াবিনের প্রোটিন স্ন্যাক্স জাতীয় খাদ্যের নাম কী?

৮। চীনা জনগণ সয়াবিনের কোনো খাদ্য বেশি পছন্দ করে?

৯। জাপানী ও ইন্দোনেশিয়দের নিকট সয়াবিনের কোনো খাদ্য বেশি পছন্দনীয়?

১০। সয়াদুধ কোন কোন দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়?

১১। গাজন প্রক্রিয়াজাত সয়া খাদ্যগুলো কী কী?

১২। গাজন ছাড়া সয়া খাদ্যগুলো কী কী?

১৩। গমের ময়দার সাথে সয়াময়দা মিশালে খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটে?

১৪। সয়াবিনে কী কী অপুষ্টিকর পদার্থ থাকে?

১৫। সয়াবিনজাত খাদ্যের বাজারজাতকরণের অসুবিধা কী?

১৬। কী কারণে সয়াবিনের দুধ তিতা ও গন্ধযুক্ত হয়?

১৭। সয়া নাট বলতে কী বুঝায়?

১৮। টফু বলতে কী বুঝায়?

১৯। সয়া ভাত রান্নায় চাল ও সয়া ময়দার অনুপাত কতটুকু?

২০। শুধুমাত্র সয়া ময়দা দিয়ে কেন রুটি বানানো যায় না?

২১। সয়া ময়দা কতদিন বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়?

২২। চানাচুরের বেসন পুরানো হলে কী দিতে হয়?

২৩। সয়াবিন বাটার সাথে কী অনুপাতে পানি মিশিয়ে সয়াদুধ তৈরি করা হয়।

২৪। সয়াদুধের পুষ্টিমান কীভাবে বাড়ানো যায়।

২৫। কোন মেশিন দ্বারা সিদ্ধ সয়াবিন কে কাদার মতো স্লারী বা মণ্ড করা যায়?

২৬। কোন মেশিন দিয়ে সয়া দুধ এক্সট্রাকশন করা হয়?

২৭। ১০০ মিলিলিটার সয়াদুধে চর্বি কত?

২৮। সয়াদুধ ও গরুর দুধ কত অনুপাত মিশায়ে দধি তৈরি করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সয়াবিনকে কেন বিস্ময়কর খাবার বলে?

২। সয়াবিনের পরিচিতি এবং সয়া খাদ্যের নাম লেখ।

৩। সয়া খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস কর।

২০২২ ৪। সয়াবিনের পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

৫। সয়াবিনের অপুষ্টিকর পদার্থ দূরীকরণের উপায় লিখ।

৬। সয়া পিঁয়াজু তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৭। সয়া নাট তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮। সয়া ময়দা তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৯। সয়া ভাত অথবা সয়া খিচুড়ি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১০। শিল্প পর্যায়ে সয়াবিনের খাদ্যগুলি কী কী?

১১। শিল্প পর্যায়ে সয়াবিনের ময়দা কীভাবে তৈরি করে।

১২। সয়ারুটি ও পরোটা তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১৩। সাধারণ পদ্ধতিতে সয়া দুধ তৈরির প্রণালি বর্ণনা কর।

১৪। সয়া মাংস তৈরির বর্ণনা দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। সয়াবিন ও সয়া খাদ্যের পরিচিতি এবং শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।

২। সয়াবিনের পুষ্টিমান উল্লেখ করে এর অপুষ্টিকর পদার্থ দূরীকরণের উপায় বর্ণনা কর।

৩। গ্রামীণ পর্যায়ে সয়া বাটা, সয়া ময়দা, সয়া নাট ও সয়া পিঁয়াজু ও সয়া ভাত, রুটি বা পরোটা, তৈরির প্রণালি বর্ণনা কর।

৪। সয়া চটপটি, সয়া শিঙাড়া ও সয়া খিচুড়ি তৈরির প্রণালি লিখ।

৫। শিল্প পর্যায়ে সয়াবিন থেকে ময়দা, সয়া চানাচুর, সয়া দধি ও সয়া ছানা তৈরির প্রণালি লিখ।

৬। আই এম এফ পদ্ধতিতে সয়াদুধ উৎপাদন পদ্ধতি এবং এর প্রবাহচিত্রটি লেখ।

অধ্যায়-৯

আলুর জাত, পুষ্টি, সংরক্ষণ ও পোকামাকড় দমন

ভূমিকা : আলু বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সবজি। পৃথিবীতে সবজি হিসেবে আলুর মোট উৎপাদন সর্বাধিক। যে সবজি সারা বছর ধরে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্তত ১০০টি দেশের এটি সর্ব প্রধান সবজি। আলু আমাদের দেশের আদি ফসল নয়। এটি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চল থেকে প্রথমে ইউরোপে এবং তারপর পৃথিবীর সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবত ২০০ বছর পূর্বে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে সর্বপ্রথম আলু আনে।

আলু উদ্ভিদবিজ্ঞানের সোলানেসি (Solanaceac) পরিবারভুক্ত একটি সবজি। এ পরিবারের অন্য সবজিগুলো হচ্ছে টমেটো মরিচ ও বেগুন। চালের পর এখন দেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য ও খাদ্য শক্তির উৎস হচ্ছে আলু। ২০১৬-২০১৭ সালে দেশে আলুর উৎপাদন প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি (BBS ২০১৭)। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ আলু উৎপাদনে ৭ম স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদন হয় মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া ও রংপুর জেলায়। নিম্ন মধ্যবিত্তের আলুর ভর্তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আলু এখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও চিপস হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। দেশে বছরে মাথা পিছু আলু খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে ১০ গুণ অর্থাৎ মাথাপিছু ২৩ কেজি। বর্তমানে সরকার আলু উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিদেশে রপ্তানি উপযোগী উন্নত আলু চাষের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। গত বছর ৩ কোটি ডলারের আলু রফতানি হয়েছে। দেশে বেশি করে আলু খাওয়ার ফলে পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বিগত ৫ বছরে বাংলাদেশে ১৫টি আলু প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে ৪টি কোম্পানি আলু থেকে উৎপাদিত চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বিদেশে রপ্তানি করেছে।

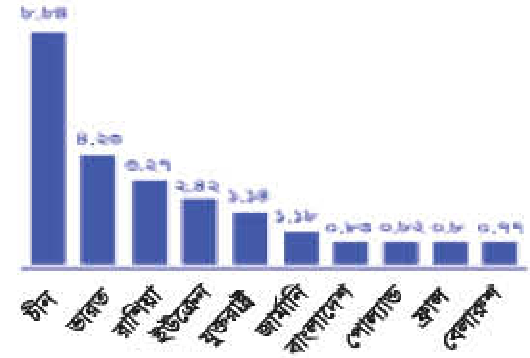

চিত্র : ২০১৫ সালে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের আলু উৎপাদনের বার ডায়াগ্রাম (হিসাব কোটি মেট্রিক টনে)

৯.১ আলুর জাত :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কন্দাল গবেষণা কেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত আলুর যত জাত অবমুক্তি পেয়েছে তাদের নাম, উৎপাদনের মৌসুম, হেক্টর প্রতি ফলন, জীবনকাল ও বৈশিষ্টাবলি নিম্নে দেয়া হলো–

১১০১

ক্রমিক নং	জাতের নাম	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
১.	বারি আলু-১ (হীরা)	রবি মৌসুম	২৫-৪০	৭৫-৮৫ দিন, তবে ৬০-৬৫ দিন থেকেই আগাম	মৌসুমের আগে অথবা পরেও রোপন করা যায়। মড়ক ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।
২.	বারি আলু-২ (মরিনি)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮০-৮৫	আলু সাদা, ডিম্বাকার, মাঝারি থেকে বড় আকারের।
৩.	বারি আলু-৩ (অরিগো)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮০-৮৫	আলু মাঝারি আকারে ডিম্বাকৃতি, ভাইরাস ওয়াই (Y) সহনশীল।
৪.	বারি আলু-৪ (আইলসা)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮০-৮৫	৫-৬ মাস পর্যন্ত আলু ঘরে সংরক্ষণ করা যায়। মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল।
৫.	বারি আলু-৫ (প্যাট্রোনিস)	রবি মৌসুম	২০-৩০	৮০-৮৫	রোগবালাই ও মাটির জলাভাব সহ্য করতে পারে।
৬.	বারি আলু-৬ (মুল্টা)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৮০-৮৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি আকার মোটামুটিভাবে মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী
৭.	বারি আলু-৭ (ডায়ামন্ট)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী
৮.	বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী
৯.	বারি আলু-৯ (মন্ডিয়াল)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু লম্বাকার, আকৃতি বড়, মোটামুটিভাবে মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী
১০.	বারি আলু - ১০(কুফরী সিন্দুরী)	রবি মৌসুম	২০-৩০	১০০-১০৫	আলু গোলাকার, মাঝারি আকৃতির, মোজাইক রোগ প্রবণ তবে অন্যান্য রোগবালাই সহিষ্ণু।
১১.	বারি আলু-১১ (চমক)	রবি মৌসুম	২০-৩৫	৮০-৮৫	আলু ডিম্বাকার আকৃতির, মড়ক ও ভাইরাস রোগ তাপ সহিষ্ণু।
১২.	বারি আলু-১২ (ধীরা)	রবি মৌসুম	২০-৩৫	৯০-৯৫	সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি, তাই হিমাগারবিহীন এলাকায় ৩-৪ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
১৩.	বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)	রবি মৌসুম	২০-৩০	৮৫-৯৫	এ জাতটি বিদেশে রপ্তানিযোগ্য আগাম জাত হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।
১৪.	বারি আলু-১৪ (ক্লিওপেট্রা)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি থেকে বড় আকারের, মোজাইক প্রবণ তবে মড়ক ও অন্যান্য রোগ সহিষ্ণু।
১৫.	বারি আলু-১৫ (বিনেলা)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি আকৃতির, মোজাইক ও অন্যান্য রোগ সহিষ্ণু এবং খরা সহিষ্ণু।
১৬.	বারি আলু-১৬ (আরিন্দ)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	অলু ডিম্বাকার, মোজাইক রোগ প্রতিরোধী এবং সারাদেশে চাষের উপযোগী।
১৭.	বারি আলু-১৭ (রাজা)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বারকার ও মাঝারি ধরনের, মড়ক রোগ প্রতিরোধী, আলু আঠালো ও খেতে সুস্বাদু।
১৮.	বারি আলু-১৮	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতির চ্যাপ্টা, ভাইরাস রোগ

	(বারাকা)				প্রতিরোধী। এ জাতটি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
১৯.	বারি আলু-১৯ (বিন্টজে)	রবি মৌসুম	২০-২৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতির থেকে লম্বাকৃতির, ভাইরাস '×' জনিত মোজাইক প্রতিরোধক্ষম ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
২০.	বারি আলু-২০ (জারনা)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮৫-৯৫	আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, শুকনো পচা রোগ প্রতিরোধী ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী
২১.	বারি আলু-২১ (প্রভেন্টো	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতির থেকে লম্বাকৃতির, মধ্যম আকারের সাধারণ সংরক্ষনাগারে দীর্ঘদিন সুপ্তবস্থায় থাকে।
২২.	বারি আলু-২২ (সৈকত)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮৫-৯৫	লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী ও ভাইরাস রোগ সহনশীল।
২৩.	বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
২৪.	বারি আলু-২৪ (ডুরা)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৮৫-৯০	রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
২৫.	বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
২৬.	বারি আলু-২৬ (ফেলসিনা)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
২৭.	বারি আলু-২৭ (স্পিরিট)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৮৫-৯০	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
২৮.	বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮৫-৯০দিন	আলু গোলাকার, রঙ লাল, ত্বক মসৃণ প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
২৯.	বারি আলু-২৯ (কারেজ)	রবি মৌসুম	২০-২৬	৮৫-৯০ দিন	আলু গোল থেকে ডিম্বাকৃতির প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
৩০.	বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫ দিন	আলু ডিম্বাকৃতির, প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
৩১.	বারি আলু-৩১ (সাগিটা)	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫ দিন	আলু ডিম্বাকুতির এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৩২.	বারি আলু-৩২ (কুইন্স)	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫ দিন	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৩৩.	বারি আলু-৩৩ (আলমেরা)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫ দিন	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৩৪.	বারি আলু-৩৪ (লরা)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫ দিন	আলু ডিম্বাকার ও মাঝারি আকৃতির এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৩৫.	বারি আলু-৩৫	রবি মৌসুম	৩০-৪৫	৯০-৯৫ দিন	আলু ডিম্বাকুতি থেকে মধ্যম আকারের। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
৩৬.	বারি আলু-৩৬	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫ দিন	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের খাবার উপযোগী।
৩৭.	বারি আলু-৩৭	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫ দিন	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৩৮.	বারি আলু-৩৮	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫ দিন	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম

	(ওমেগা)				আকারের। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৩৯.	বারি আলু-৩৯ (বেলিনি)	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫ দিন	আলু-লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
৪০.	বারি আলু-৪০	রবি মৌসুম	৩৫-৫৫	৯০-৯৫ দিন	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৪১.	বারি আলু-৪১	রবি মৌসুম	৩৮-৪৪	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৪২.	বারি আলু-৪২ (এজিলা)	রবি মৌসুম	২৫-৪০	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৪৩.	বারি আলু-৪৩ (এ্যাটিলাস)	রবি মৌসুম	২৫-৫০	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৪৪.	বারি আলু-৪৪ (এলগার)	রবি মৌসুম	২৫-৫০	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৪৫.	বারি আলু-৪৫ (স্টেফি)	রবি মৌসুম	২৫-৫০	৯০-৯৫ দিন	আলু খাটো ডিম্বাকুতি ও মাঝারি আকারের। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৪৬.	বারি আলু-৪৬	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫ দিন	আলু গোলাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি এ জাতটি নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৪৭.	বারি আলু-৪৭	রবি মৌসুম	৪৫-৬০	৯০-৯৫ দিন	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৪৮.	বারি আলু-৪৮	রবি মৌসুম	৪৩-৬২	৯০-৯৫ দিন	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি মাধ্যম আকারের। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৪৯.	বারি আলু-৪৯	রবি মৌসুম	৪৬.৪৫(২৫.৩২-৬৬.১১)	৯০-৯৫ দিন	আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকুতির মধ্যম আকারের। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৫০.	বারি আলু-৫০	রবি মৌসুম	৪৬.৫৯(৩৪.৫২-৬২.৮৭)	৯০-৯৫ দিন	আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকুতির মধ্যম আকারের। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৫১.	বারি আলু-৫১ (বেলারোসা)	রবি মৌসুম	৪০.৫২(৩৬.৬৯-৪৭.৩১)	৯০-৯৫ দিন	আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৫২.	বারি আলু-৫২ (লাবাডিয়া)	রবি মৌসুম	৪৩.৭৯(৩০.৬৭-৫৩.২৪)	৯০-৯৫ দিন	আলু বড় আকারের। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৫৩.	বারি আলু-৫৩	রবি মৌসুম	৩২-৩৪	৯০-৯৫ দিন	আলু গোলাকৃতি। এ জাতটি নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
৫৪.	বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা)	রবি মৌসুম	৪১.১৯(২৫.৫৯-৫৭.৫১)	৯০-৯৫ দিন	আলু মাঝারি আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও জাতটি খাবার উপযোগী।
৫৫.	বারি আলু-৫৫ (রেড ফ্যান্টসি)	রবি মৌসুম	৩০-৩৩	৯০-৯৫ দিন	আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি। চামড়রা রঙ লাল, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। এ জাতটি খাবার উপযোগী।

২০২২

৫৬.	বারি আলু-৫৬	রবি মৌসুম	৩৬.৬৭(২৯.৬৪-৪৫.০১)	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৫৭.	বারি আলু-৫৭	রবি মৌসুম	৩৭.৭৪(২৯.৩৪-৪৫.২৪)	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৫৮.	বারি আলু-৫৮ (এলমান্ডো)	রবি মৌসুম	৪৪.৬১(৪২.৪৬-৪৬-৬৩)	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৫৯.	বারি আলু-৫৯ (মেট্রো)	রবি মৌসুম	৪৩.৫৩(৩৯.২৪-৪৮.৮৮)	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি খাবার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
৬০.	বারি আলু-৬০ (ভিভালডি)	রবি মৌসুম	৪২.০৫(৩৫.৭৯-৪৮.২৯)	৯০-৯৫ দিন	আলু লম্বাটে থেকে বেশি লম্বাটে মধ্যম আকারের। জাতটি খাবার উপযোগী।
৬১.	বারি আলু-৬১ (ভলুমিয়া)	রবি মৌসুম	৩৯.৯৬(৩৬.৪৪-৪৩.৫৭)	৯০-৯৫ দিন	এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
৬২.	বারি টিপিএস-১ (টিউবারলেট)	রবি মৌসুম	সিডলিং টিউবার ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০	১০০-১০৫	ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘ দিন সুপ্তবস্থায় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীঝ আলু নিয়ে চাষ করে বীঝ জনিত ব্যয় কমানো সম্ভব।
৬৩.	বারি টিপিএস-২ (টিউবারলেট)	রবি মৌসুম	সিডলিং টিউবার ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০	১০০-১০৫	ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষনাগারে দীর্ঘ দিন সুপ্তাবস্থায় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীজ আলু নিয়ে চাষ করে বীজ জনিত ব্যয় কমানো সম্ভব।

বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর আলু গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা যে ৬১টি জাত উদ্ভাবন করেছেন, এর মধ্যে বারি আলু-৪৬ ও বারি আলু-৫৩ জাত দুইটি আলুর নাবী ধসা রোগ প্রতিরোধী এবং বিদেশে রপ্তানি উপযোগী।

৯.২ আলুর বীজের বিভিন্ন অংশ ও পুষ্টিমান :

আলুর পুষ্টিমান : গোল আলু একটি কন্দ জাতীয় সবজি যার পুষ্টিমান চাল ও আটা থেকে কোনো অংশেই কম নয়। ভাতের বিকল্প হিসেবে আলু খেতে কোনোই বাধা নেই। সেদ্ধ আলুতে শুধু ক্যালরি বাদে পুষ্টির অন্যান্য উপাদান ভাতের তুলনায় বেশি থাকে। ভাতের জৈবিক আমিষের তুলনায় আলুর জৈবিক আমিষ অনেক উৎকৃষ্টতর। বহুমূত্র রোগীর জন্য আলু কম ক্ষতিকর কারণ একই পরিমাণ সেদ্ধ আলুতে ভাতের তুলনায় ক্যালরি অনেক কম। সে কারণেই আলু খেলে মুটিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

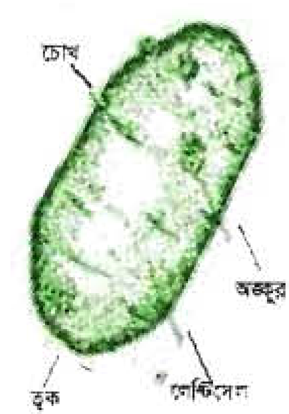

চিত্র: আলু বীজের বিভিন্ন অংশের চিত্র

সিদ্ধ আলুতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ ভাত বা রুটি থেকে বেশি এবং সিদ্ধ আলু শুধু লবণ ও মশলা দিয়েও খাওয়া যায়। আলুতে ভিটামিন 'সি' বিদ্যমান যা ভাতে নেই। ভিটামিন-বি বা নায়াসিন সমপরিমাণ ভাত অপেক্ষা আলুতে বেশি থাকে। আলুতে ফ্যাট নেই বললেই চলে। যাদের দেহের ওজন বৃদ্ধির প্রবণতা (Obesity) রয়েছে তারা প্রধান খাদ্য হিসেবে আলু খেলে উপকৃত হবেন। আলুর আঁশ জাতীয় পদার্থ চাল ও গম থেকে বেশি যা কোষ্টকাঠিন্য দূরীকরণে সহায়ক। স্থুলদেহ, হৃদরোগ ও কোষ্টকাঠিন্য রোগীর জন্য আলু উৎকৃষ্ট খাদ্য। নিম্নের সারণিতে আলু ও চালের তুলনামূলক পুষ্টিমান দেখানো হলো।

সারণি : আলু ও চালের তুলনামূলক পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ)

ক্রঃ নং	পুষ্টির উপাদান	আলু			চাল	
		টাটকা	সেদ্ধ	শুকানো (১১-৩৭%) আদ্রতা	সাধারণ	সেদ্ধ
১	পানি (%)	৭৭.৫	৭৯.৮	১১.৭	১৩.০	৬৭.৯
২	আমিষ (%)	২.১	২.০	৮.৪	৭.৫	২.৩
৩	স্নেহ (%)	০.১	০.১	০.৪	২.০	০.৩
৪	মোট শ্বেতসার (%)	১৮.৫	১৮.৫	৭৪.৫	৭৭.০	২৮.০
৫	আঁশ (%)	২.১	১.৩	৮.৪	-	০.৮
৬	ক্যালরি	৮০.০	৭৬.০	৩২১.০	৩৩২.০	১৩৫.০
৭	ছাই (%)	১.০	০.৯	৪.০	-	০.৭
৮	ক্যারোটিন	নগন্য	নগন্য	নগন্য	০	০
৯	থায়ামিন (মি.গ্রাম)	০.১	০.০৯	০.৪	০.৩৬	০.০২
১০	রাইবোফ্লাবিন (মি.গ্রাম)	০.০৪	০.০৩	০.১৬	০.০৪	০.০১
১১	নায়াসিন (মি.গ্রাম)	১.৫	১.৫	৬.০	৩.৮	০.৪
১২	ভিটামিন-সি (মি.গ্রাম)	২০	১৬	৮০	০	০
১৩	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম)	৯	৭	৩৬	১৫	৮
১৪	লৌহ (মি.গ্রাম)	০.৮	০.৬	৩.২	১.৪	০.৩

৯.৩ আলু সংরক্ষণ

উৎপাদন মৌসুমে আলু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বিধায় আলু সংরক্ষণ করতে হয়। আলু দুইভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যথা:

(ক) স্থানীয়ভাবে ঘরে সংরক্ষণ : মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে আলু-উত্তোলন করা ঠিক নয়। আলু সকালের দিকে উত্তোলন করতে হয়। আলু সম্পূর্ণভবে পরিপক্ব হলে তুলতে হয়। আলু তোলার ৭-১০ দিন আগে আলু গাছের গোড়া কেটে ফেলে আলুর ছাল বা চামড়া শক্ত করতে হয়। তাতে সংরক্ষণ গুণ বাড়ে। আলু তোলার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কোদাল বা লাঙ্গলের আঘাতে আলু কেটে না যায়। আলু তোলা শেষে পরিবহনের জন্য চটের বস্তা ব্যবহার করাই ভালো। সাধারণত বস্তায় আলু ভরার সময় প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা গামলা ব্যবহার করা উত্তম। যদি বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঝুড়ির মাঝখানে চট বা ছালা বিছিয়ে সেলাই করে নিতে হয়। আলু সংগ্রহ শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে আলু ক্ষেতে রাখতে হয় তা হলে ছায়াযুক্ত জায়গায় বিছিয়ে পাতলা কাপড় বা খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

বাড়িতে এনে আলু পরিষ্কার, শুকনো ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। আলু ঢালার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেনে বেশি জোরে বেশি উঁচু থেকে আলু ঢালা না হয়। আলু সংগ্রহ শেষে ১-৭ দিন পরিষ্কার ঠাণ্ডা জায়গায় আলু বিছিয়ে রেখে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে 'কিউরিং' করতে হয়। এতে আলুর গায়ের ক্ষত সেরে যাবে ও পোকার আক্রমণ থেকে আলু রক্ষা পাবে। এভাবে আলু রেখে দেওয়ার পদ্ধতিকে আলু কিউরিং (Curing) বলে। আলু সংরক্ষণ করার আগে কাটা, সবুজ, রোগাক্রান্ত আলু বাছাই করতে হয়। সংগ্রহের ৭-১০ দিনের মধ্যে আলু পরিষ্কার করে আকার অনুযায়ী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রেড করতে হয়। বাছাই করা আলু ঠাণ্ডা ও বাতাসযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করতে হয়। আলু সংরক্ষণের জন্য ছনের ছাউনি দেয়া ও বড় গাছের ছায়ায় অবস্থিত ঘর সবচেয়ে উপযোগী। মেঝেতে বা বাঁশের মাচায় প্রথমে পাতলা করে ঔষধ মিশ্রিত বালু (৩ টন শুকনা বালুর সাথে ১ কেজি সেভিন পাউডার কীটনাশকের গুঁড়া মিশাতে হবে) বিছিয়ে তার উপর আলুর অনধিক ১৫ সে.মি. পুরু স্তর বসাতে হবে এবং তা আবার বালু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

চিত্র : আলু সংকেণের ঘর

চিত্র: অস্থায়ীভাবে আলু সংরক্ষণ

এছাড়া ঘরের তাকে ও চৌকির নিচে আলু বিছিয়ে রাখা যায়। সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ দিন পর নিয়মিত বাছাই করতে হয়। রোগাক্রান্ত, পোকা লাগা ও পচা আলু দেখা মাত্র ফেলে দিতে হবে। আলুর সুতলি পোকা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে বাছাই করে অনেক দূরে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

খ) হিমাগারে আলু সংরক্ষণ : আলু মাঠের উচ্চ তাপমাত্রা থেকে এনে সরাসরি হিমাগরে রাখা সমীচীন নয়। আলু উঠানোর পর পরিষ্কার করে ৭-১০ দিন শুকানোর পর মূল হিমকক্ষে না দিয়ে ২৪ ঘন্টা প্রিকুলিং (Precooling) করতে হয়। হিমকক্ষের র‍্যাকে ৫-৬টি স্তর করে আলু রাখা হয়। আলু উঠিয়ে শুকানো পর হিমাগারে ৭-১০ দিনের মধ্যে আলু বস্তায় রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। হিমাগারে প্রথম ১৫-২০ দিন প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৫-১০ মিনিট করে হিমকক্ষগুলোতে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়। এ কাজটি রাতের বেলায় করা উচিত। পরবর্তী ৩ মাসে ৫ দিন অন্তর ১ বার এবং অবশিষ্ট সময়ে ৭ দিন অন্তর ১ বার করে উপরোক্ত কাজটি করতে হয়।

চিত্র : হিমাগারে আলু সংরক্ষণ

যে সব জাতের আলু ঠাণ্ডা তাপমাত্রায়ও গজানো প্রবণতা আছে তা র‍্যাকে সর্বনিম্নে রাখা উচিত। কারন হিমাগারের নিচের দিকে উপরের তুলনায় বেশি ঠাণ্ডা থাকে। এছাড়া হিমাগারের আলু জুন মাসে ও আগস্ট মাসে বস্তাগুলোর স্থান পরিবর্তন করে নিচের র‍্যাকের আলু উপরে ও উপরের আলু নিচে রাখা হয়। অবশ্য যে জাতের আলু ঠাণ্ডায়ও গজায় তা অবশ্যই স্থান পরিবর্তন করে নিচেই রাখা হয়। হিমাগারে বীজ আলু খাবার আলুর চেয়েও নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় কারণ নিম্ন তাপমাত্রায় খাবার আলু মিষ্টি ভাবাপন্ন হয়ে যায়।

হিমাগার থেকে বের করে আলু সরাসরি উচ্চ তাপমাত্রায় না নিয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় (১৩° - ১৮°C) প্রি হিটিং (Pre heating) চেম্বারে ২৫ ঘন্টা রাখতে হয়। এ ছাড়া আলু ভালো অবস্থায় রাখার জন্য গুদামঘরের মেঝে ও দেওয়ালসমূহে কপার সালফেটের ($CuSO_4$) দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে নেওয়া উচিত।

গ) সংরক্ষিত আলুর ক্ষতিকারক পোকামাকড় : বাংলাদেশে বসতবাড়িতে সংরক্ষিত আলুতে যে পোকা সবচেয়ে ক্ষতি বেশি করে থাকে তার নাম হচ্ছে আলুর সুতলি পোকা (Potato tuber worm) । এরা খাদ্য হিসেবে শুধু আলুই খেয়ে থাকে। সুতলি পোকার ক্রীড়া বা লার্ভা আলুর ভেতরে সুড়ঙ্গ করে খায়। এবং এতে আলু নষ্ট হয়ে যায়। শুধু লার্ভা অবস্থাতেই এরা আলুর ক্ষতি করে থাকে। এ ছাড়া সুতলী পোকার তৈরি করা সুড়ঙ্গ দিয়ে ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক আলুর ভেতর প্রবেশ করে আলুকে পঁচিয়ে দেয়।

পূর্ণাঙ্গ সুতলী পোকা একটি মথ। এটি দেখতে অত্যন্ত ছোট। পাখা ছড়ানো অবস্থায় ১৫ মি.মি. চওড়া। এদের দেহের রং রুপালি বা হাল্কা গোলাপি বর্ণের। এদের পাখায় গাঢ় বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটা ও কিনারায় সরু লোমের ঝালর যুক্ত। স্ত্রী মথ গুদামে রক্ষিত আলুর চোখে বা তার আশপাশে ডিম পাড়ে। এ ছাড়া এরা রক্ষিত আলুর বস্তায়ও ডিম পাড়ে।

প্রতিকার :

১। বাড়িতে সংরক্ষিত আলু শুকনা বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুঁড়ায় একটি স্তর (আলুর উপরে ০.৫ সে.মি.) দিয়ে দিতে হবে।

২। আলু সংরক্ষণ করার আগে সুতলি পোকা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হবে। চিত্র : আলুর সুতলি পোকার জীবন চক্র

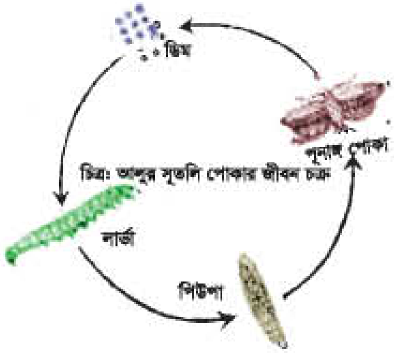

চিত্র : আলুর সুতলি পোকার জীবন চক্র

অনুশীলনী-৯

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আলু উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কোন পরিবারের সবজি?

২. আলু পরিবারের অন্যান্য সবজিগুলো কী কী?

৩. পৃথিবীর কতোগুলো দেশের সর্বপ্রধান সবজি হচ্ছে আলু?

৪. কারা সর্বপথম আমাদের দেশে আলু আনে?
৫. চালের পর এখন দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য কী?
৬. ২০১৫ সালে দেশে আলুর উৎপাদন কত ছিল?
৭. ২০১৫ সালের আলু উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশে কততম হয়েছিল?
৮. বছর মাথাপিছু আলু খাওয়ার পরিমাণ কত?
৯. গত বছরে কত টাকার আলু রফতানি হয়?
১০. বাংলাদেশের কয়টি ফ্যাক্টরি চিপস ও ফ্রেঞ্চফ্রাই রপ্তানি করছে।
১১. ভাতের তুলনায় আলুতে শ্বেতসারের পরিমাণ কত?
১২. আলু তোলার ৭-৮ দিন আগে কেন গাছের গোড়া কেটে ফেলতে হয়?
১৩. ক্ষেতের আলু যদি বাড়িতে সংরক্ষণ করা না যায় তবে কী করতে হবে?
১৪. আলুর কিউরিং বলতে কী বুঝায়?
১৫. আলু সংগ্রহের কতদিনের মধ্যে গ্রেডিং বা বাছাই করতে হয়?
১৬. আলু হিমাগারে নেয়ার পূর্বে কী করতে হয়?
১৭. হিমাগারে আলু রাখার ১০-১৫ দিন পরপর কী করা উচিত?
১৮. হিমাগারের আলু জুন ও আগাস্ট মাসে কী করা উচিত?
১৯. প্রি হিটিং চেম্বারে আলুকে কী করতে হয়?
২০. গুদাম ঘরের আলু ভালো রাখার জন্য মেঝে ও দেয়ালসমূহ কী করা উচিত?
২১. গুদামে আলুর সবচেয়ে ক্ষতিকারক পোকার নাম কী?
২২. সুতলি পোকা দেখতে কেমন?
২৩. কীভাবে সুতলি পোকা দমন করা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আলুর গুরুত্ব ও পরিচিতি বর্ণনা কর।
২. বারি আলু ৪৩, ৪৬ ও ৫৩ জাত তিনটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর?
৩. “আলু খেলে মুটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই” ব্যাখ্যা কর।
৪. সংরক্ষণের জন্য আলুর কিউরিং ও গ্রেডিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. হিমাগারে আলুর প্রিকুলিং ও প্রি হিটিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৬. আলুর সুতলি পোকা আক্রমণের ধরন বর্ণনা কর।
৭. আলুর সুতলি পোকার বর্ণনা দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আলুর গুরুত্ব, পরিচিতি ও ৫টি জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
২. আলুর পুষ্টিমান ও স্থানীয়ভাবে আলুর সংরক্ষণ বর্ণনা কর।
৩. হিমাগারে আলু সংরক্ষণ ও আলুর সুতলি পোকা দমন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২০২২

অধ্যায় ১০

আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য

ভূমিকা : আলু পৃথিবীরে তিনটি প্রধান খাদ্যশস্যের (Staple food) মধ্যে একটি এবং প্রধান খাদ্য হিসেবে গম ও চালের পরেই এর স্থান। আলুর মধ্যে প্রধান খাদ্য যেমন ভাত ও সবজির উপকারিতা একই সাথে পাওয়া যায়। আলুর ব্যবহারে বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। ২০১৬-২০১৭ আলুর উৎপাদন ১ কোটি ২ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি হওয়ায় মাথাপিছু আলু খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে বর্তমানে ৬৩ কেজি হয়েছে। আলু আর আলু ভর্তা রূপে নয় বিভিন্ন ভাবে খাওয়া হচ্ছে। আলুর বিভিন্ন খাবারের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো–

ক) প্রধান খাদ্য হিসেবে আলু
খ) আংশিক প্রধান খাদ্য হিসেবে আলু
গ) আলুর নাস্তা
ঘ) আলুর রুটি বা চাপাতি
ঙ) আলুর তরকারি
চ) আলুর সালাদ
ছ) আলুর ডাল বা স্যুপ
জ) আলুর চপ
ঝ) আলু ভাজা
ঞ) আলুর পিঠা
ট) আলু মচমচা
ঠ) আলুর মিষ্টান্ন ইত্যাদি।

আমরা যেমন আমাদের প্রধান খাদ্য চাল সিদ্ধ করে ভাত করে খাই। অন্যান্য খাবার যথা- ভাজি, তরকারি ইত্যাদির সাথে দিয়ে আলুকেও তেমনি সিদ্ধ করে খাওয়া যায়। ইউরোপের অনেক দেশে আমাদের ৬ জনের জন্য যে ১.৫ কেজি চাল লাগে তাদের লাগে ৪ কেজি আলু এমনিভাবে পোড়া আলু, ভাজা আলু, আলু রুটি, চাপাতি, আলুর সাথে ভাত বা তরকারি দিয়ে খিচুড়ি, অথবা আলুর সাথে মাছ, মাংস বা অন্যান্য তরকারি খাওয়া যায়। এছাড়াও আলু থেকে স্যুপ, সালাদ ও সস তৈরি করে খাবারে বৈচিত্র্য আনা যায়। আলু যে কত ভাবে প্রধান খাদ্য রূপে খাওয়া যায় তা নিম্নে চিত্রে দেখানো হলো–

চিত্র : কয়েকটি আলু-জাত খাদ্যসামগ্রী (বাঁ থেকে ডানে)। ময়দা, আস্ত সিদ্ধ আলু, সুপ ও সালাদ। উপর মধ্যেঃ রুটি বা চাপাতি, পুরি ও ম্যাশ বা ভর্তা। নিচ মধ্যে, কাটা সিদ্ধ আলু, পোড়া আলু। নীচঃ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও শিঙাড়া।

১০.১ আলু থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন খাদ্য :

আমাদের দেশে আলু শুধু সবজি হিসাবে খাওয়া হয়ে থাকে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সব দেশে, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রধান খাদ্য হিসেবে আলু সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। আলু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের উপাদেয় ও মুখরোচক খাদ্যের তালিকা নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি : আলু দিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের তালিকা।

ক্রঃ নং	প্রকারভেদ	উৎপাদিত খাদ্যের নাম
১	আলু সিদ্ধ	সিদ্ধ আলু, ভিত্তি সিদ্ধ আলু, ভাপে সিদ্ধ আলু, আলু ভর্তা, ম্যাশড পটেটো ইত্যাদি।
২	পোড়া আলু	ভিত্তি পোড়া আলু, কাঠের চুলার আগুনে পোড়া আলু, উত্তপ্ত বালুর মধ্যে রেখে পোড়া আলু, অস্ট্রেলিয়ার পোড়া আলু, কলম্বিয়ার পনির যুক্ত পোড়া আলু, ফ্রান্সের কমলাযুক্ত পোড়া আলু, যুক্তরাষ্ট্রের পনিরযুক্ত পোড়া আলু।
৩	ভাজা আলু	ফ্রেন্স ফ্রাই, আলু চাক ভাজা, ডুবো তেলে ভাজা আলু, চীনা আলু, গাজর ভাজি, আলু চাপড়ি।
৪	আলুর চাপাতি	আলুর রুটি, আলু লুচি, আলু পুরি, আলু পরোটা, আলু মোগলাই পরোটা, আলু চাপড়ি।
৫	আলুর খিচুড়ি	আলুর ভাত, আলুর ভুনা খিচুড়ি, আলুচাল খিচুড়ি, আলু গাজর ডিম খিচুড়ি, আলু বরবটি কিমা খিচুড়ি, আলু-মাছ খিচুড়ি, আলু সবজি খিচুড়ি, আলু পিশ-পাশ।
৬	আলুর তরকারি	আলু মাছ তরকারি, আলু মাংস তরকারি (গরু-খাসি ও মুরগি), আলুর দম, আলু ফুলকা, ডালনা, আলু সবজি লাবড়া, আলু কাঁঠাল এচোড়, আলু চচ্চড়ি, আলু কিমা, আলু তাজ কাবাব।
৭	আলুর স্যুপ	আলুর ডাল, আলু সবজি স্যুপ, আলু মাংস স্যুপ, ফ্রান্সের ভিত্তি আলু স্যুপ, জার্মানির আলু শসা স্যুপ, কানাডার আলু সালাদ।
৮	আলুর সালাদ	আলু ডিম সালাদ, ইটালিয়ান আলু সালাদ, জার্মানির আলু সালাদ, আলু শসা সালাদ, সিরিয়ান আলু সালাদ, আমেরিকান আলু সালাদ।
৯	আলুর নাস্তা ও স্ন্যাকস	আলুর চপ, আলু বল, আলু শিঙ্গাড়া, ইলিশ আলু কাবাব, চিড়া আলু ভাজা, আলু ডিম মামলেট, আলুর চটপটি, আলু পিজা, পটেটো বার্গার রোস্ট।
১০	আলুর বেকারী	আলু পেস্ট্রি, আলু প্যান কেক, আলু লেফসে, আলু স্কোনস, আলু পিকার্ট।
১১	আলুর মিষ্টান্ন	আলু পায়েশ, আলু জিলাপি, আলু বুন্দিয়া, আলু হালুয়া, আলুর বরফি, আলুর কালোজাম, আলু ক্যান্ডি, আলু ডোনাট, আলুর পিঠা, আলুর পুডিং, আলু পুলি পিঠা, আলু মোরব্বা, আলু নারিকেল হালুয়া, আলু জরদা।
১২	আলু ও সস	আলু আচার, আলু মেয়ানেজ, ভ্যানিলা সস।
১৩	আলু চমচম	আলু চিপস, আলু ঝুরি, আলু মিঠা মচমচ, আলু স্ট্র।

উৎস : বিধাতার দান আলু- কামাল ও মমতাজ ২০০৭ ইং

১০.২ আলু থেকে ঝাল জাতীয় খাদ্য

প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়া : আলু এমন এক খাদ্য যা বহুবিধ উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে হিমায়িত (Frozen) অবস্থায় বহুদিন রাখা যায়। প্রক্রিয়াজাত আলু সংরক্ষণ ও পরিবহন খুবই সহজ। নিম্নে প্রক্রিয়াজাতকৃত আলুর খাদ্যের বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **আলুর চপ্‌স (Potato Chips) :** আলু ছিলে পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। আলু বঁটি বা ছুরি দিয়ে ১.৫ মিমি. পুরু গোল করে কেটে লবণ পনিতে (১ লিটার পানিতে ১ চা চামচ লবণ) ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত সয়াবিন তেলে কাটা আলু ভেজে আলু চিপস তৈরি করা যায়। শুকনো চিপস বানাতে হলে লবণ পানি থেকে আলুর টুকরোগুলো পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। পরিষ্কার পাতলা কাপড় বা মশারির নেটের উপর রেখে কড়া রেদে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর বায়ুরোধী টিন বা পলিব্যাগে ভরে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে। খাওয়ার সময় তেলে ভেজে লবণ ছিটিয়ে নিতে হবে।

২. **ফেঞ্চ ফ্রাই (French Fry) :** আলুর প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মধ্যে ফেঞ্চ ফ্রাই-এর ব্যবহার সর্বাধিক। প্রথমে বড় ও লম্বা আলু ছিলে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। খোসা ছাড়ানো আলু ৫-১০ সেমি লম্বা ফালি করে কেটে নিয়ে লবণ, মরিচ বাটা ও গোল মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে ৫-১০ মি. রেখে দিতে হবে। অনেক সময় ফালি সোজা না করে খাঁজ কাটা অবস্থায় কাটা হয়। অতঃপর এ ফালিগুলো ফুটন্ত জ্বালে ডুবো তেলে ভাজা হয়। তেল ঝরিয়ে মাংস সহযোগে পরিবেশন করলে উপাদেয় হয়। ১০০ কেজি আলু থেকে ৫০-৭৫ কেজি ফ্রাই তৈরি হয়। হিমায়িত অবস্থায় এই ফ্রাই বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র : ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও আলুর চিপস

৩. **আলু ভাজি :** আলু চিকন ফালি করে কেটে ধনে, হলুদ, জিরা, পেঁয়াজ ইত্যাদি মসলা সহযোগে তেলে ভেজে নিতে হয়। প্রথমে বাটা মসলাসহ আলু তেলে কষিয়ে পানি যোগ করতে হবে। পানির পরিমাণে এমন হবে যেন এটা শুকিয়ে আসার সাথে সাথে আলুও সিদ্ধ হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় আলুর সাথে শিম, বেগুন, করলা ইত্যাদি সবজি মিশানো হয়। আলু ভাজি আমাদের অতি প্রিয় খাদ্য, যা ভাত, রুটি ও পরোটার সাথে খাওয়া যায়।

৪. **আলু ভর্তা :** সিদ্ধ আলু খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ডলে কাই করা হয়। এরপর এর সাথে কাঁচামরিচ বা শুকনো ও পোড়া মরিচ, পেঁয়াজ এবং সরিষার তেল ভালো করে মিশিয়ে সুস্বাদু ভর্তা (Mashed potato) তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে ভর্তা শুধু ভাতের সাথে খাওয়া হয় কিন্তু এটা প্রধান খাবার এবং নাস্তা হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। মাখন, সিদ্ধ কাঁচা মরিচ, গাজরের কুচি ইত্যাদি দিয়ে ভর্তা তৈরি করা যেতে পারে। এতে স্বাদ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি হয়। বিদেশে এরূপ ভর্তা প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয় এবং দোকানে হিমায়িত বা ফ্রোজেন (Frozen) অবস্থায় পাওয়া যায়।

৫. আলুর দম : ছোট আলু সিদ্ধ করে মসলা সহযোগে তেলে কষাতে হয়। তারপর সামান্য পানি দিয়ে কিছুক্ষণ পর চুলা থেকে নামালে তা আলুর দম হয়। আলুর দম আসলে আলুর একক নিরামিষ তরকারি ছাড়া কিছুই নয়।

৬. আলুর চপ : সিদ্ধ আলু ভালো করে ডলে কাই তৈরি করে তাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ লবণ, রসুন, কাঁচা মরিচের কুঁচি, ধনিয়া বা পুদিনা পাতা, গোল মরিচের গুঁড়া ইত্যাদি মিশিয়ে নেওয়া হয়। আলাদাভাবে মাংসের কিমা সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে তেলে ভেজে নেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট আকৃতির চপ তৈরি করে ভিতরে পুর হিসেবে ভাজা কিমা বা সিদ্ধ ডিমের টুকরা ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. আলুর রুটি ও পরোটা : আটা এবং ময়দার সাথে সিদ্ধ আলুর কাই বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুটি ও পরোটা তৈরি করা যেতে পারে। আলুর পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগের বেশি হবে না, অন্যথায় কাই বা মিশ্রণের আঠালোভাব নষ্ট হয়ে রুটি তৈরি হবে না।

৮. আলু-মাংস স্যুপ : কোনো খাবারের প্রারম্ভে যে তরল বা পানীয় জাতীয় আইটেম খেতে দেয়া হয় তাই স্যুপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্যুপ ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য দেয়া হয়। প্রথমে মাংস তেলে ভেজে বাদামি করতে হয়। তারপর পানি দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত মাংস হাড় থেকে খুলে আসে। এরপর মাংসের পানি ছেঁকে নিয়ে তাতে মাংস ভেঙে মেশাতে হয়। আলুর টুকরা, গাজর, টমেটো কাটা, লবণ, পেঁয়াজ, বরবটি তেজপাতা, মরিচ সব মিশ্রণের সাথে এক সাথে মিশিয়ে আধা ঘণ্টা জ্বাল দিতে হয়। এরপর তৈরি স্যুপের সাথে ধনে পাতার কুচি দিয়ে ১৫ মিনিট জ্বাল দিয়ে গরম অবস্থায় পরিবেশন করা যায়।

আলু ভাজি

আলুর দম

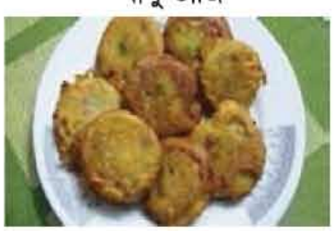
আলুর চপ

আলুর পরোটা

৯. আলুপুরি : আলুপুরি তৈরিতে ময়দা, সিদ্ধ আলু, আদাবাটা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ ইত্যাদি দিতে হয়। প্রথমে আলু পরিমাণমতো পানি, আদা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ দিয়ে মৃদু আঁচে সিদ্ধ করতে হয়। আলু সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে ভালোভাবে নেড়ে নামাতে হয়। মরিচ

ভেজে গুঁড়া করতে হয়। পেঁয়াজ বেরেস্তা করে গুঁড়া করতে হয়। আলুর সঙ্গে গুড়া মরিচ, পেঁয়াজ, পুদিনা পাতা ও লবণ মিশাতে হয়। আদার সঙ্গে ২ চামচ লবণ ও ৬ টেবিল চামচ তেল বা ডালডা দিয়ে মাখাতে হয়। আধা কাপ পানি দিয়ে ময়দা মাখাতে হয়। তবে খামির নরম করা যাবে না। ময়দা এবং আলু সমান ভাগ নিতে হয়। এক ভাগ গোল করে মাঝে আলু ভরে মুখ বন্ধ করতে হবে। পিঁড়িতে হালকা ময়দা ছিটিয়ে পুরির মুখ বন্ধ দিক নিচে রেখে বেলতে হয়। সাবধানে বেলতে হবে যেন আলু বের না হয়। আলুপুরি ডুবো তেলে কম আঁচে মচমচে করে ভাজতে হয়। সস, চাটনি বা আচার দিয়ে পরিবেশন করলে খেতে সুস্বাদু হয়।

১০.৩ আলু থেকে মিষ্টান্ন দ্রব্য :

১। **আলুর হালুয়া ও বরফি :** সিদ্ধ আলু ভালো করে কাই তৈরি করে তার সাথে পরিমাণমতো চিনি ও গরম মসলা মিশিয়ে ঘি কিংবা ডালডায় কষিয়ে নিয়ে হালুয়া তৈরি করা হয়। কষাবার সময় সর্বক্ষণ নাড়তে হবে যাতে এটি পুড়ে পাত্রের গায়ে লেগে না যায়। একটি ট্রেতে ঘি মাখিয়ে তার উপর গরম হালুয়া ঢেলে সমান করে নিতে হয়। উপরে কিশমিশ, বাদাম কুঁচি বসিয়ে দেয়া হয়। এরপর নরম থাকতেই ছুরি দিয়ে কেটে বরফি তৈরি করা হয়।

২। **আলুর জিলাপি :** সমপরিমাণ সিদ্ধ আলু ও ময়দা নিতে হয়। আলু ছিলে ডলে কাই করে ময়দা, রং পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে ময়ান দিতে হয়। মিশ্রণ এমন হবে যাতে ঢেলে ফেলানো যায় কিন্তু পানির মতো পড়ে ছড়িয়ে যাবে না। একটি পাত্রে চিনি জ্বাল দিয় সিরা তৈরি করা হয়। লোহার কড়াইতে সয়াবিন তেল বা ডালডা গরম করতে হয়। তেল গরম হলে ৩০X৩০ সে.মি. কাপড়ের মাঝখানে ছিদ্র করে ভিজিয়ে নিতে হয়। কাপড়ের ভিতর মিশ্রণ নিয়ে পুঁটলি তৈরি করে চাপ দিলে ছিদ্র দিয়ে মিশ্রণ নলাকারে বের হয়। এবার কড়াইয়ের উপর চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আড়াই প্যাঁচের জিলাপি বানাতে হয়। একটু শক্ত হলে উল্টিয়ে দিতে হয়। বাদামি রং ধারণ করলে ঝাঁঝরি হাতা দিয়ে তুলে সিরায় ডুবিয়ে দিতে হয়। মিনিটখানেক পর তুলে সিরা ঝরিয়ে ডিশে আলুর জিলাপি সাজিয়ে রাখা হয়।

চিত্র : আলুর জিলাপি ও বরফি

৩। প্যানকেক : আলুর প্যানকেক তৈরিতে উপকরণ লাগবে ডিম ১টি, দুধ ১ কাপ ময়দা ৮ টেবিল চামচ, আলু, লবণ ও বাদাম ভাজার তেল লাগবে পরিমাণমতো।

প্রথমে ডিমটি ফেটিয়ে দুধের সাথে মেশাতে হবে। এবার একটু একটু করে ময়দা দিয়ে ফেটাতে হবে। সম্পূর্ণ ময়দা দিয়ে খুব ভালো করে ফেটাতে হবে। গোলা পাতলা হবে। ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে গরম হলে পরে গোলা ছড়িয়ে দিতে হবে। প্যান বেশি গরম যেন না হয়। এক দিক ভাজা হয়ে গেলে অপর ভেজে রাখতে হবে। পনির গুলে ও আলু সিদ্ধ টুকরা দিয়ে পুর তৈরি করে পুর ভরে প্যান কেক তৈরি করতে হবে। এরপর মুড়ে পরিবেশন করতে হবে। জ্যাম ও ফল দিয়ে মিষ্টি প্যান কেকও বানানো যায়।

চিত্র : আলুর প্যান কেক

অনুশীলনী-১০

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ২০১৫ সালে বাংলাদেশে আলুর উৎপাদন কত ছিল?

২. প্রধান খাদ্য ফসল হিসেবে আলুর অবস্থান কততম স্থানে আছে?

৩. দেশে প্রতি বছর বর্তমানে মাথাপিছু আলু খাওয়ার পরিমাণ কত?

৪. ইউরোপে ৬ জনের জন্য কত কেজি আলু লাগে?

৫. পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রধান খাদ্য হিসেবে 'সিদ্ধ আলু' খাওয়া হয়?

৬. ভাজা আলু দিয়ে কী কী খাবার তৈরি করা যায়?

৭. আলুর নাস্তা ও স্ন্যাক্স জাতীয় খাবার গুলো কী কী?

৮. আলু দিয়ে কী কী মিষ্টান্ন তৈরি করা যায়?

৯. ১০০ কেজি আলু থেকে কত কেজি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করা হয়?

১০. আলু ভাজির সাথে কী কী সবজি মিশিয়ে রান্না করা যায়?

১১. বিদেশে হিমায়িত আলুর ভর্তা কী দিয়ে তৈরি হয়?

১২. আলুর দম বলতে কী বুঝায়?

১৩. ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বলতে কী বুঝায়?

১৪. আলুর চপের মাঝে পুর হিসেবে কী দেওয়া হয়?

১৫. আলুর রুটি ও পরোটায় আলু ও আটার অনুপাত কত হয়?

১৬. স্যুপ বলতে কী বুঝায়?

১৭. আলুপুরি বানাতে কী কী উপকরণ লাগবে?

১৮. জিলাপি বানাবার কাপড়ের মাপ কত?

১৯. প্যান কেকে কীভাবে পুর দিতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রধান খাদ্য হিসেবে আলুর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. 'প্রধান খাদ্য' হিসেবে আলুকে কতভাবে দেখানো হয়েছে?

৩. আলুর চিপস তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. আলু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কীভাবে তৈরি করা হয়?

৫. আলু ভর্তা বা আলু ভাজি তৈরি সম্পর্কে লেখ।

৬. আলু চপের উপকরণ ও প্রস্তুতপ্রণালি লেখ।

৭. আলু মাংস স্যুপের বর্ণনা দাও।

৮. আলুপুরির উপকরণ ও বানানোর নিয়ম লেখ।

৯. আলুর জিলাপি বানানোর পদ্ধতি ও উপরকণ লেখ।

১০. আলুর প্যানকেক কীভাবে তৈরি করে লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. খাদ্য হিসেবে আলুর গুরুত্ব বর্ণনা কর? আলু থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের তালিকা তৈরি কর।

২. আলু থেকে চিপস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আলু ভাজি, আলুর চপ, আলুর রুটি ও আলুর স্যুপে তৈরির প্রণালি বর্ণনা কর।

৩. আলু থেকে হালুয়া, বরফি ও প্যানকেক তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অধ্যায় ১১

মিষ্টি আলুর জাত, পুষ্টি ও বিভিন্ন খাদ্য

ভূমিকা : মিষ্টি আলু (Sweet Potato) উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কনভলভুলেসি (Convolvolaceae) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি লতানো গাছ। উৎপাদনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের খাদ্য ফসলসমূহের মধ্যে মিষ্টি আলুর স্থান চতুর্থ। মিষ্টি আলুর চাষে খরচ কম, লাভ বেশি। এতে পোকামাকড় ও রোগবালাই নেই বললেই চলে। উৎপাদন ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশি। মিষ্টি আলু চাল ও গোল আলুর চেয়ে অধিক পুষ্টিকর। মিষ্টি আলু প্রক্রিয়াজতকরণের মাধ্যমে হালুয়া, পায়েস, ফিরনি, চিপস, জ্যাম, জেলি, মিষ্টি, ভর্তা, তরকারি এসব তৈরি করা যায়। দুধের সাথে মিষ্টি আলু মিলিয়ে খাওয়া যায়। মিষ্টি আলুর পাতা বা শাক সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। তরকারি হিসেবে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হচ্ছে। বিশেষ করে শুঁটকি মাছ এবং মাছের মাথা দিয়ে তরকারি বেশ মজাদার।

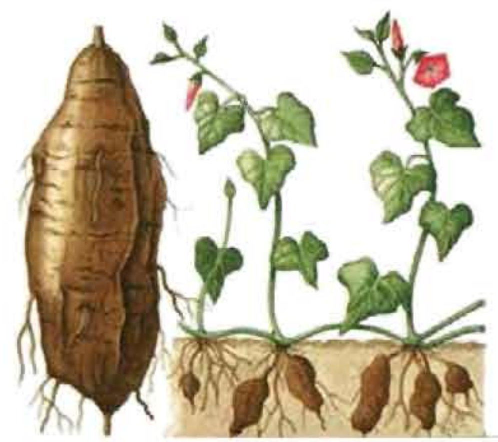

চিত্র : মিষ্টি আলুর লতাসহ আলু

কোরিয়াতে মিষ্টি আলুর হটকেক, দুধ, নুডুলস, ক্যান্ডি জাতীয় খাদ্য অতি জনপ্রিয়। এছাড়া পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহার হয়। তাইওয়ানে উৎপাদিত মিষ্টি আলুর ৭৩ ভাগ প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। মিষ্টি আলুর হালকা রঙের শাঁস এবং উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধজাত স্টার্চ তৈরিতে ব্যবহার হয়। মিষ্টি আলুর স্টার্চ গোল আলুর, ভুট্টা ও কাসাভার স্টার্চের তুলনায় এবং অন্যান্য গুণাগুণের দিক দিয়ে মাঝারি মানের। দক্ষিণ আমেরিকার মিষ্টি আলুর আটা মুদি দোকানে ভোজ্য পণ্য হিসেবে এবং বাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। সয়া সস তৈরিতে গমের ময়দার পরিবর্তে মিষ্টি আলুর আটা ব্যবহার করা হয়। কমলা রঙের স্টার্চযুক্ত মিষ্টি আলুতে গাজর ও অন্যান্য সবজি ও ফল থেকে বেশি ক্যারোটিন বিদ্যমান।

১১.১ মিষ্টি আলুর পুষ্টিমান ও জাত :

মিষ্টি আলুর পুষ্টিমান : আমাদের দেশে মিষ্টি আলুর গুণাগুণ ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবে মিষ্টি আলুর ব্যবহার কম হয়। এতে প্রচুর ভিটামিন 'এ' ও 'সি' বিদ্যমান। এ কারণে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই ফসল সংগ্রহের সাথে সাথে তাজা মিষ্টি আলু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। মিষ্টি আলুর পুষ্টি উপাদান নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি : মিষ্টি আলুর পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রাম খাবার অংশ)

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	পরিমাণ
১.	জলীয় অংশ	৬৮.৫ গ্রাম
২.	শ্বেতসার	১৯-২৩ গ্রাম
৩.	আমিষ	১.৫-২.০০ গ্রাম
৪.	চর্বি	০.৭ গ্রাম
৫.	ক্যালসিয়াম	৪৬ মিলিগ্রাম
৬.	লৌহ	০.৮ গ্রাম
৭.	বিটা ক্যারোটিন (ভিটা-এ)	৪০০-১২৩০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট (I.U)
৮.	ভিটামিন- বি$_১$	০৬ মিলিগ্রাম
৯.	ভিটামিন- বি$_২$	০.০২ মিলিগ্রাম
১০.	ভিটামিন- সি	২৪ মিলিগ্রাম
১১.	আঁশ	০.৮ গ্রাম

সূত্র : কৃষিকথা (অগ্রহায়ণ ১৪২২)

মিষ্টি আলুতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন থাকে যা ভিটামিন 'এ' এর একটি ভালো উৎস। মিষ্টি আলু স্বাভাবিক অবস্থায় ১-২ মাস সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু প্রক্রিয়াজাত করে মিষ্টি আলু থেকে চিপস, শুকনো চিপস, জ্যাম, জেলি ও সস তৈরি করে বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। শহর ও গ্রামের মেয়েরা সহজেই এ সকল দ্রব্য তৈরি ও বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

মিষ্টি আলুর জাত : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) জয়দেবপুর, গাজীপুরের কন্দাল গবেষণা কেন্দ্র থেকে যে সকল মিষ্টি আলুর জাত অবমুক্ত করা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে ছক আকারে বর্ণনা করা হলো-

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মিষ্টি আলু-১ (তৃপ্তি)	১৯৮৫	রবি	৪০-৪৫	১৩৫-১৪০	লতার কাণ্ড বেগুনি ও লোমশ, লতার অগ্রভাগ ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া হলুদ, শাঁস হালকা হলুদ।
বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলা সুন্দরী)	১৯৮৫	রবি	৪০-৪৫	১৩৫-১৪০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ কিন্তু লতার অগ্রভাগ বেগুনি, কন্দমূলের চামড়া কমলা, শাঁস কমলা রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-৩ (দৌলতপুরী)	১৯৮৮	রবি	৩০-৩৫	১৩৫-১৪০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ, পাতা খাঁজকাটা, কন্দমূলের চামড়া ও সাদা,শাঁস সাদা।
বারি মিষ্টি আলু-৪	১৯৯৪	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ, লতার অগ্রভাগ ও অগ্রভাগের পাতা বেগুনি কন্দমূলের চামড়া ও শাঁস কমলা রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-৫	১৯৯৪	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস কমলা রঙের।

বারি মিষ্টি আলু-৬	২০০৪	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ এবং খাঁজকাটা, কন্দমূলের চামড়া হলুদাভ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-৭	২০০৪	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩০	লতার কাণ্ড বেগুনি ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া হলুদাভ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-৮	২০০৮	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস মাঝারি হলুদ রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-৯	২০১৩	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-১০	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া বাদামি ও শাঁস হালকা হলুদ রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-১১	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০	লতার কাণ্ড বেগুনি ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস হালকা হলুদ রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-১২	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস কমলা রঙের।
বারি মিষ্টি আলু-১৩	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০	লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ, এবং খাজকাটা, কন্দমূলের চামড়া গাঢ় হলুদ ও কমলা রঙের।

১১.২ মিষ্টি আলু থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১. সিদ্ধ আলু- সিদ্ধ আলু, বাষ্পে সিদ্ধ আলু, রসে সিদ্ধ আলু ইত্যাদি।

২. রোস্টেড বা পোড়া আলু-ভিত্তি পোড়া আলু, কাঠের চুলায় পোড়া আলু, বালুতে পোড়া আলু ইত্যাদি।

৩. মিষ্টি আলু মচমচে-সাধারণ চিপস, শুকানো চিপস ইত্যাদি।

৪. চৌকাকার মিষ্টি আলু- আর্দ্রতামুক্ত চৌকাকার মিষ্টিটক আলু, চৌকাকার শুকনা আলু, ফালি করে কাটা শুকনা আলু ইত্যাদি।

৫. মিষ্টি আলুর ময়দা - ময়দা, ময়দার রুটি, চাপাতি ইত্যাদি।

৬. ফ্রোজেন মিষ্টি আলু- পাল্প ফ্রোজেন মিষ্টি আলু

৭. মিষ্টান্ন- মিষ্টি আলুর জ্যাম, মণ্ড ইত্যাদি

৮. আচার- মিষ্টি আলুর আচার ও সস ইত্যাদি।

৯. কনফেকশনারি- মিষ্টি আলুর বিস্কুট, কেক ও পাউরুটি

১০. সালাদ- সালাদ, মেয়নেজ ইত্যাদি।

১১.৩ মিষ্টি আলু সিদ্ধ ও ঝলসানো পদ্ধতি :

মিষ্টি আলুতে ক্যালরি গোল আলুর মতোই। এতে ভিটামিন-এ আছে এবং কমলা সুন্দরী ও তৃপ্তিতে অন্যান্য জাতের তুলনায় ভিটামিন-এ এর পরিমাণ বেশি থাকে। মিষ্টি আলু সিদ্ধ বা ঝলসানোর আগে পানিতে ভালো করে খোসা পরিষ্কার করে নিতে হবে। সহজে সিদ্ধ হওয়ার জন্য পরিমাণমতো পানি দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়।

সিদ্ধ করার সময় ঢেকে দিতে হয়। মিষ্টি আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো হয়। মিষ্টি আলু প্রচলিত পদ্ধতিতে গোল আলুর মতোই সিদ্ধ, সেঁকা এবং ভাজা যায়। মিষ্টি আলু থেকে ভিটামিন-এ (ক্যারোটিন) এর উপকারিতা পুরোপুরি পেতে হলে সামান্য তেল উত্তপ্ত করে এতে সিদ্ধ আলু কিছুটা গড়িয়ে নিয়ে পরিবেশন করা যেতে পারে। এতে সহজেই আলুর ভিটামিন-এ দেহের গ্রহণোপযোগী হয়ে থাকে।

মিষ্টি আলু গোল আলুর মতো একই নিয়মে সূর্যের আলোতে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু গোল আলুর মতো দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় । সে কারণে মিষ্টি আলু ঘরে ওঠার পরই মিষ্টি আলু সিদ্ধ করা ও পোড়া দুই ভাবেই নাস্তায় দেওয়া যেতে পারে। ফলে সংরক্ষণের জন্য বাড়তি খরচ কমে যায়।

চিত্র : সিদ্ধ মিষ্টি আলু ও ঝলসানো মিষ্টি আলু

১১. ৪ মিষ্টি আলু থেকে চিপস, আটা/ময়দা, চাপাতি

উৎপাদনের দিক দিয়ে মিষ্টি আলু বাংলাদেশের খাদ্য ফসলসমূহের মধ্যে চতুর্থ। একক পরিমাণ জমিতে এর ফলন অন্যান্য যে কোনো শর্করা জাতীয় ফসলের অপেক্ষা উৎপাদন বেশি হওয়ায় ক্যালরির উৎপাদনও বেশি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে ১৩ গ্রাম পরিমাণ হলদে শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলু খেলে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের ভিটামিন-এ এর চাহিদা পূরণ হয়। মিষ্টি আলু খাদ্য ছাড়াও বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে পশু খাদ্য, শিল্পের কাঁচামাল যেমন– স্টার্চ, গ্লুকোজ, পেকটিন, চিনি, সিরাপ ও অ্যালকোহল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে টিনজাত, হিমায়িত ও পানিশূন্য করে প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং শিশু খাদ্য তৈরিতে ও ব্যবহৃত হয়। মিষ্টি আলু থেকে সাধারণত যেসকল খাদ্য তৈরি করা যায় তা নিম্নে বর্ণিত হলো-

(১) **মিষ্টি আলুর আটা :** খুব সহজেই এবং কম পরিশ্রমে মিষ্টি আলু থেকে আটা তৈরি করা যায়। মিষ্টি আলু থেকে আটা তৈরির জন্য কোনো উন্নত প্রযুক্তির দরকার হয় না। আবার তৈরিকৃত আটা সাধারণ গমের আটার মতোই বেকারি ও ঘরে তৈরি খাবারে ব্যবহার করা যায়।

সতেজ, নিটোল মিষ্টি আলু পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার করা আলু চামড়া ফেলে ১-১.৫ মি.মি পুরু করে ধারালো ছুরি দ্বারা চিপস করার আকৃতিতে স্লাইস করা হয়। এ স্লাইসগুলো ৯০°C তাপমাত্রায় পানিতে ৩-৪ মিনিট ব্লানচিং করে নিতে হয়। অতঃপর স্লাইসগুলো তুলে পানি ঝরিয়ে ২-৩ দিন একটানা ভালোভাবে রোদে শুকাতে হয়। একটানা রোদে না শুকালে ছত্রাকের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

আলুর স্লাইসগুলো মচমচে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য ২-৩টি চিপস হাতে নিয়ে চাপ দিলে গুঁড়া হলে বুঝতে হবে ঠিকমতো শুকানো হয়েছে। এরপর স্লাইসগুলো গম ভাঙানোর মিলে ভাঙিয়ে আটা তৈরি করা যায়। সাধারণত ১ কেজি আটা তৈরিতে ৩-৪ কেজি মিষ্টি আলু লাগে। এরপর বায়ুরোধী পাত্রে প্যাকিং করে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যাবে।

(২) **মিষ্টি আলুর চিপস :** চিপস বর্তমানে খুবই মজাদার খাবার। এটি হালকা নাস্তা হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। শিশু-কিশোরেরা এটি খেতে খুবই ভালোবাসে। মিষ্টি আলুর চিপস তৈরি করা যায় তবে এটি ততটা প্রচলিত নয়। মৌসুমে মিষ্টি আলুর উৎপাদন যখন বেড়ে যায় তখন গোল আলুর মতো একই পদ্ধতিতে চিপস প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত মিষ্টি আলুর চিপস ভালোভাবে শুকিয়ে সারা বছর বায়ুরোধী টিনে ও পলিব্যাগে ভরে রাখা হয়। খাওয়ার সময় তেলে ভেজে খাওয়া যায়।

(৩) **মিষ্টি আলুর রুটি ও চাপাতি :** সমপরিমাণ মিষ্টি আলুর আটা ও গমের ময়দা ঢেলে নিয়ে একত্রে মিশাতে হয়। আটা ও ময়দার মিশ্রণ গামলায় নিয়ে আস্তে আস্তে গরম পানি মেশাতে হয়। ভালোভাবে মিশিয়ে খামির তৈরি করে ছোট ছোট বল নিয়ে পিঁড়িতে বেলে সাধারণ রুটির মতো রুটি তৈরি করতে হয়। অতঃপর তা গরম তাওয়ায় ভেজে নিতে হয়। চাপাতি তৈরির জন্য আরও পাতলা করে রুটি ভেজে নিলেই চাপাতি হয়ে যাবে। এরপর সালাদও চাটনির সাথে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

১১.৫ মিষ্টি আলু থেকে জ্যাম ও মণ্ড :

মিষ্টি আলুর জ্যাম : জ্যাম তৈরির জন্য ১ কেজি মিষ্টি আলু বা ৪ কাপ মিষ্টি আলুর আটা, ১ কেজি গুড় বা চিনি, ১০ গ্রাম (২ চামচ) সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস এবং ৫ গ্রাম (১ চামচ) পেকটিন বা ২৫০ মিলি পেয়ারার রস সংগ্রহ করতে হয়।

মিষ্টি আলু ধুয়ে টুকরা করে পানিতে সিদ্ধ করে নিতে হয়। সিদ্ধ মিষ্টি আলুর টুকরা হাত দিয়ে মেখে বা পাটায় বেটে মণ্ড তৈরি করতে হয়। এরপর মিষ্টি আলুর মণ্ড চিনি বা গুড় ও পেকটিন বা পেয়ারার রস দিতে হয়। রস ঘন হয়ে আসলে সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস মিশিয়ে আরও ৪-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হয়। রিফ্রাক্টোমিটার এর সাহায্যে বিক্স (Brix)-এর মান যদি ৬৩ ডিগ্রি হয় তাহলে বুঝতে হবে জ্যাম তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। অথবা রস যদি পানির মধ্যে জমে যায় তাহলেও বুঝতে হবে জ্যাম তৈরি হয়েছে। চুলা থেকে নামিয়ে ৫ মিনিটের মধ্যে জীবাণুমুক্ত কাচের পাত্রে ঢেলে পাত্রের মুখে গরম মোম ঢেলে ছিপি লাগিয়ে দিতে হয়। এ জ্যাম ১ বছর সংরক্ষণ করা যায়।

মিষ্টি আলুর মণ্ড : মিষ্টি আলুর জেলী তৈরির জন্য ২ কেজি মিষ্টি আলুর রস, ২ কেজি চিনি বা গুড়, ১৫ গ্রাম সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস, ২০ গ্রাম পেকটিন বা পেয়ারার রস, ৩-৫ চা চামচ কমলার রস নিতে হয়। প্রথমে জ্যাম তৈরির ন্যায় মিষ্টি আলুর মণ্ড বা পাল্প (Pulp) তৈরি করতে হয়। পাতলা কাপড় দ্বারা পাল্প ছেঁকে রস আলাদা করতে হয়। এই রসের সাথে চিনি বা গুড় ও পেকটিন মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। তারপর সাইট্রিক এসিড মিশাতে হয়। মণ্ডের ব্রিক্স-এর মান ৬৮ ডিগ্রি না হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে হয়। তারপর সাইট্রিক এসিড মিশাতে হয়। রিফ্রাক্টোমিটার না থাকলে ১ চামচ গরম মণ্ড ১ কাপ ঠাণ্ডা পানিতে দিলে যদি তাড়াতাড়ি জমে যায় তবে বুঝতে

চিত্র : রিফ্র্যাক্টোমিটার

হবে মণ্ড তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। গরম মণ্ড নামিয়ে কমলার রস যোগ করে জীবাণুমুক্ত বোতল বা বৈয়ামে ঢালতে হয়। মণ্ড সেট না হওয়া পর্যন্ত কোনোরূপ নাড়াচাড়া না হয় এরূপ স্থানে রাখতে হয়। জেলি বসে গেলে গরম প্যারাফিন জেলীর উপর দিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দিতে হয়। এই জেলি ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

১১. মিষ্টি আলুর সস, বিস্কুট ও কেক :

মিষ্টির আলুর সসঃ সস তৈরিতে মিষ্টি আলুর শাঁস ১ কেজি, রসুন কুঁচি ৪০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ৫ গ্রাম, আদা কুঁচি ২৫ গ্রাম, মরিচ গুঁড়া-৩০ গ্রাম, গোলমরিচ গুঁড়া ১০ গ্রাম, লবণ ১০ গ্রাম, জিরার গুঁড়া ৮ গ্রাম, ভিনেগার ২৫০ গ্রাম, লবঙ্গ ও দারুচিনি ৬ গ্রাম, পটাশিয়াম মেটাবাইসালফেট ১ চিমটি ও লেবুর রস ৫ মি.লি. প্রয়োজন হয়।

প্রথমে মিষ্টি আলুর মণ্ড তৈরি করে নিতে হয়। হাতাওয়ালা বড় প্যানে মণ্ড জ্বাল দিতে হয়। সমস্ত মশলা ও লবণ একটি পাতলা কাপড়ে নিয়ে পুঁটলি তৈরি করে তা মণ্ডের ভিতর রাখতে হয়। এতে পুঁটলি থেকে মশলার নির্যাস বের হয়ে মণ্ডের সাথে মিশে যায়। এভাবে জ্বাল দিলে রস ঘন হয়। এরপর সসে ভিনেগার দিয়ে মশলার পুঁটলি বের করে নিতে হয়। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে হলে পটাশিয়াম মেটাবাইসালফেট দিতে হয়। জীবাণুমুক্ত বোতলে ঢেলে ভালো করে ক্যাপ বা ঢাকনা লাগাতে হয়। এরপর গরম মোম দিয়ে ক্যাপের চারপাশে বায়ুরোধী করতে হয়। ঠাণ্ডা স্থানে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়। এ সসে ভিটামিন-এ এবং ক্যালরি পাওয়া যায়।

মিষ্টি আলুর বিস্কুট : বেকারিতে গমের ময়দা থেকে যেভাবে বিস্কুট ও কেক তৈরি করা হয় ঠিক একইভাবে মিষ্টি আলুর আটা থেকেও বিস্কুট ও কেক তৈরি করা যায়। মিষ্টি আলুর আটা ৫০ গ্রাম, গমের ময়দা ৫০ গ্রাম, ডালডা ৪০ গ্রাম, মিহি চিনি ৪০ গ্রাম, ডিম ১টি, বেকিং পাউডার ১/৪ চা চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স ১/৪ চা চামচ সহোযোগে বিস্কুট তৈরি করা যায়।

প্রথমে চিনির সাথে ডালডা মিশিয়ে তাতে ডিম ভালো করে ফেটে নিতে হয়। ডালডা, ডিম চিনি ভালোভাবে মিশানো হলে মিষ্টি আলুর আটা, গমের ময়দা আস্তে আস্তে যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বেকিং পাউডার ও ভ্যানিলা মিশিয়ে নিয়ে কাঠের রোলার দিয়ে বেলে পুরু শিট বানাতে হয়। মোটা বিস্কুটের জন্য পুরু শীট এবং পাতলা বিস্কুটের জন্য পুরুত্ব কম রাখতে হয়। শিট তৈরি করে প্রয়োজনমতো ছাঁচের সাহায্যে বিস্কুট কেটে ওভেনে ২০৫°C তাপমাত্রায় ১২-১৫ মিনিট বেক করতে হয়। এভাবে বেকিং করা বিস্কুট আর্দ্রতা রোধক সেলোফিন কাগজে প্যাকিং করে ঠাণ্ডা ও শুকনা স্থানে রাখতে হয়।

মিষ্টি আলুর কেক : কেক তৈরির জন্য মিষ্টি আলুর আটা ২৫০ গ্রাম, গমের ময়দা ২৫০ গ্রাম, ডালডা ৪০০ গ্রাম, মিহি চিনি ৪০০ গ্রাম, ডিম ১০টি, বেকিং পাউডার ১/২ চা চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা চামচ সংগ্রহ করতে হয়।

বিস্কুটের মতোই চিনি, ডালডা ও ডিম ভালোভাবে ফেটে মিশিয়ে নিতে হয়। এর সাথে মিষ্টি আলু ও গমের ময়দা আস্তে আস্তে ঢেলে পানি দিয়ে ভালোভাবে মিশাতে হয়। এরপর বেকিং পাউডার ও ভ্যানিলা মিশাতে হয়। অতঃপর তৈরি খামির কেক তৈরির প্যানে নেয়া হয়। তবে প্যানে গ্রিজড কাগজ দিয়ে নিতে হয়। খামির ভর্তি প্যান ওভেনে ১৮০°C তাপমাত্রায় ৩০-৪০ মিনিট বেকিং করতে হয়। এরপর কেক খাওয়ার উপযোগী হয়।

পাউরুটি তৈরি : মিষ্টি আলুর আটা, গমের ময়দা, ডিম, চিনি, লবণ, ডালডা, শুকনো ইস্ট, পানি সহযোগে পাউরুটি তৈরি করা যায়। প্রচলিত ময়দা থেকে যেভাবে পাউরুটি তৈরি করে মিস্টি আলুর পাউরুটি একই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়।

চিত্র : মিষ্টি আলুর সস, বিস্কুট ও কেক

অনুশীলনী-১১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ফসলের উৎপাদনের দিক দিয়ে বাংলাদেশে মিষ্টি আলুর স্থান কততম ?

২. মিষ্টি আলু কোন পরিবারের অর্ন্তভুক্ত?

৩. মিষ্টি আলু প্রক্রিয়াজত করে কী কী খাবার তৈরি করা যায়?

৪. মিষ্টি আলুর কোন কোন খাদ্য কোরিয়াতে জনপ্রিয়?

৫. মিষ্টি আলুর স্টার্চের মান কী ধরনের?

৬. দক্ষিণ আমেরিকায় মিষ্টি আলু কোথায় ব্যবহার হয়?

৭. মিষ্টি আলুতে ভিটামিন-এ ও সি এর পরিমাণ কত?

৮. মিষ্টি আলু স্বাভাবিক অবস্থায় কতদিন সংরক্ষণ করা যায়?

৯. বারি মিষ্টি আলু-১,২ ও ৩ এর অন্য নামগুলো কী ?

১০. মিষ্টি আলুর কোন জাতে ভিটামিন-এ এর পরিমাণ বেশি?

১১. মিষ্টি আলু থেকে পুরোপুরি ভিটামিন এ পেতে হলে কী করা উচিত?

১২. কতটুকু মিষ্টি আলু খেলে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের ভিটামিন- এ এর চাহিদা পূরন হয়?

১৩. মিষ্টি আলু থেকে কী কী শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যায়?

১৪. ১ কেজি মিষ্টি আলুর আটা তৈরিতে কত কেজি মিষ্টি আলু লাগে?

১৫. মিষ্টি আলুর আটা বায়ুরোধী পাত্রে কতদিন সংরক্ষণ করা যায়?

১৬. ব্রিক্স এর মান কত হলে মিষ্টি আলুর জ্যাম তৈরি সম্পন্ন হয়?

১৭. জ্যাম তৈরির জন্য সাইট্রিক এসিড ও পেকটিনের পরিবর্তে কী কী দেওয়া যায়?

১৮. ব্রিক্স-এর মান কত হলে মিষ্টি আলুর জেলি তৈরি সম্পন্ন হয়?

১৯. রিফ্রাক্টোমিটার ছাড়া জেলি তৈরির সম্পন্ন হয়েছে তা কীভাবে বুঝা যায়?

২০. মিষ্টি আলুর সসে কেন পটাশিয়াম মেটা বাইসালফেট দিতে হয়?

২১. বেকিং করা মিষ্টি আলুর বিস্কুট কীভাবে প্যাকিং করতে হয়?

২২. মিষ্টি আলুর কেক ওভেনে কত তাপমাত্রায় কত সময় বেক করতে হয়?

২৩. কোন খাদ্য তৈরিতে, 'ইস্ট' দিতে হয়?

২৪. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বারি) থেকে এ পর্যন্ত কতগুলো মিষ্টি আলুর জাত বের হয়েছে? ২০২২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মিষ্টি আলুর গুরুত্ব ও পরিচিতি বর্ণনা কর?

২. মিষ্টি আলুর পুষ্টিমান বর্ণনা কর?

৩. তৃপ্তি ও কমলাসুন্দরী মিষ্টি আলু জাতের বৈশিষ্ট্য লেখ?

৪. মিষ্টি আলু সিদ্ধ ও ঝলসানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর?

৫. মিষ্টি আলুর আটা বা ময়দা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৬. মিষ্টি আলুর সস তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর?

৭. মিষ্টি আলুর রুটি ও চাপাতি তৈরি পদ্ধতি লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. মিষ্টি আলুর গুরুত্ব, পরিচিতি ও পুষ্টিমান উল্লেখ কর।

২. মিষ্টি আলু থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যের নামের তালিকা লেখ।

৩. মিষ্টি আলুর ময়দা, চিপস ও রুটি তৈরি পদ্ধতি লেখ।

৪. মিষ্টি আলুর জ্যাম ও জেলি তৈরির পদ্ধতি লেখ।

৫. মিষ্টি আলু থেকে কীভাবে সস, বিস্কুট ও কেক তৈরি হয় তা বর্ণনা কর।

১. ধান মিলিং-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতির পরিচিতি ও শণাক্তকরণ :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ধান মিলিং বা ধান ভাঙানো বলতে ধান থেকে তুষ আলাদা করাকে বোঝায়। ধান থেকে চাল বের করার জন্য যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাকে ধান মিলিং যন্ত্রপাতি বলে। ধান বীজ বা দানা জাতীয় শস্যদানাকে খোসা ছাড়িয়ে খাওয়ার উপযোগী করাকে আধুনিক ভাষায় এক কথায় মিলিং বলে। ধান থেকে তুষ ছাড়ানো, কুঁড়া পরিষ্কার করা, বাছাই করা, আলাদা করা, চাল চকচকে করা, চাল পাতলাকরণ ইত্যাদি সকল প্রক্রিয়াই মিলিং। ধান মিলিং যন্ত্রপাতি দুই ধরনের। যথা :

(১) দেশি যন্ত্রপাতি : যেমন- (ক) গাইল ও সিয়া (খ) ঢেঁকি

(২) আধুনিক যন্ত্রপাতি : যেমন-

- (ক) রাবার হলার : রাবার হলার আবার দুই ধরনের-
  - (১) রাবার হলার (২) ফ্রিকশান রোলার
- (খ) কুঁড়া ছাড়ানো যন্ত্র বা উইনোয়ার
- (গ) তুষ ছাড়ানো যন্ত্র
- (ঘ) ধান পরিষ্কারক যন্ত্র
- (ঙ) চালে মিশ্রিত অপদ্রব্য পরিষ্কারক যন্ত্র
- (চ) চাল সাদাকরণ যন্ত্র
- (ছ) চাল সরুকরণ যন্ত্র
- (জ) রাইস মিলিং প্লান্ট ইত্যাদি।

নিম্নে এ যন্ত্রগুলোর চিত্র দেয়া হলো :

চিত্রঃ খুঁটি ও আঁটি দানা আলাদাকরণ যন্ত্র

চিত্রঃ ধান পরিষ্কারক যন্ত্র

চিত্র : তুঁষা ছাড়ানো মেশিন

চিত্র : চালের তুষ ছাড়ানো যন্ত্র

ধান মিলিং-এর বিভিন্ন আধুনিক মেশিনগুলো সম্পর্কে পরিচিতি লাভ ও শনাক্ত করার জন্য নিম্লোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. মিলিং-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনগুলো স্থানীয় ধান কল বা চালের মিলে যেয়ে শনাক্ত করতে হবে।

২. সকল যন্ত্রপাতির চিত্র ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন করতে হবে।

৩. যন্ত্রপাতির ছবি লেবেলিং করতে হবে।

৪. যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৫. যন্ত্রগুলো দেশীয় না আমদানি করা তা শনাক্ত করতে হবে।

৬. মেশিনের কাজের ক্ষমতা জানতে পারবে।

সতর্কতা :

(১) শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে মেশিন পর্যবেক্ষণ করবেন। কাছে যাবে না।

(২) সবসময় শিক্ষক/গাইড/দক্ষ মেকানিক সাথে থাকতে হবে।

(৩) মেশিনের ভিতর কোনো কিছু প্রবেশ করাবে না।

(৪) চলন্ত মেশিনে হাত দেবে না।

২. গোলাজাত ধান, চাল, ডাল, আলু ইত্যাদির ক্ষতিকারক পোকার পরিচিতি ও দমন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : গুদামজাত শস্যে পাঁচ ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণি আক্রমণ করে। যথা : ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, মাকড়, পোকা বা কীট, ইদুঁর ইত্যাদি। এদের আক্রমণে বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। গুদামজাত বীজের ক্ষতিকারক প্রাণিকুলের মধ্যে কীটপতঙ্গের আক্রমণই প্রধান। গুদামজাত সকল শস্য দানাকে যেমন- ধান, চাল, গম, ডাল, ভুট্টা, যব, শুকনো ফল, আলু, বিস্কুট ইত্যাদি পণ্যকে বিভিন্ন ধরনের পোকা আক্রমণ করে থাকে। সাধারণত মথ ও বিটল শ্রেণির পোকাই গুদামজাত দানার বিশেষ ক্ষতি করে থাকে। যে সকল পোকা বেশি ক্ষতি করে তাকে মুখ্য পোকা বলে। তবে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে গৌণ পোকাও মুখ্য পোকায় পরিণত হতে পারে। নিম্নে ধান ও চালের আক্রমণকারী পোকার নাম দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	পোকার নাম	ইংরেজী নাম	কোনো শস্যের ক্ষতি করে	পোকার অবস্থান
১	ধানের শুঁড় পোকা	Rice Weevil	ধান, চাল, গম, ভুট্টা	মুখ্য পোকা
২	কেড়ি পোকা	Lesser grain borer	ধান ও গম	মুখ্য পোকা
৩	শুসরী পোকা	Saw toothed grain beetle	চাল, ধান, গম, যব বীজ	মুখ্য পোকা
৪	লাল শুসরী পোকা	Red grain beetle	ধান ও চাল, আটা	মুখ্য পোকা
৫	খাপড়া বিটল	Khapra beetle	ধান, গম, ভুট্টা	মুখ্য পোকা
৬	বাদামি বিটল	Brown beetle	চালের কুঁড়া, ভাঙ্গা দানা	গৌণ পোকা
৭	লেসার কেড়ি পোকা	Lesser meal worm	চাল ও গম	গৌণ পোকা
৮	চ্যাপ্টা বিটল	Flat grain beetle	চাল, গম ও ভুট্টা	গৌণ পোকা
৯	ধানের সুরুই পোকা	Rice Moth	ধান, গম ও ভুট্টা	মুখ্য পোকা
১০	চালের সুরুই পোকা	Rice meal Moth	চাল ও অন্য দানা শস্য	মুখ্য পোকা
১১	ডালের বিটল পোকা	Pulse beetle	ডাল শস্য	গৌণ পোকা
১২	আলুর সুতলি পোকা	Potato tuber worm	আলু	গৌণ পোকা

নের শুড় পোকা

কেড়ি পোকা

লাল শুসুরী পোকা

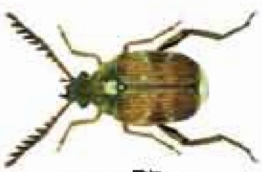
খাপড়া বিটল

ধানের সরু পোকা

সরু পোকা

চিত্র : বিভিন্ন পোকার ছবি

উপকরণ : পোকার নমুনা, চিত্র, কাগজ, কলম, রাবার।

ক্ষতিকারক পোকার পরিচিতি ও দমন জানতে হলে নিম্নের ধাপগুলোর কাজ অনুসরণ করতে হবে।

(১) পোকার নমুনা ও আক্রান্ত শস্যদানা ও ক্ষতিগ্রস্ত গুদামজাত নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

(২) পোকার নমুনা কলেজ বা স্কুলের পেস্ট মিউজিয়াম থেকে বা গুদাম ঘরে পাওয়া যাবে।

(৩) নমুনা সংগ্রহ ও পরিষ্কার করে তা পর্যবেক্ষণ করে শনাক্ত করতে হবে।

(৪) ক্ষতির প্রকৃতি (তাত্ত্বিক অংশে বর্ণনা আছে) পর্যবেক্ষণ করে তা খাতায় লিখতে হবে।

(৫) পোকার দমন ব্যবস্থা (তাত্ত্বিক অংশে বর্ণনা আছে) অনুশীলন করতে হবে।

(৬) পোকার চিত্র ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন করে তা শিক্ষককে দেখাতে হবে।

(৭) প্রয়োজনে শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে নিকটস্থ চাল বা ধান গুদামজাত মিল বা সাইলোর কার্যক্রম দেখিয়ে আনতে পারেন।

সতর্কতা :

(১) পোকার নমুনা গুলো খুব সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে যাতে কোনো ক্ষতি না হয়।

(২) পোকাগুলোর আকার-আকৃতি প্রায় একই রকম তাই পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষক ভালো করে ব্যাখ্যা করবেন।

৩. ধান থেকে চিড়া,খৈ ও ভুট্টার খৈ তৈরি অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : চিড়া ও খৈ আমাদের জীবনে একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। গ্রামে-গঞ্জে এখনও অতিথি আপ্যায়নে দই, চিড়া ও খৈ-এর তুলনা নেই। বর্ষাবাদলের দিনে চিড়া, খৈ ও কলা দিয়ে মজা করে খাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের ফাস্টফুডের জীবনে চিড়া, মুড়ি ও খৈ-এর প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে। সেজন্য চিড়া, মুড়ি ও খৈ কে আরও আকর্ষণীয় প্যাকেটজাত করে উপস্থাপন করলে হয়তো চিড়া, মুড়ি ও খৈ-এর জনপ্রিয়তা ধরে রাখা যাবে।

চিত্র : চিড়া

চিত্র : খৈ

ক) চিড়া তৈরি (গ্রামীণ পদ্ধতি)

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উপাদান

১. ধান	৭. চালুনি বা ডালা
২. ধান ভাজার বড় মুখওয়ালা মাটির পাতিল	৮. ঢেঁকির গর্তে ধান নাড়ার জন্য শক্ত ছোট কাঠি
৩. পাতিল ধরার লুছনি	৯. চিড়া ঝাড়ার পাত্র
৪. শলার ঝাঁটা বা কাঠি	১০. চিড়া রাখার পাত্র
৫. ধান ভিজানোর ড্রাম বা চাড়ি	১১. পানি
৬. ঢেঁকি বা চিড়ার কল	১২. ১০ কেজি ধান

চিড়া তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. মুড়ির মতো প্রথমে ধান অল্প সিদ্ধ করে নিতে হবে।

২. সারারাত ধান ভিজিয়ে রেখে সকালে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

৩. চুলায় গরম পাতিলে দুই হাত এক করে পানি ঝরানো ধান ঢেলে দিতে হবে।

৪. এই ধান 250°C-270°C তাপমাত্রায় ভাজার সময় শলার কাঠি দিয়ে তাড়াতাড়ি নাড়াচাড়া করতে হবে।

২০২২

৫. ধানের গায়ের পানি শুকিয়ে ২/১টি ধান পুটপুট শব্দ করলেই চুলা থেকে নামিয়ে ঢেঁকিতে পাড় বা আঘাত করতে হবে।

৬. ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার সময় পাশ দিয়ে কাঠির সাহায্যে বা হাত দিয়ে ঢেঁকির আঘাতে চ্যাপ্টা হওয়া ধান নাড়াচাড়া করে উল্টে পাল্টে দিতে হবে।

৭. কিছুক্ষণ পাড় দেওয়ার পর ধানের তুষগুলো গুঁড়ো ও চালগুলো চ্যাপ্টা হয়ে চিড়া তৈরি হবে।

৮. চিড়া তৈরি হলে তা উঠিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে ঠাণ্ডা করে বাজারজাত করতে হবে।

সর্তকতা :

১. ধান সঠিক সিদ্ধ হয়েছে কী না তা খেয়াল রাখতে হবে।

২. ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে।

খ) খৈ তৈরি প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. ধান

২. বালু

৩. বালি ঝাড়ার ঝাঁঝড়ি

৪. শলার ঝাঁটা বা কাঠি

৫. মাটির পাতিল বা কড়াই

৬. চিমটা বা বাউলি ও হাতাওয়ালা ছিদ্রযুক্ত বড় চামচ

৭. নিক্তি

৮. চালুনি

৯. থার্মোমিটার

১০. ডালা বা সসপ্যান

১১. সিলিং মেশিন

উপাদান : ধান ১০ কেজি, বালু (মোটা) ৩-৪ কেজি

খৈ তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. খৈ তৈরির ধান ঝেড়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে।

২. কড়াই বা পাতিলে বালু নিয়ে গরম করতে হবে। বালুর তাপমাত্রা যখন 250°C-270°C হবে তখন ২৫০ গ্রাম ধান বালুর উপর ছড়িয়ে দিতে হবে।

৩. ধান দেয়ার সাথে সাথে শলার ঝাঁটা দিয়ে তাড়াতাড়ি নাড়াচাড়া করতে হবে।

৪. গরম বালুর সংস্পর্শে এসে সব ধান ফুটে খৈ তৈরি হবে এবং ধানের খোসা আলাদা হয়ে যাবে।

৫. ছিদ্রযুক্ত বড় হাতাওয়ালা চামচ দিয়ে বালুর উপর থেকে খৈ সহ ধানের খোসা দ্রুত তুলে চালুনির উপর রেখে ঝাঁকাতে হবে। এর ফলে খৈ-এর খোসা, ময়লা বালু নিচে পড়ে খৈ পরিষ্কার হবে।

৬. ভাজা খৈ ঠাণ্ডা করে বাজারজাত করতে হবে।

সর্তকতা

১. বালু সঠিক গরম হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সর্তক থেকে হবে।

২. খৈ এ কোনো খোসা বা বালু থাকবে না।

২০২২

আধুনিক পদ্ধতিতে মেশিনে ভুট্টার খৈ তৈরি পর্যবেক্ষণ ঃ

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ভুট্টার খৈ বর্তমানে পপকর্ন (Popcorn) হিসেবে যথেষ্ঠ পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে শহর বন্দরে রাস্তা-ঘাটে, লঞ্চে, রেলে, ভ্যানে সব জায়গায়ই না গরম গরম ভুট্টার খৈ বিক্রি হচ্ছে।

উপকরণ : খৈ ভুট্টা বীজ ১৫০ গ্রাম, তেল ১২০ গ্রাম,লবণ- পরিমাণমতো, কড়াই,চুলা, চামচ, পলিব্যাগ ইত্যাদি।

ভুট্টার খৈ তৈরি করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরন করতে হবে-

১) প্রথমে খৈ ভুট্টার দানা ধুয়ে নিতে হবে এবং দানার ১৪-১৫% আর্দ্রতা আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

২) এরূপ খৈ সর্বাধিক ফুলে ওঠে।

৩) বড় থালা বিশিষ্ট পাত্রে সবটুকু তেল দিয়ে ধোঁয়া না ওঠা পর্যন্ত গরম করতে হবে।

৪) এরপর সব ভুট্টার দানা ছেড়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

৫) দ্রুত খৈ ফুটতে শুরু হলে তাড়াতাড়ি পাত্রটি হ্যান্ডেলের সাহায্যে চতুর্দিকে ঘুরাতে হবে।

৬) খৈ ভুট্টার শব্দ বন্ধ না হওয় পর্যন্ত যন্ত্রটি ঘুরাতে হবে।

৭) প্রয়োজন মতো লবণ দিয়ে পলি প্যাক বাজারজাত করতে হবে।

৮) ভ্যানে অটোমেটিক গ্যাস চুলা দ্বারা সুন্দরভাবে ভুট্টা ভেজে প্যাক করে শহরের অলিগলিতে বিক্রি করে থাকে।

৪. ধান থেকে মুড়ি তৈরি অনুশীলন :

দেশীয় পদ্ধতিতে মুড়ি তৈরি : চাল থেকে যত খাদ্য উৎপন্ন হয় তার মধ্যে মুড়ি অন্যতম। মুড়ি একটি মজাদার ও পুষ্টিকর খাবার। মুড়ির পুষ্টিমান চালের মতোই। মুড়ি থেকে মোয়া, মুড়কি, ঝালমুড়ি, মিষ্টি মুড়ি ইত্যাদি খাবার তৈরি করা যায়।

উপকরণ

১. মালা, বিরই বা দেশি আমন ধান	১২. লবণ, বালু ও পাটখড়ি
২. চাল ভাজার জন্য মাটির মাঝারি পাতিল	১৩. ঢেঁকি বা চাল কল
৩. বালি উত্তপ্ত করার জন্য মাটির বড় মুখওয়ালা পাতিল	১৪. চুলা
৪. মুড়ি ভাজার ঝাঁঝরি	১৫. পাল্লা বা নিক্তি
৫. চাল নাড়ার জন্য কাঠি	১৬. কুলা
৬. ধান ভিজানেরা ড্রাম বা চাড়ি	১৭. চামচ
৭. লবণ দ্রবণ তৈরির পাত্র	১৮. পলিথিন ব্যাগ
৮. ধান সিদ্ধ করার বড় পাত্র বা সসপ্যান	১৯. সিলিং মেশিন
৯. লোহার চিমটা বা বাউলি	২০. থার্মোমিটার
১০. মুড়ি রাখার পাত্র	২১. টিনের কৌটা
১১. পানি ঝড়ানোর ডালা	

উপাদান

১. ১০ কেজি ধান

২. ৭৫ গ্রাম লবণ

৩. ৩-৪ কেজি শুকনা বালু

৪. ধান ভিজানো, সিদ্ধ ও লবণের দ্রবণের জন্য পানি।

মুড়ি তৈরি করার জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১) পরিপক্ব ও রোগমুক্ত ধান পরিষ্কার করে নিতে হবে।

২) ধানকে দুই পর্যায়ে সিদ্ধ করতে হবে প্রথমে বড় পাত্র বা সসপ্যানে ধান নিয়ে কিছু বেশি পরিমাণ পানি দিয়ে $70^{\circ}C$ তাপমাত্রায় ২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে।

৩) ধান ২০ মিনিট পর্যন্ত অল্প সিদ্ধ করে চুলা থেকে নামিয়ে গরম পানিসহ ১২ ঘন্টা বা ১ রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৪) ভিজানো ধানের পানি ঝরিয়ে আবারও অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে ধান ফেটে যাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হবে।

৫) সিদ্ধ ধান চুলা থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে ৩-৪ ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে ছায়ায় ঠাণ্ডা করতে হবে।

৬) পরদিন ধান এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে ধানের আর্দ্রতা ২০% এ নেমে আসে। পরীক্ষার জন্য ধানের চাল বের করে চিবুলে শক্ত ও মৃদু কট শব্দ হবে।

৭) এরপর শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে ঢেঁকিতে বা কলে ভেঙে মুড়ির চাল তৈরি করতে হবে।

৮) মুড়ি তৈরির জন্য দুই চুলায় একসাথে চাল ও বালু গরম করতে হবে। বড় মুখওয়ালা মাটির ছোট পাতিলে ৫০০ গ্রাম চাল এবং বড় পাতিলে প্রায় ১.৫-২ কেজি বালু নিতে হবে। চাল গরম করার সময় চালের সাথে ১ টেবিল চামচ লবণ দ্রবণ (৩০% লবণ ও ৭০% পানি) মিশাতে হবে।

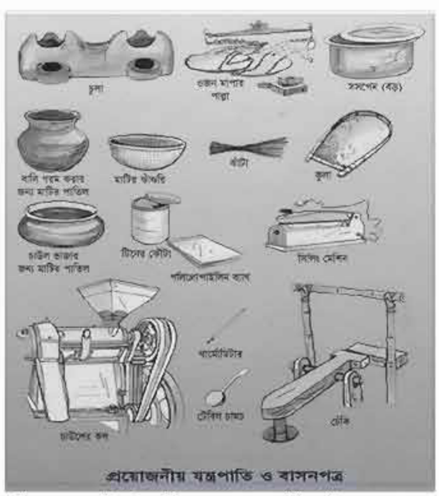

চিত্র : মুড়ি তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ।

২০২২

৯) লবণ মিশানোর সাথে সাথে চাল ঘন ঘন নাড়তে হবে। যাতে সমস্ত চালের সাথে লবণ পানি মিশে যায় এবং চাল সমভাবে ভাজা হয়।

১০) বালু ঠিকমতো গরম হয়েছে কিনা তা পাটখড়ি দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। এজন্য একটি পাটখড়ি গরম বালুতে চেপে ধরলে সামান্য ধোঁয়া উঠবে এবং খড়ির আগা কালচে হবে। এরূপ অবস্থা হলে বুঝতে হবে যে বালির তাপমাত্রা 250°C-270°C হয়েছে।

১১) চাল ২/১টি ফুটে উঠলে অন্য পাত্রের বালুতে চাল ঢেলে ঘন ঘন নাড়তে হবে।

১২) গরম বালির মধ্যে সমস্ত চাল দেওয়ার পর মুহূর্তের মধ্যে চাল ফুটে মুড়ি তৈরি হবে। তারপর বালুসহ মুড়ি ঝাঁঝারিতে ঢেলে শলার ঝাটার সাহায্যে নাড়াচাড়া করে বালি পরিষ্কার করতে হবে।

১৩) ঝাঝরি একটু ঝাঁকি দিলে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সমস্ত বালু নিচে পড়ে যাবে। তারপর এ মুড়ি গামলায় নিয়ে ঠাণ্ডা করে পলিব্যাগে প্যাকেট করে বাজারজাত করতে হবে।

আধুনিক পদ্ধতি : মেশিনে মুড়ি তৈরি পর্যবেক্ষণ ও কারখানা পরিদর্শন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মুড়ি তৈরির কারখানা দুইটি অংশে বিভক্ত থাকে। যথা ডায়াল ও রোস্টার।

ডায়ালে প্রায় ১৫টি বড় বড় পাতিল একিট লৌহদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। হাতলের মাধ্যমে এ পাতিলগুলো ঘুরানো যায় এবং এতে গ্যাস লাইনের চুলা সংযুক্ত থাকে।

মুড়ি তৈরির পদ্ধতি :

১) প্রথমে প্রতিটি পাতিলে ৫০ কেজি বা এক বস্তা করে মুড়ি তৈরির চাল ঢালা হয়।

২) ১টি মগে এক লিটার লবণ পানি তৈরি করা হয়।

৩) প্রথমে ১৫ মিনিট এই লবণ পানি ঘুরন্ত হাতলের মাধ্যমে ১৫টি পাতিলে দিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হয়।

৪) পরবর্তী ৪৫ মিনিট হাতলের সাহায্যে লবণ পানি ও চাল ভাল করে মিশানো হয়।

৫) ১ ঘন্টা পর চাল মুড়ি হওয়ার উপযোগী হলে তা ছোট বলে করে উঠিয়ে রোস্টারের ভিতর দিতে হয়।

৬) ১ মিনিটে রোষ্টারের মধ্যে মুড়ি তৈরি হয়ে যায়।

৭) বের হবার সময় মুড়ি ও বালু আলাদা আলাদা দুই জায়গায় পতিত হয়।

৮) এভাবে ১৫X৫০= ৭৫০ কেজি মুড়ি অতি অল্প সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব।(১৫টি ডায়ালের প্রতিটিতে ৫০ কেজি করে মোট ৭৫০ কেজি)

সর্তকতা

১) বালু গরম হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে নিশ্চিত থেকে হবে।

২) মুড়িতে যেন বালু না থাকে তা লক্ষ্য করতে হবে।

৫. মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরি অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মুড়িকে গুড়ের রস জ্বাল দিয়ে মেখে গোল করাকেই মোয়া বলে। চিড়ার ও একই ভাবে মোয়া বানানো যায়। চিড়া ও মুড়ির মোয়া একসময় ঘরে গৃহিণীরা তৈরি করতো। এখন বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হয়। মুড়ি প্রস্তুতকারী ব্যাবসায়ীরা মেশিনে মুড়ি তৈরি করে এবং মোয়াও বানিয়ে থাকে। ফেরিওয়ালারা

২০২২

মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। গ্রামের গরিব দিনমজুর এবং শহরের রিক্সাওয়ালা ও নির্মাণ শ্রমিক এবং অন্যান্য নিম্ন আয়ের কর্মীরা রাস্তার পাশে হোটেলে বসে চা ও চিড়ার এবং মুড়ির মোয়া খেয়ে তৃপ্তি পেয়ে থাকেন।

চিত্র : মুড়ির মোয়া

মুড়ির মোয়া তৈরি :

উপকরণ : মুড়ি, গুড় বা চিনি, পাতিল, নাড়নি, তেল ইত্যাদি।

মুড়ির মোয়া তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. সুন্দরভাবে ভাজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ৫০০ গ্রাম মুড়ি নিতে হবে।
২. চুলায় ২৫০ গ্রাম গুড় বা চিনি ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
৩. সিরা একটু ঘন হয়ে এলে তাতে মুড়ি ঢেলে দিতে হবে।
৪. নাড়নি দিয়ে দ্রুত নাড়তে হবে।
৫. গরম অবস্থায় চুলা হতে একটি পাত্রে নামাতে হবে।
৬. হাতে তেল মাখিয়ে গরম থাকাবস্থায় গোল করে মোয়া গড়ে নিতে হবে।
৭. বায়ুরোধী পাত্র বা পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে।

সতর্কতা :

১. গুড়ে বা চিনিতে পাকানো চিড়া ও মুড়ি ঠান্ডা হলে মোয়া বানানো যাবে না।

চিড়ার মোয়া তৈরি :

উপকরণ : চিড়া, গুড় বা চিনি, পাতিল, কড়াই, নাড়নি, তেল ইত্যাদি।

চিড়ার মোয়া তৈরির জন্য নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :

চিড়ার মোয়া বানানোর জন্য প্রথমে চিড়াকে কড়াই বা তাওয়ায় ভালভাবে ৫-১০ মিনিট ভেজে নিতে হবে। তারপর পাতিলে গুড় ও পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। গুড়ের সিরা ঘন হয়ে এলে তাতে চিড়া ঢেলে হাতল দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নামানো হয়। অতঃপর মুড়ির মোয়ার মতো করে চিড়ার মোয়া গড়ে নিতে হয়।

চিত্র: চিড়ার মোয়া

৬. আতপচালের গুঁড়ি তৈরি ও গুড়ি হতে বিভিন্ন পিঠা তৈরি :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : পিঠা তৈরির প্রধান উপাদানই হলো আতপ চালের গুঁড়ি বা আটা। চাল মেশিনে ভাঙিয়ে এই গুঁড়ি তৈরি করা হয়। কিন্তু মেশিনের ভাঙানো গুঁড়ি দিয়ে ভালো পিঠা হয় না। দোকান থেকে কেনা শুকানো কিংবা বাসি গুঁড়িতেও পিঠার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রতিদিনই চাল গুঁড়ি করে নিতে হয়। ঢেঁকি দিয়ে চাল গুঁড়ি করলে সবচেয়ে ভালো পিঠা তৈরি হয়। শিল-পাটায় গুঁড়ি করলেও ভালো হয়। এই গুঁড়ি শুকিয়ে পানির পরিমাণ ৯% বা তার কম নিয়ে আসলে ৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

ক) আতপ চালের গুঁড়ি তৈরি :

উপকরণ : আতপ চাল, শিলপাটা, পানি।

গুঁড়ি তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. উন্নতমানের পরিষ্কার ১ কেজি আতপ চাল সংগ্রহ করতে হবে।

২. উক্ত চাল পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজানোর পর পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

৩. শিলপাটায় অল্প অল্প করে বেটে আতপ চালের গুঁড়ি তৈরি করা যাবে। মেশিনেও গুঁড়ি করা যায়, সেক্ষেত্রে ভিজানোর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র চাল ধুয়ে তাৎক্ষনিকভাবে মেশিনে গুড়ি তৈরি করা যাবে।

৪. গুঁড়ি ঠাণ্ডা করে প্যাকেট করে সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) ভাপা পিঠা তৈরি :

উপকরণ : চালের গুঁড়া-১ কেজি, পাটালী গুড়-২৫০ গ্রাম, দুধ-২০০ মিলি., লবণ-১৫ গ্রাম, নারিকেল-১টি, ভাতের হাঁড়ি-১টি, ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা-১টি, গুঁড়ি চালনি-১টি, বাঁশের চালুনি, শিল-পাটা-১টি, ছোট বাটি-২টি, পাতলা কাপড়-১ খণ্ড, মাটির সরা-১টি।

পিঠা তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. চালের গুঁড়ি সংগ্রহ করতে হবে। ভাপা পিঠা ও পাটিসাপটা পিঠার জন্য মেশিনের গুঁড়ির চেয়ে শিল-পাটার বাটা গুঁড়ি হলে ভালো হয়।

২. হাঁড়িতে চার ভাগের তিন ভাগ পানি নিয়ে চুলায় চড়াতে হবে।

৩. চালের গুঁড়ির সাথে লবণ, দুধ ভালোভাবে মিশিয়ে চালুনিতে চেলে নিতে হবে।

৪. হাঁড়ির মুখে ঢাকনা বা সরা (মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত) দিয়ে ঢেকে দিয়ে চতুর্দিকের মুখ আটা বা ময়দা গুলিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এতে করে হাঁড়ির বাষ্প চারদিক দিয়ে বের না হয়ে মাঝের ছিদ্রপথে বের হবে।

৫. ছোট বাটিতে অর্ধেক চালের গুঁড়ি দিয়ে তার উপর কোরানো নারিকেল ও পাটালি গুড়ের কিছু টুকরো দিয়ে পুনরায় চালের গুঁড়ি দিয়ে বাটি ভরতে হবে।

৬. পাতলা ভেজা কাপড় দিয়ে বাটি ঢেকে হাঁড়ির উপর মাটির ঢাকনার মাঝের ছিদ্রপথের উপর উল্টো করে বসাতে হবে।

৭. খুব সাবধানে উল্টানো বাটি সরিয়ে পিঠাটি পাতলা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে।

৮. তারপর একটি বড় সরা বা ঢাকনা দিয়ে সম্পূর্ণটা ঢেকে দিতে হবে।

৯. ৫ মিনিট পর কাপড়সহ পিঠা তুলে আনতে হবে। পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কি না হাতের আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করা যাবে।

১০. এভাবে পিঠা তৈরি করে গরম অবস্থায় পরিবেশন করতে হবে।

২০২২

সতর্কতা :

১. হাঁড়ির উপর পিঠা এমনভাবে বসাতে হবে যাতে ভেঙে না যায়।

২. পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নামাতে হবে।

গ) পাটি সাপটা পিঠা তৈরি :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : পিঠার কথা লিখতে গেলে প্রথমেই যার নাম আসে সেটি পাটিসাপটা। পাটির মতো পেচিয়ে বানানো হয় বলে একে পাটিসাপটা পিঠা বলে। পাটির ভিতরে যে পুর দেয়া হয় তার উপর নির্ভর করে পিঠার দাম ধরা হয়। শীতকালে এ পিঠাটি খুবই চলে। ইদানীং এটি শহরের মিষ্টান্ন দোকানের মাঝে পেতা পায়

চিত্র : পাটিসাপটা পিঠা।

উপকরণ : আতপচালের গুঁড়া, বেকিং পাউডার, দুধ, চিনি, ক্ষীরসা, এলাচ গুঁড়া, ঘি, সয়াবিন তেল, কড়াই, গোল চামচ, পাত্র, ছুরি ও পানি।

পিঠা তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. পিঠা তৈরির উপকরণগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে।

২. ৭৫০ গ্রাম চালের গুঁড়ি ২৫০ মি.লি. পানি, সামান্য বেকিং পাউডার, ৫০ গ্রাম চিনি ও ৫০ মি.লি. দুধ মিশিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে পিঠা তৈরির গোলা তৈরি করতে হবে।

৩. এরপর একটি পাত্রে ক্ষীরসা নিয়ে তাতে চিনি ও এলাচ গুঁড়া ও ২ চামচ ঘি দিয়ে নেড়েচেড়ে গরম করে নিতে হবে।

৪. রুটির গোলা চামচ দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে হবে যাতে জমে না যায়।

৫. চুলায় তাওয়া বা কড়াই গরম হলে তেলের পোচ দিয়ে নিতে হবে।

৬. আধা কাপ গোলা নিয়ে নিয়ে কড়াইতে ঢেলে দিয়ে কড়াই ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ লেপটে দিতে হবে।

৭. গোলার উপরিভাগ শক্ত হয়ে এলে রুটির এক প্রান্তে ক্ষীরসার দিয়ে ডিমের অমলেটের মতো বা পার্টির মতো পেঁচিয়ে দিতে হবে।

৮. সামান্য তেলে ভেজে তুলতে হবে।

৯. প্রতিবার নতুন পিঠা তৈরির পূর্বে কড়াইতে তেল লাগিয়ে নিতে হবে। ক্ষীরসার পরিবর্তে নারিকেল কুঁরিয়ে পাটালি গুড়ের মিশ্রিত কোরা দেয়া যায়।

৮. ছোলা ও খেসারি ডাল হতে বেসন তৈরি :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : খাবার ঘন করার একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে বেসন। বেসন ছাড়াও ময়দা, এরারুট বা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে খাবার ঘন করা যায়। চুলা থেকে খাবার নামাবার পূর্বে এসব উপকরণ পানিতে গুলে খাবারে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাড়তে হয়। ফুটে ওঠার পরপরই নামিয়ে নিলে খাবার ঘন ও মসৃণ হয়। বেসন দিয়ে ডালের বড়া, বেগুনি পাকোড়া ইত্যাদি তৈরি করা যায়। ডালমুটের মধ্যে বেসনের তৈরি বুন্দিয়া, ঝুরি, গাঠিয়া মিশানো হয়ে থাকে। চানাচুর তৈরিতেও বেসনের গাঠিয়া, চিকন ও মোটা ঝুরি ও বুন্দিয়া তৈরি করা হয়।

উপাদান ও সহায়ক উপকরণ : ছোলা/খেসারি ডাল, কুলা, যাঁতা, গম ভাঙানোর মেশিন।

চিত্র : আস্ত ছোলা

চিত্র : বেসন

বেসন তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. পরিপুষ্ট, অক্ষত ছোলা বা খেসারি ডাল বাছাই করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

২. কুলা দিয়ে ঝেড়ে ছোলা বা খেসারির ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হবে।

৩. পাথরের যাঁতায় ছোলার বা খেসারির খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে।

৪. গম ভাঙানোর মেশিনে ছোলা বা খেসারির ডাল ভাঙাতে হবে। মিলে ভাঙানোর ফলে ছোলা হতে পাউডার বা ময়দা তৈরি হবে। একে বেসন বলে।

৫. এই বেসন পলিথিন বা চটের বস্তায় মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে ১ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

৬. এই বেসন হতে বেগুনি, পিঁয়াজু বিভিন্ন ধরনের ফ্রাই তৈরি করা যায়।

সতর্কতা :

১. ডাল উন্নত মানের না হলে ভালো বেসন হবে না।

২. সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে বেসনে পোকা ধরবে।

৮: মুগাঙ্কুর তৈরি করা অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মুগাঙ্কুর মুগডাল হতে উৎপাদিত একটি উৎকৃষ্ট সবজি। মুগাঙ্কুর আমাদের খাদ্যে শর্করা, আমিষ, খনিজ যোগানসহ প্রচুর ভিটামিন সি সরবরাহ করে। চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, তাইওয়ানসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এটি একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রীষ্মে ও বর্ষায় সবজির ঘাটতি দেখা যায়। এক্ষেত্রে মুগ বীজ হতে মাশরুমের মতো ঘরে তৈরি মুগাঙ্কুর সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশের জনসাধারণের খাদ্যাভাস পরিবর্তনের সাথে সাথে 'মুগাঙ্কুর' একটি রপ্তানিমুখী বাণিজ্য সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপাদান ও সহায়ক উপকরণ :

১. মুগবীজ
২. চালনি
৩. চওড়া মুখওয়ালা মাটির পাত্র
৪. ক্যালসিয়াম হাইপো ক্লোরাইড
৫. পরিষ্কার কাপড়
৬. বড় ড্রাম ইত্যাদি।

মুগাঙ্কুর তৈরি করার জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. মাঝারি ধরনের মসৃণ খোসাযুক্ত বীজ মুগাঙ্কুরের জন্য নিতে হবে।

২. বীজগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৩. পানি ঝরানো মুগ মাটির পাত্রে ছড়ায়ে দিতে হবে। বীজ বেশি ঘন করে দেওয়া যাবে না। তাই পাত্রের তলদেশে ২-৩ স্তর করে বীজ ছড়াতে হবে।

৪. পাত্রে বীজ রাখার পর ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৩-৪ ঘণ্টা এবং শীতকালে ৬-৭ ঘণ্টা পরপর হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে কাপড় ভিজিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে অঙ্কুর যেন শুকিয়ে না যায়।

৫. অঙ্কুরিত বীজকে ছত্রাকমুক্ত রখার জন্য ১২ লিটার পানিতে ১ চা চামচ ক্যালসিয়াম হাইপো ক্লোরাইড মিশিয়ে প্রতি রাত ভিজা কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ৭-৮ দিন পর অঙ্কুরিত মুগবীজ ৮-৯ সে.মি. লম্বা খাবার উপযোগী হবে।

৬. অঙ্কুরিত মুগবীজ তুলে বড় ড্রামে পানির মধ্যে খুব সাবধানে খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৭. অঙ্কুরিত মুগবীজের মান বেশি সময় বজায় রাখার জন্য হালকা গরম পানিতে ৩-৪ মিনিট ব্লানচিং করে নিতে হবে।

৮. এভাবে প্রাপ্ত মুগাঙ্কুর দিয়ে সালাদ ও সবজি হিসেবে বিভিন্ন খাবারের সাথে খাওয়া যায়।

চিত্র : মুগাঙ্কুর

মুগাঙ্কুর তৈরির ফ্লো-চার্ট

মুগাঙ্কুর তৈরির ফ্লো-চার্ট

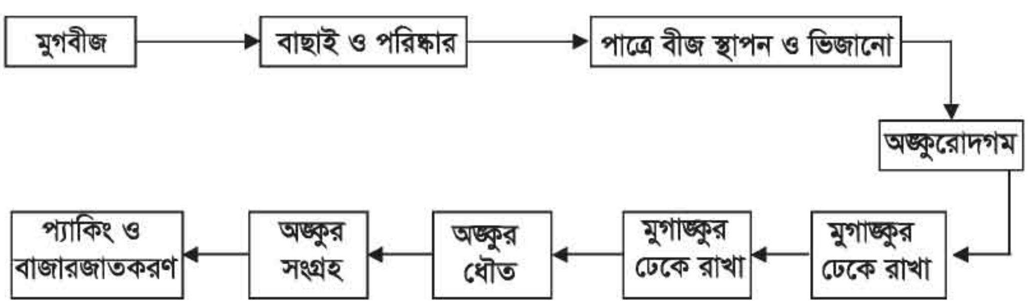

সর্তকতা

১. অঙ্কুর যেন কোনোভাবেই শুকিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

২. মুগবীজ বেশি বড় বা বেশি ছোট যেন না হয়, মাঝারি আকৃতির হতে হবে।

১০. সয়াবিন হতে সয়াদুধ তৈরি করা ঃ

চিত্র : সয়াবিন দানা ও সয়া দুধ

প্রাসঙ্গিক তথ্য : খুব সহজ পদ্ধতিতে সয়াদুধ প্রস্তুত করা যায় যা জীবনধারণের জন্য খুব সস্তায় প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও স্নেহের জোগান দিতে পারে। সয়া দুধের সাথে ভিটামিন-বি$_{২}$, ভিটামিন-বি$_{১২}$ এবং ক্যালসিয়াম মিশিয়ে-এর পুষ্টিমান আরও উন্নত করা যায়। সয়াদুধে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লৌহ যেমন মানুষের উপকারে আসে তেমনি এর ফসফরাস মস্তিষ্ক উর্বর করতে সাহায্য করে। সয়াদুধ সহজে হজমযোগ্য বা গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সয়া দুধ অনেক সময় গরুর দুধের সাথে মিশিয়ে সয়াবিনের সিস্টিন এবং মিথিওনাইনের ঘাটতি পূরণ করে পুষ্টিমান বাড়ানো যায়। সয়া দুধের সাথে বিভিন্ন সুগন্ধি মিশিয়ে একে আরো সুস্বাদু করা যায়। সয়া দুধ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী অতি সহজে স্বল্প খরচে পুষ্টি ও দুধের চাহিদা মেটাতে পারে। আই.এম.এফ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সয়া দুধ আরও আকর্ষণীয় এবং বিশুদ্ধ। তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে কোমল পানীয়ের মতো সয়াদুধ বোতলে বাজারজাত করা হচ্ছে।

উপকরণ : সয়াবিন ২৫০ গ্রাম, ছাঁকার কাপড়, শিল পাটা, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি, চিনি, ব্লেন্ডার ইত্যাদি।

সয়াবিন হতে সয়াদুধ তৈরি করার জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. পরিপুষ্ট, রোগমুক্ত, পরিষ্কার সয়াবিন ডাল ৭-৮ ঘণ্টা বা ১ রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২. চুলায় পানি জ্বাল দিতে হবে। ফুটন্ত পানিতে ভিজানো সয়াবিনগুলো ৫-১০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে।

৩. সিদ্ধ সয়াবিন নামিয়ে ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার পানিতে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে।

৪. খোসা ছাড়ানো সয়াবিনের সাথে অল্প অল্প গরম পানি মিশিয়ে শিল-পাটায় পিষে ১ লিটার বিশুদ্ধ পানিতে মিশালে সোয়া লিটার দুধ তৈরি হবে।

৫. পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে উক্ত গুলানো দ্রবণ ছেঁকে নিলে যে তরল দ্রবণ পাওয়া যাবে তাই সয়াদুধ।

৬. এই দুধ, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি ও পরিমাণমতো চিনি দিয়ে ১৫ মিনিট জ্বাল দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। পরিবেশনের সময় সামান্য ভ্যানিলা বা চকলেট বা পাটালী গুড় মিশিয়ে দেয়া যা। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই সয়াদুধ পানীয় হিসেবে দোকানে পাওয়া যা। এই দুধ হতে দৈ তৈরি করা যায়।

৭. সয়াদুধের অবশিষ্টাংশ দিয়ে সয়াহালুয়া ও সয়া পিঠা তৈরি করা যায়।

সতর্কতা :

১. বাটা সয়াবিনের সাথে ৫ গুণ পানি মেশাতে হবে। অর্থাৎ সয়াবিন ও পানির মিশ্রণ হবে ১ঃ৫ অনুপাত।

২. সয়াবিনকে ভালোভাবে ভেজানো ও সিদ্ধ করতে হবে অন্যথায় এর গন্ধ যাবে না।

১১. চানাচুর তৈরি করা :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : চানাচুর অত্যন্ত জনপ্রিয় খাদ্য। সব বয়সের মানুষের কাছে এটি অতি মুখরোচক ও মজাদার। অতি প্রাচীনকাল থেকে এটি আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে। মেহমান আপ্যায়নে চানাচুরের বিকল্প নেই। তাছাড়া বাঙালি সমাজে চা কিংবা কফির সাথে চানাচুরের জুড়ি নাই। চানাচুর প্রস্তুতির উপকরণসমূহ ছোলার ডাল, মটর, মুগডাল, চিড়া ইত্যাদি উদ্ভিদজাত শস্যসামগ্রী খোলা বাজারে সহজেই পাওয়া যায়। তাছাড়া চানাচুর প্রস্তুতির সরঞ্জাম সহজলভ্য। গরিব মহিলা বা শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নিজ গৃহে চানাচুরের ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের ভাগ্য উন্নয়নে নিয়োজিত হতে পারে।

উপাদান :

১	ছোলার ডালের বেসন	৫০০ গ্রাম
২	চীনাবাদাম	১০০ গ্রাম
৩	আধাভাঙা মটর ডাল	৫০ গ্রাম
৪	চিড়া	৫০০-১০০ গ্রাম
৫	জিরার গুঁড়া	২০ গ্রাম
৬	ধনের গুঁড়া	২০ গ্রাম
৭	মরিচের গুঁড়া	৩০-৩৫ গ্রাম
৮	সাইট্রিক এসিড	১০ গ্রাম
৯	লবণ	পরিমাণমতো
১০	ডিম	৪-৫টি
১১	সয়াবিন তেল প্রায়	৫০০ মি.লি
১২	পানি	পরিমাণমতো

সহায়ক উপকরণ :

১	ব্যালান্স বা নিক্তি	৯	চায়ের কাপ
২	চুলা	১০	ছোট বাটি
৩	কড়াই	১১	বাঁশের চালুনি
৪	বোল	১২	সসপ্যান
৫	বিভিন্ন প্রকার ডাইস	১৩	হাতাওয়ালা তারের জালি

৬	হাতলওয়ালা ছিদ্রযুক্ত চামচ	১৪	পলিব্যাগ
৭	চা চামচ	১৫	সিলিং মেশিন
৮	পানির জগ	১৬	-

চিত্র : চানাচুরের জন্য পাপড় তৈরি

চিত্র : চানাচুরের জন্য বুন্দিয়া তৈরি

চানাচুর তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. ছোলার বেসনের সাথে অল্প পরিমাণে পানি মিশাতে হবে যেন খামিরটি অল্প শক্ত হয়।

২. এর সাথে রং, ডিম, সাইট্রিক এসিড এবং লবণ মিশিয়ে ডাইসে নিতে হবে।

৩. চুলায় কড়াই দিয়ে সয়াবিন তেল জ্বাল দিতে হবে।

৪. তেল ফুটে উঠলে তেলের কড়াইয়ের উপর একজন সহকারীকে সাথে নিয়ে চিকন ঝুড়ি তৈরির ডাইস ধরতে হবে।

৫. অল্প পরিমাণ খামির নিয়ে ডাইসের উপর চাপ দিলে চিকন ঝুরি গুলো গরম তেলে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় হাতাওয়ালা ছিদ্রযুক্ত চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করতে হবে।

৬. ভাজা হয়ে এলে চামচ দিয়ে তুলে তেল ঝরার জন্য ছিদ্রযুক্ত ট্রেতে রাখতে হবে।

৭. একই পদ্ধতিতে মোটা ঝুরি, গাটিয়া, পাপড় ও বুন্দিয়া আস্তে আস্তে সতর্কতার সাথে সময় নিয়ে ভাজতে হবে।

৮. চিনা বাদামের খোসা ফেলে কিছু সময় পানিতে ভিজিলে নিতে হবে। তারপর পানি ঝরিয়ে তেলে ভেজে নিতে হবে।

৯. মটর ডাল প্রায় ৫-৭ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে তারপর পানি ঝরিয়ে তেলে ভেজে নিতে হবে।

১০. চিড়াগুলো পরিষ্কার করে তেলে ভেজে নিতে হয়।

১১. একটি টেবিলের উপর পলিথিন কাগজ বিছিয়ে তার উপর প্রস্তুতকৃত ঝুড়ি, বাদাম, ডাল, চিড়া, জিরার গুঁড়া, ধনের গুঁড়া ও মরিচের গুঁড়া নেওয়া হয়। সব মিক্সার মেশিনে নিয়ে বা হাত দ্বারা ভালোভাবে মিশানো হয়।

১২. বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের পলিব্যাগে ভরে সিল করতে হবে। এভাবে চানাচুর তৈরি হয়। ২০২২

সর্তকতা :

১. ঝুরি যেন গরম তেলে পুড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. বুন্দিয়া তৈরির খামির তরল গোলার মতো করতে হবে।

আলুর চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করা

প্রাসঙ্গিক তথ্য : বাংলাদেশে আলু একটি সম্ভাবনাময় ফসল। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায় আলুর উৎপাদন বহু গুণ বেড়ে গেছে। এখন আলু থেকে উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কমদামে দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করা যেতে পারে। সব ধরনের আলু থেকে উৎকৃষ্ট মানের আলুর চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হবে না। এজন্য সুনির্দিষ্ট জাতের আলু নির্বাচন করতে হবে। আমাদের দেশের Cold Storage বা হিমাগার গুলোতে শুধু খাবার আলু সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জন্য ভিন্ন ধরনের হিমাগারের প্রয়োজন হবে। চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির জন্য উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সরকার চেষ্টা করছে।

ক) আলুর চিপস

উপাদান

১	আলু	৩০০ গ্রাম
২	গুঁড়া লবণ	২ গ্রাম
৩	সয়াবিন তেল	৩০০ মিলি
৪	ভাজা মরিচ গুঁড়া	২ গ্রাম
৫	গামলা	১ টি

সহায়ক উপকরণ

১	ছুরি / বঁটি / সইসার
২	চালুনি
৩	ছিদ্রযুক্ত হাতা
৪	কড়াই
৫	ট্রে / কাগজের শিট

চিত্র : আলুর চিপস

আলুর চিপস তৈরি করার জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. নির্বাচিত বড় বড় রোগমুক্ত খোসা ছাড়ানো আলু পরিষ্কার পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে।

২. ছুরি বা স্লাইসারের সাহায্যে ১-১.৫ মিলি. পুরু করে আলুর চিপস কাটতে হবে এবং লবণ পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৩. স্লাইসগুলো চালুনি বা বাঁশের চাটাইয়ের উপর রেখে পানি ঝড়াতে হবে। স্লাইসগুলো কিছুদিন সংরক্ষণ করতে হলে ব্লাঞ্চিং করে পটাশিয়াম মেটা বাইসালফেট (KMS) দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে নিতে হবে।

৪. কড়াইতে তেল গরম হলে স্লাইসগুলো ছেড়ে দিয়ে ছিদ্রযুক্ত হাতা দিয়ে উল্টে পাল্টে দিতে হবে।

৫. আলুর স্লাইসগুলো বাদামি হলে চিপসগুলো হাতার সাহায্যে তেল ঝরিয়ে ট্রে বা কাগজের শিটের উপর রাখতে হবে।

৬. চিপস ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বেই লবণের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হয়। যাতে চিপসের গায়ে লবণ বসে যায়।

৭. ডায়মন্ড ও কার্ডিনাল জাতের আলু থেকে চিপস ভালো করা যায়।

৮. আলুর মতো মিষ্টি আলুর ও চিপস তৈরি করা যায়।

খ) আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

উপাদান

১	আলু	১কেজি
২	লবণ	৫ গ্রাম
৩	তেল বা ঘি	২৫০ মিলি
৪	গোল মরিচের গুঁড়া	০.২ গ্রাম
৫	লাল মরিচের গুঁড়া	১ গ্রাম

সহায়ক উপকরণ

১	ছুরি
২	ছিদ্রযুক্ত হাতা
৩	চুলা
৪	কড়াই ও চালুনি
৫	ট্রে / কাগজের শিট

চিত্র : আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করার জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. পরিপুষ্ট ও নির্দোষ বড় বড় আলু বেছে নিতে হবে।

২. আলু ধুয়ে শুকিয়ে খোসা ছিলে নিতে হবে।

৩. ছুরির সাহায্যে ১ সে.মি. প্রস্থ ও ১ সে.মি. পুরু এবং যতটুকু সম্ভব লম্বা করে ফালি কাটতে হবে।

৪. ফালিগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে চালুনিতে উঠায়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

৫. কর্তিত ফালিগুলোকে গরম পানিতে আধা সিদ্ধ করে শর্করার হার কমিয়ে তেলের শোষণতা ৬% এ নামিয়ে আনতে হবে।

৬. তারপর ফালিগুলো লবণ, গোলমরিচ ও লাল মরিচের গুঁড়ো ও সামান্য পানি দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে।

৭. কড়াইতে তেল বা ঘি গরম করে তাতে ফালিগুলো ঢেলে দিয়ে ওলটপালট করে ৩-৫ মিনিট ভাজতে হবে।

১৩. মিষ্টি আলুর সস ও জ্যাম তৈরি করা :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে মিষ্টি আলু থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরির উপযুক্ত কৌশল সরাসরি চালু করা যাচ্ছে না। এমনকি স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মান প্রমিতকরণ করাও কঠিন। গোল আলুর চেয়ে মিষ্টি আলুতে ক্যালরি বেশি এবং ভিটামিনের একটি অন্যতম উৎস। মিষ্টি আলু প্রক্রিয়াজাত করা হলে কুটিরশিল্প জোরদার হবে এবং ছোট ছোট খাদ্য প্রস্তুত কারখানা সৃষ্টিসহ নিবিড় শ্রমবাজার সৃষ্টি হবে। কোরিয়ায় মিষ্টি আলু প্রধানত খাবার এবং পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মিষ্টি আলু থেকে হটকেক, দুধ নুডুলস, ক্যান্ডি জাতীয় তৈরিকৃত খাদ্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। মিষ্টি আলুর বিশেষ গুণ যে এটি সাদা আলু এবং কর্ন বা কাসাভার স্টার্চ-এর সাথে সাদৃশ্যতা ও অন্যান্য গুণাগুণের দিক থেকে মাঝামাঝি মানের।

ক) মিষ্টি আলুর সস :

উপকরণ

১	মিষ্টি আলুর শাঁস	১ কেজি (৪ কাপ)
২	কুচানো রসুন	৪০ গ্রাম (২-৩ কাপ)
৩	কুচানো আদা	২৫ গ্রাম (৩-৪ চামচ)
৪	মরিচের গুঁড়া	৩০ গ্রাম (২ চা চামচ)
৫	গোল মরিচের গুঁড়া	১০ গ্রাম (২ চা চামচ)
৬	কুচানো পেঁয়াজ	৫ গ্রাম (১ চা চামচ)
৭	জিরার গুঁড়া	৮ গ্রাম (২ চা চামচ)
৮	ভিনেগার	২৫০ গ্রাম (এক কাপ)
৯	লবঙ্গ ও চারুচিনি	৬ গ্রাম (১ চা চামচ)
১০	পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট	১ চিমটি
১১	লেবুর রস	৫ মিলি (১ চা চামচ)
১২	লবণ	১০ গ্রাম (২ চামচ)

২০২২

চিত্র : মিষ্টি আলু

মিষ্টি আলুর সস তৈরি করার জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ করতে হবে।
২. মিষ্টি আলু ধুয়ে ও খোসা ছাড়িয়ে কেটে টুকরা টুকরা করতে হবে।
৩. টুকরা করা আলু ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করতে হবে।
৪. মিষ্টি আলুর টুকরা হাত দিয়ে পিষে বা ব্লেন্ডারে কোমল মন্ড তৈরি করতে হবে।
৫. এবার মন্ড হাতাওয়ালা পাত্রে রেখে রান্না করতে হবে।
৬. সকল মসলা ও লবণ একটি পাতলা কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে ফুটন্ত মন্ডের ভিতর ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
৭. সস প্রয়োজনীয় ঘন না খাওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে হবে।
৮. সসে ভিনেগার দিয়ে মসলার পুঁটলি বের করে ফেলতে হবে।
৯. সংরক্ষণের জন্য সসে পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট (KMS) বা লেবুর রস মিশাতে হবে।
১০. বোতল ঠান্ডা হলে ক্যাপ লাগাতে হবে।
১১. এরপর গরম মোম দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে।
১২. বোতল ঠান্ডা স্থানে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যাবে।
১৩. এই সসে ভিটামিন এ ও ক্যালরি পাওয়া যাবে।

সতর্কতা :

১. উপকরণ ও উপাদানগুলো সঠিক পরিমাপের নিতে হবে।
২. মন্ড অত্যন্ত নরম ও কোমল হতে হবে।

খ) মিষ্টি আলুর জ্যাম :

উপকরণ :

১	মিষ্টি আলু ১ কেজি (৪ কাপ)
২	সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস ১০ গ্রাম (২ চা চামচ)
৩	চিনি বা গুড় ৯০০-১০০০ গ্রাম (৪ কাপ)
৪	পেকটিন বা পেয়ারার রস ৫ গ্রাম (১ চা চামচ) ২৫০ মিলি

মিষ্টি আলুর জ্যাম তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. মিষ্টি আলু ধুয়ে পরিষ্কার করে খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা করতে হবে।

২. অল্প পরিমাণ পানিতে টুকরা গুলো সিদ্ধ করতে হবে।

৩. এরপর সিদ্ধ মিষ্টি আলুর টুকরাগুলো হাত দিয়ে মেখে বা ব্লেন্ডারে দিয়ে মোলায়েম মণ্ড তৈরি করতে হবে।

৪. চিনি বা গুড় এবং পেয়ারার রস বা পেকটিন দিয়ে চুল্লিতে জ্বাল দিতে হবে।

৫. মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে লেবুর রস বা সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে ৪-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে।

৬. রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা এর ঘনত্ব ৬৭ ভাগে এলে জ্বাল বন্ধ করে চুলা থেকে নামাতে হবে।

৭. রিফ্রাক্টোমিটার না থাকলে দেশীয় পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে হবে। বাটিতে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে ১ ফোঁটা জ্যাম ছেড়ে দিতে হবে। জ্যাম যদি পানিতে জমে যায় তাহলে বুঝতে হবে চুলা থেকে নামানোর সময় হয়েছে।

৮. জ্যাম জীবাণুমুক্ত বোতল বা কাঁচের পাত্রে ভর্তি করে ঠাণ্ডা করতে হবে।

চিত্র : মিষ্টি আলুর সস

চিত্র : মিষ্টি আলুর জ্যাম

৯. ঘন জ্যাম ঠাণ্ডা হওয়ার পর বোতলের মুখে গরম মোম ঢেলে দিতে হবে।

১০. মোম শক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

১১. কাগজের সাহায্যে কাঁচের পাত্রের মুখ বন্ধ করে ঢাকনা এঁটে দিতে হবে।

১২. এই জ্যাম ১ বছরের বেশি সংরক্ষণ করা যায়।

১৩. মিষ্টি আলুর জাত কমলাসুন্দরী, বারি মিষ্টি আলু-৪ ও ৫ ব্যবহার করলে এই জ্যামে ভিটামিন এ ও ক্যালরি পাওয়া যায়।

সর্তকতা :

১. জ্যাম জমেছে কি না এ পরীক্ষাটি সঠিকভাবে করতে হবে।

২. পেকটিন জ্যাম জমাতে সাহায্য করে তাই উন্নতমানের পেকটিন দিতে হবে।

১৩. কর্মীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা এগ্রোবেসড শিল্পে বা ব্যবসায়ে সফলতা লাভের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম বিবেচ্য বিষয়ের দিক হচ্ছে উত্তম শিল্প ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকরণ অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু হয় কর্মচারী, কারখানা ও কারখানার পারিপার্শ্বিক এলাকা থেকে। এগ্রোবেসড শিল্পে সফলতার সাথে স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের শরীরের উন্মুক্ত অংশ ধৌত করার যাবতীয় সুবিধাদি কারখানায় বিদ্যমান থাকতে হবে।

উপকরণ :

১	কর্মীদের নির্ধারিত ড্রেস
২	অ্যাপ্রন
৩	হাত দস্তানা
৪	টুপি
৫	জুতা
৬	তোয়ালে

চিত্র: প্রক্রিয়াজাত কর্মীর পোশাক

কর্মীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. কর্মচারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সবসময় পরিষ্কার থেকে হবে।

২. কাজের সময় নির্ধারিত ড্রেস পরতে হবে।

৩. মাথার চুল টুপি বা নেট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।

৪. হাত ও পায়ের আঙ্গুলের নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে।

৫. সাবান ও ডিটারজেন্ট দ্বারা কাজ শুরুর আগে, পায়খানা ব্যবহারের পরে বা ময়লা স্পর্শ করার পর হাত ভলো করে ধুতে হবে।

৬. বাহিরের জন্য ব্যবহৃত জুতা কারখানা এলাকায় ব্যবহার না করা এবং কারখানার ভিতরেচলাচলের জন্য পৃথক জুতা রাখা।

৭. নাকে ও মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

৮. অসুস্থ অবস্থায় কাজ থেকে ছুটি নেওয়া।

৯. হাঁচি উঠলে বা কাশলে বা ঘাম বের হলে তা ঢেকে রাখা বা মুছে ফেলা।

১০. কারখানার ভিতরে ধূমপান করা যাবে না।

১১. চর্মরোগাক্রান্ত ব্যক্তি কারখানায় কাজ করতে দেওয়া যাবে না।

১২. কারখানার যন্ত্রপাতি দৈনিক দুইবার পরিষ্কার করতে হবে।

১৩. ঘরের মেঝে ও দেয়াল কমপক্ষে দিনে একবার পরিষ্কার করতে হবে।

১৪. কারখানার আশেপাশের এলাকা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

১৫. কারখানার অভ্যন্তরে দ্রব্য নাড়াচাড়ার সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে।

সর্তকতা :

১. সংক্রামক বা ছোঁয়াচে ব্যাধিসহ কোনো কর্মী কারখানায় এলে সকলেই আক্রান্ত থেকে পারে। তাই এ ব্যাপারে সর্তক থেকে হবে।

২. খাদ্য তৈরি নিয়ে কাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল তাই কোনো প্রকার অবহেলা ও গাফলতির কারণে ফুড পয়জনিং থেকে পারে।

৩. বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সাবধানতার সাথে নড়াচড়া করতে হবে।

১৪. নিকটস্থ ক্ষুদ্র খাদ্য শিল্প পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরি অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : দেশে খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান এ খাতে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় দেশি বিদেশি কোম্পানিগুলো বিনিয়োগ করছে। এক হিসেবে জানা যায় বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এক হাজা   অধিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প বা ফুড ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো নিম্নরূপ :

১	ফু-ওয়াং ফুডস	৬	নেসলে ম্যানুফ্যাকচারিং	১১	প্রাণ ফুডস অ্যান্ড বেভারেজ
২	আকিজ ফুডস	৭	প্রিন্স ফুড	১২	বোম্বে সুইটস
৩	এ.সি.আই ফুড	৮	মেরিডিয়ান ফুডস	১৩	হক বিস্কুট ফ্যাক্টরি ইত্যাদি
৪	স্কয়ার কনজুমার্স প্রোডাক্ট	৯	কোকোলা ফুডস	১৪	কে এফ সি
৫	ইস্পাহানী ফুডস	১০	বিডি ফুডস	১৫	ম্যাগডোলান্ডস

এ সকল খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীগণ হাতে-কলমে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা করে তা অধ্যক্ষ মহোদয় থেকে অনুমোদন করে উক্ত এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে পরিদর্শন করবেন।

কাজের ধাপ :

১. সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী কোনো শিল্প/কারখানা বা প্ল্যান্ট শনাক্ত করবেন।

২. শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দল নেতা নির্বাচন করে দেবেন।

২০২২ ৩. দলনেতাগণ ও শিক্ষক মিলে পুরো পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করবেন।

৪. শিল্প প্রতিষ্ঠানটি জ্যাম-জেলির কারখানা, বিস্কুট-কেকের কারখানা, চিড়া-মুড়ি তৈরির কারখানা, আচার-চাটনির কারখানা, চিপস-চানাচুর তৈরির কারখানা ইত্যাদি হলে ভালো হয়।

৫. প্রতিবেদনে তারিখ, সময়, অবস্থান, উদ্দেশ্য, কী কী খাদ্য তৈরি হয়, কাঁচামাল কী কী, রপ্তানি হয় কি না, যন্ত্রপাতির নাম, প্যাকেজিং, দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ, বার্ষিক লাভ-ক্ষতি, পরিবেশ, টয়লেট, ভেজাল হয় কিনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬. প্রতিবেদনটি তৈরি করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকের নিকট জমা দেবেন। এটি ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

চিত্র : একটি খাদ্য শিল্পকারখানার ছবি

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১

গমের জাত, মৌসুম, পুষ্টি, সংরক্ষণ ও মিলিং

ভূমিকা : গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান দানা ফসল (Cereals)। এটি রবি মৌসুমের ফসল। বিশ্বে উৎপাদিত দানা ফসলের প্রায় অর্ধেক গম। বাংলাদেশে উৎপাদিত দানা ফসলের ৬-৮% গম থেকে আসে। খাদ্য মানের দিক থেকে গম চালের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর। চালের চেয়ে গমে আমিষের পরিমাণ বেশি। গম চাষ লাভজনক। বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৪.৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম চাষ করে ১৩.৪৮ মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে গমের উৎপাদন হয় ৩.০৮৫ টন।

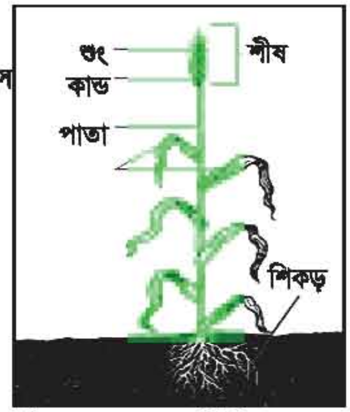

চিত্রঃ গম গাছের বিভিন্ন অংশ

গম গ্রামিনী পরিবারের অন্তর্গত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। ধানের মতো গমও 'ক্যারিওপসীস' জাতীয় ফল, যদিও গমকে বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি একবীজপত্রী ও সস্যল। গমকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) শক্ত গম- এ গমে তুলনামূলক ভাবে বেশি আমিষ থাকে।

(খ) নরম গম- এ গমে আমিষ বা গ্লুটেনের পরিমাণ কম থাকে।

১.১ গমের জাত ও মৌসুম ঃ

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গমকে একটি সম্ভাবনাময় ফসল হিসেবে এর গবেষণা জোরদার করা হয়। প্রথমে সোনালিকা ও পরে কাঞ্চন নামক গম জাত বেশ জনপ্রিয় হয়। পরবর্তীকালে কল্যাণসোনা, বলাকা, আনন্দ, বরকত, গৌরব ও শতাব্দী কৃষকের নিকট বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৯৮-২০১৪ সালের মধ্যে গম গবেষণা কেন্দ্র, বারি (বি.এ. আর আই) কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহ নিম্নে দেয়া হলো :

জাত	অবমুক্তি বছর	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন		জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
			রবি টন/হেক্টর	খরিফ টন/হেক্টর		
বারি গম ১৯ (সৌরভ)	১৯৯৮	রবি	৩.৫-৪.৬	-	১০২-১১০	দানার রঙ সাদা এবং আকার মাঝারি। পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল।
বারি গম ২০ (গৌরব)	১৯৯৮	রবি	৩.৬-৪.৮	-	১০০-১০৮	দানার রঙ সাদা, আকারে মাঝারি, উপযুক্ত সময় ছাড়াও নাবিতে বপন করা যায়। পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল।

বারি গম ২১ (শতাব্দী)	২০০০	রবি	৩.৬-৪.৮	-	১০৫-১১০	দানার রঙ সাদা, আকারে মাঝারি। পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল।
বারি গম ২২ (সুফী)	২০০৫	রবি	৩.৬-৪.৩	-	১০০-১১০	জাতটি তাপসহিষ্ণু ও চিটা প্রতিরোধী। পাউরুটি তৈরির জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।
বারি গম ২৩ (বিজয়)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.০	-	১০৩-১১২	তাপসহিষ্ণু হওয়ায় আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনেও জাতটি ভালো ফলন দিতে সক্ষম।
বারি গম ২৪ (প্রদীপ)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.১	-	১০২-১১০	জাতটি গমের পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল এবং বর্তমানে মরিচা রোগে সংবেদনশীল। পাউরুটি তৈরীর জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।
বারি গম ২৫	২০১০	রবি	৩.৬-৫.০	-	১০২-১১০	জাতটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যম মাত্রার লবণাক্ত (৮-১০ মিলিমস/সেমি.) এলাকাসহ দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম ২৬	২০১০	রবি	৩.৫-৫.০	-	১০৪-১১০	জাতটি তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় দেরিতে বপনেও জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ১০-১২ ভাগ ফলন বেশি দেয়। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম ২৭	২০১২	রবি	৪.০-৫.৪	-	১০৫-১১০	জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী, পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী।
বারি গম ২৮	২০১২	রবি	৪.০-৫.৫	-	১০২-১০৮	জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে প্রায় ১০ দিন আগে পাকে এবং দেরিতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী।
বারি গম ২৯	২০১৪	রবি	৪.০-৫.০	-	১০৫-১১০	জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী, পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী।

২০২২

বারি গম ৩০	২০১৪	রবি	৪.৫-৫.৫	-	১০০-১০৫	জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু।

গমের মৌসুম : গম শীত মৌসুমের ফসল। আমাদের দেশে রবি মৌসুমে গম উৎপাদন করা হয়। গম ফসল বপনের উপযুক্ত সময় হলো অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। খাদ্য শস্য হিসেবে গম অধিক পুষ্টিকর এবং এতে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ বেশি। গম চাষে সেচ কম লাগে। যে জমিতে সেচের সুবিধা নেই অথচ মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকে সে জমিতে বিনা সেচেও সফলভাবে গম চাষ করা যায়। গমের উৎপাদন খরচ কম এবং পোকা ও রোগের আক্রমণও কম। তাই আমাদের দেশে গম ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গমের আটা খাদ্য তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে।

১.২ গম দানার বিভিন্ন অংশ :

গম মাড়াইয়ের পর সম্মুখ দিক থেকে লক্ষ্য করলে অতি সহজেই বীজের মাঝ বরাবর একটি খাঁজ বা দাগ দেখা যায়। গমের দানার বিভিন্ন অঙ্গসমূহ ছবিতে দেখানো হলো :

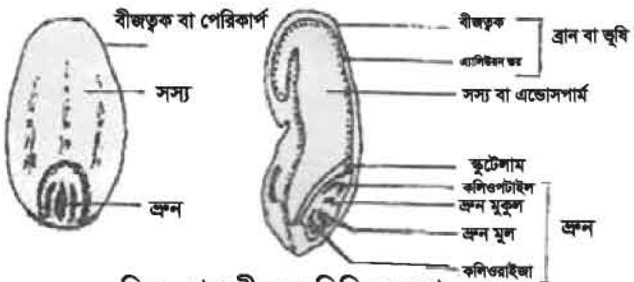

চিত্র : গম বীজের বিভিন্ন অংশ

গম দানার অঙ্গসমূহ :

ক. ব্রান বা ভুসি : গম বীজের দানা ঘিরে একটি পুরু আবরণ বা আস্তরণ থাকে তাকে ছাল বা ভুসি বলে। এটি লাল বা সাদার কারণে আটা লাল বা সাদা রঙের হয়। এটি দানা বা ফলের আবরণের সাথে যুক্ত থাকে বলে একে পেরিকার্প বা বীজত্বক বলে। গমের ৭-৮ ভাগ হচ্ছে ব্রান বা ভুসি।

খ. অ্যালুরেন স্তর : গম দানার ভ্রূণ এবং এন্ডোস্পার্ম ঘিরে একটি পাতলা স্তর থাকে তাকে অ্যালুরেন স্তর বলে। এই স্তর গম ভাঙানোর সময় অপসারিত হয়ে ব্রান বা ভুসি সৃষ্টি করে। এ্যালুরেন স্তর ও ভুসি মিলে মোট দানার ১৪% হয়।

গ. এন্ডোস্পার্ম বা সস্য : গম দানার ব্রান বা ভুসি, অ্যালুরেন স্তর ও ভ্রূণ বাদ দিয়ে গম দানার অবশিষ্ট অংশকে এন্ডোস্পার্ম বলে। এটি প্রধানত শ্বেতসার জাতীয় তবে কিছুটা আমিষ আছে। এটি গম দানার ৮৩%।

ঘ. ভ্রূণ : গম দানার নিচের দিকে কোণায় সবচেয়ে পুষ্টিকর অংশকে ভ্রূণ বা অঙ্কুর বলে। এখানে গমের অধিকাংশ প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ লবণ থাকে। এছাড়া কিছু শ্বেতসার ও স্নেহ পদার্থও এখানে পাওয়া যায়। এই ভ্রূণ থেকেই গমের চারা সৃষ্টি হয়। এন্ডোস্পার্ম ও ভ্রূণকে একত্রে অন্তবীজ বা কার্নেল বলে।

২০২২

১.৩ গমের পুষ্টিমাণ :

গমের পুষ্টিমাণ : সকল প্রকার দানা শস্যের মধ্যে গমে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে। কিন্তু এই আমিষে লাইসিন, মিথিওনাইন ও থিওনাইন নামক অ্যামাইনো এসিড ঘাটতি থাকায় এটা চালের আমিষ অপেক্ষা নিম্নমানের। গমজাত খাদ্য যদি দুধ বা ডালের সাথে খাওয়া যায় তবে এ ঘাটতি পূরণ করা যায়। গমের ভুসি বা ব্রানে ফাইটিক এসিড (Phytic Acid) থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আটা বা ময়দা তৈরির সময় এই ভুসি বাদ দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ গমের আটা (Whole Wheat) এই কারণে নিম্নমানের হয়। গমে গ্লুটেন নামক যে আমিষ থাকে তা গরম পানিতে এক প্রকার নরম ও আঠালো ও স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে যা থেকে রুটি, পাউরুটি, কেক বানানো হয়। মেশিনে গম ভাঙানোর সময় গমের ভুসি ও অ্যালুয়েন স্তর ছেঁটে বাদ দেয়া হয়। আটা ও ময়দা বেশিদিন সংরক্ষণের জন্য গমের ভ্রূণও ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়। অ্যালুয়েন স্তর ও ভ্রূণ ছেটে ফেলার ফলে গমের প্রায় ৭৫% থায়ামিন, অধিকাংশ আমিষ, লৌহ এবং ভিটামিন-বি চলে যায়। নিচের সারণিতে গমের পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ দেখোনো হলো।

সারণি: গমে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	শতকরা হার (%)
১.	জলীয় অংশ	১৪
২.	আমিষ	৯-১৪
৩.	চর্বি	২-২.৫
৪.	শর্করা	৬৩-৬৭
৫.	আঁশ	২
৬.	খনিজ উপাদান	১.৫

১.৪ গম সংরক্ষণ :

মাড়াইকৃত বীজ পর পর ২-৩ বার রোদে শুকিয়ে নিতে হয় যাতে বীজের আর্দ্রতা ১২% এর নিচে থাকে। এ আর্দ্রতা দাঁতে চিবিয়ে পরীক্ষা করা যায়। যদি বীজ চিবানোর সময় কট করে শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে যে উক্ত বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। পুষ্ট বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ১.৭৫-২.৫০ মি.মি. ছিদ্র বিশিষ্ট চালনিতে বাছাই করে নিতে হয়। সঠিকভাবে গমবীজ সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে। গম সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো পাত্র হলো ড্রাম, টিনের পাত্র, পলিথিন ব্যাগ ও মাটির কলসি বা মটকা। এদের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক. টিনের পাত্র : কেরোসিন বা বিস্কুটের টিনে গমবীজ সংরক্ষণ করা সবচেয়ে উত্তম। টিন অবশ্যই ছিদ্রমুক্ত থেকে হবে। পাত্রটি নিশ্চিতভাবে ছিদ্রমুক্ত করার জন্য পাত্রের বাহিরে বা সম্ভব হলে ভিতরে আলকাতরা বা যে কোনো রঙের প্রলেপ দেওয়া ভালো। গমবীজ পাত্রে ভরে ঢাকনাটি শক্তভাবে আটকাতে হবে। ঢাকনার চারপাশে মোম বা পলিথিন দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে বাতাস পাত্রের ভিতরে না যায়। এতে বীজের আর্দ্রতা ঠিক থাকে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ হয় না। টিন সরাসরি মেঝেতে না রেখে মাচায় রাখা উত্তম।

খ. মাটির কলসি বা মটকা : মাটির কলসি বা মটকার বাইরে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। আলকাতরার প্রলেপ দিলে মাটির পাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বাইরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বীজের আর্দ্রতা ঠিক থাকে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ হয় না। বীজ ভর্তি করে পাত্রের মুখ পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে রাখতে হবে বা কাঁদামাটি দিয়ে ঢাকনা আটকিয়ে রাখতে হবে। মাটির পাত্রেও গরম বীজ ১২ ঘণ্টা সময় ঠান্ডা করে রাখতে হবে। যাতে পাত্রের ভিতরে খালি না থাকে সেজন্য শুকনা ছাই পাত্রের নিচে ও বীজের উপর দিয়ে ভর্তি করে পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করে রাখতে হবে। সংরক্ষিত গমবীজ পাত্র মেঝেতে না রেখে মাচার উপর রাখতে হবে। যাতে পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। মাটির সংস্পর্শে এলে পাত্রের তলায় মাটি থেকে রস দিয়ে বীজের আর্দ্রতা বেড়ে যেতে

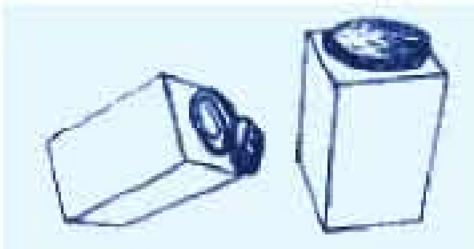

চিত্র : ঢাকনাযুক্ত বিস্কুট বা কেরোসিনের টিন

চিত্র : মাটির কলস বা মটকা

পারে। বাহিরের পোকা থেকে রক্ষার জন্য সংরক্ষিত পাত্রের চারদিক পরিষ্কার রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় পোকার আক্রমণ দমন করার জন্য ফসটক্সিন ট্যাবলেট বা ন্যাপথলিন বল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ন্যাপথলিন ব্যবহার করা গম খাওয়া যাবে না।

গ. ঢাকনাযুক্ত বড় ড্রাম : বেশি পরিমাণে গম সংরক্ষণের জন্য ঢাকনাযুক্ত পরিষ্কার ও শুকনা ড্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। গম ড্রামে ভর্তির পূর্বে ড্রামের মাঝখানে ১২-১৫ সে.মি. ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত টিনের পাত্র বা বাঁশের পাইপ ঢুকাতে হবে। এরপর এ পাইপের চারপাশ দিয়ে ড্রামের মধ্যে গম ভর্তি করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পাইপের ভিতর যেন গম প্রবেশ না করে। গম ভর্তি করার পর পাইপের উপরের মাথা খোলা থাকবে এবং গমের উপরিতলের কিছুটা উপরে পাইপের মাথা থাকবে। প্রতি ১০ কেজি গমের জন্য ৩০০ গ্রাম শুকনা পাথর চুন একটি কৌটায় ভরে পাইপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হবে। কৌটাটি এমন আকারের হবে, যাতে চুন কৌটার তিন ভাগের দুই ভাগ ভর্তি হয়। চুনের পাত্র ছিদ্রযুক্ত পাইপের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়ে ড্রামের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। ঢাকনাটি ভালোভাবে এঁটে দিয়ে ঘরের মধ্যে শুকনা, ঠান্ডা এবং উঁচু স্থানে রাখতে হবে। এভাবে রাখা গম প্রায় ১ বছর ভালো থাকে।

চিত্র : খালি ড্রাম এবং চুন ছিদ্রযুক্ত পাইপ, ঢাকনা ও গমভর্তি ড্রাম

পলিথিনের বস্তা

চটের বস্তা

চিত্র : পলিব্যাগে গম পুরে বস্তার মধ্যে সংরক্ষণ

ঘ. পলিথিন ও চটের বস্তা : ছিদ্রযুক্ত মোটা (১২ মি.মি. পুরু) পলিথিন ব্যাগে গমবীজ ভরে চটের ব্যাগের মুখ সেলাই করে দিতে হবে। পলিব্যাগ পাতলা হলে ২-৩টি ব্যাগ একত্রে করে রাখা যায়। এ বস্তাগুলো বড় বড় গুদাম ঘরে কাঠের বা বাঁশের তৈরী 'ডালেজ'-এর উপর স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখা যাবে। কাঠের বা বাঁশের তৈরী এক ধরনের পাটাতন যা মেঝে থেকে মাত্র ১০-১৫ সে.মি. উঁচু হয় একে 'ডালেজ' বলে। ডালেজের উপর বস্তা রাখা হলে বস্তাগুলো মেঝের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় না বলে গমের বস্তা ভেজা ভেজা হতে পারে না। এভাবে সংরক্ষণ করা গম ১ বছর ভালো থাকে। তবে পলিথিনের মধ্যে প্রতি ১০০ কেজি গমের জন্য আগাম শুকনো পাথুরে চুন ব্যবহার করা যায়। পাথুরে চুন চোষ কাগজের প্যাকে ব্যবহার করা হয়।

১.৫ গোলাজাত গম শস্যের ক্ষতিকারক পোকামাকড় :

গুদামজাত শস্যে এবং অন্যান্য দ্রব্যে কীটপতঙ্গ, ইঁদুর এবং ক্ষুদ্র মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। এইসব আপদ বা বালাইয়ের আক্রমণে পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহের প্রায় ১০% নষ্ট হয়ে থাকে। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি বছর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য গুদামজাত অবস্থায় নষ্ট হয়, তা দিয়ে ২৫৫ মিলিয়ন লোককে এক বছর খাওয়ানো যায়।

নিম্নে গোলাজাত গম ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের নাম ও ক্ষতির বর্ণনা দেওয়া হল-

১. ধানের শুঁড় পোকা বা রাইস উইভিল।
২. কেড়ি পোকা বা লেসার গ্রেইন বোরার।
৩. লাল শুসরী পোকা বা রেড গ্রেইন বিটল।
৪. খাপড়া বিটল।
৫. ধানের সুরুই পোকা বা রাইস মথ।
৬. শুসরী পোকা বা স টুথড গ্রেইন বিটল।
৭. কাডেল পোকা বা কাডেল বিটল।
৮. বাদামি বিটল পোকা বা ব্রাউন বিটল।
৯. লেসার কেড়ি পোকা বা লেসার মিল ওয়ার্ম।
১০. চ্যাপ্টা বিটল বা ফ্লাট গ্রেইন বিটল।
১১. মাকড় বিটল বা স্পাইডার বিটল ইত্যাদি।

উপরোক্ত এগারোটি পোকা গুদামজাত গম ফসলে বেশি আক্রমণ করে থাকে। এর মধ্যে ক্রমিক নং ১ থেকে ৫ পর্যন্ত পোকার পরিচিতি, ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন ১ম পত্রের ২য় অধ্যায়ে বর্ণনা আছে। ৬ নং ক্রমিক থেকে নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

৬. তসরী পোকা বা স টুথড গ্রেইন বিটল : এই পোকা আর্দ্র শস্য বিশেষ করে চাল ও গমের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। গুদামজাত গমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার ক্ষতি করে। এই পোকায় আক্রান্ত গমের স্বাদ নষ্ট হয় এবং বিক্রির অযোগ্য হয়ে যায়। ভালোভাবে প্যাকেট করা দ্রব্যও এদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। শরীর চ্যাপ্টা বলে এরা অতি সহজেই গমের বস্তা এবং প্যাকেটের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

চিত্র : তসরী পোকা

চিত্র : ক্যাডেল বিটল

চিত্র : বাদামি বিটল পোকা

৭. ক্যাডেল বিটল : এরা গম দানা ও আটা খেয়ে নষ্ট করে। আটার মিলে আটা খায় এবং পূর্ণাঙ্গ পোকা অন্য পোকা মেরে খেয়ে ফেলে। এছাড়া এরা মোড়কজাত খাদ্যের প্যাকেট বা কার্টন নষ্ট করে ফেলে।

৮. বাদামি বিটল পোকা : এটি আমাদের দেশে একটি গৌণ পোকা। এটি ধানের কুঁড়া ও ভাঙা শস্যদানায় আক্রমণ করে। তবে গমও এদের আক্রান্ত বস্তু। আমাদের দেশে এটি পাওয়া গেলেও এর ক্ষতিকর প্রভাব তেমন পাওয়া যায়নি।

৯. লেসার কেড়ি পোকা : এটিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এরা গৌণ পোকা, এরা চাল ও গম খেয়ে থাকে তবে কিছুটা নষ্ট শস্য দানায় আক্রমণ বেশি করে। গুদামজাত সকল পোকার সাধারণ দমন ব্যবস্থা ১ম পত্রের ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

চিত্র : লেসার কেড়ি পোকা

১.৬ গম ভাঙানোর বিভিন্ন পদ্ধতি :

গম ভাঙানো বা মিলিং : গম দানাকে যান্ত্রিক উপায়ে আটা বা ময়দা করার পদ্ধতিকে মিলিং বলে। মিলিং এরপর আমরা গম থেকে আটা, ময়দা ও সুজি পেয়ে থাকি। গম মিলিং করার সময় যে ভুসি পাওয়া যায় তাতে গমের বহিঃস্তর ও অ্যালুরেন স্তর ছেটে যায়। এমনকি গমের অঙ্কুরও বাদ পড়ে যায়। গম ভাঙানোর পদ্ধতি দুই প্রকার। যথা- প্রচলিত পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতি।

চিত্র : যাঁতার ব্যবহার

প্রচলিত পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে পাথরের চাকতি দ্বারা তৈরি যন্ত্র যাঁতা ব্যবহার করা হয়। পরপর দুটি দুইটি চ্যাপ্টা ও গোল পাথরের চাকতির মাঝে গম দানা প্রবেশ করিয়ে উপরের চাকতি হাতল দিয়ে ঘুরানো হয়ে

২০২৫

থাকে। নিচের চাকতিটি স্থির থাকে। যাঁতা একজনই ঘুরাতে পারে। যাঁতা ঘুরানোর ফলে আটা দুই চাকতির চারদিক দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে থাকে। পরে তা সংগ্রহ করে নিতে হয়। চাকতি দুটি পরস্পর সমান্তরাল অবস্থানে থাকে। এ পদ্ধতিতে যে আটা করা হয় তা দিয়ে সাঁকা রুটি করা যায় কিন্তু ভুসির পরিমাণ বেশি হওয়ায় কেক, বিস্কুট, পাউরুটি ইত্যাদি এ আটা দিয়ে করা যায় না। কেননা এ পদ্ধতিতে আটার কণা মিহি না হওয়ার ফলে ময়দা তৈরি করা যায় না।

আধুনিক পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে গম ভাঙানোর কাজ তিন পর্যায়ে হয়ে থাকে। যথা:

ক. গম পরিষ্কারকরণ

খ. গম কন্ডিশনিং ও

গ. মিলিং করা

ক. গম পরিষ্কারকরণ : মাঠ থেকে গম সংগ্রহের পর গমের সাথে বিভিন্ন প্রকার শস্যদানা, ধুলাবালি, খড়কুটা, কীটপতঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মলমূত্র ইত্যাদি মিশে থাকে। এগুলো অপসারণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চালনি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যেগুলো গমের দানার চেয়ে ছোট সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য নিম্নের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন:

১. **বিভিন্ন প্রকার চালনি :** ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসযুক্ত ছিদ্রের চালনি ব্যবহার করে গম পরিষ্কার করা হয়।

২. **ডিস্ক সেপারেটর :** বিভিন্ন আকৃতির গমের দানা এই যন্ত্র দ্বারা শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

৩. **পানিতে ভিজিয়ে :** পানিতে ভিজালে গম ও হালকা দ্রব্যগুলো পানিতে ভেসে উঠবে এবং পাথর ও ভারী ময়লাগুলো নিচে পড়ে যাবে। উপর থেকে গম বীজ তুলে নিচের ময়লা তলানী ফেলে দিতে হবে।

৪. **বাতাসের সাহায্যে :** গম ধোয়ার পর শুকিয়ে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (Vaccum Cleaner) দ্বারা গমের সাথে হালকা দ্রব্যগুলো পরিষ্কার করতে হবে। যেমন- খড়কুটা ও ধুলাবালি।

৫. **চুম্বক দ্বারা :** গম মাড়াই, ঝাড়াই ও শুকানো যান্ত্রিকভাবে করা হলে গমের সাথে কিছু চুম্বকীয় পদার্থ মিশে যেতে পারে। ম্যাগনেটিক ক্লিন ব্যবহার করে এসব চুম্বকীয় ধাতব পদার্থ গম থেকে দূর করা সম্ভব।

খ. গম কন্ডিশনিং : গম গুঁড়া করার পূর্বে হালকাভাবে পানিতে ভিজানোকে কন্ডিশনিং বলা হয়। গমের আটার গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে গমের ত্বক বা ভুসি ছাটা হয়। গম ভিজানোর সাথে সাথে উঠিয়ে বারবারে করে পাত্রে ভরে ২৪-৭২ ঘন্টা আবদ্ধ করে রাখা হয়। এটা নির্ভর করে গমের দানার গঠনের ওপর যথা-শক্ত ও নরম গম। গম ভিজালে ১৫-১৭% পানি শোষণ করে ত্বক নরম হয় এবং সহজেই ছাঁটা যায়।

গ. গম মিলিং : মিলিং করে গম থেকে ময়দা পেতে নিম্নের কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমন-

১. **ব্রেকিং :** রোলার মিলে ভিজানো গম ভাঙানো হয়। এই যন্ত্রে দুইটি রাবার রোলার থাকে যাতে দুই ধরনের ঘূর্ণন গতি থাকে। এর ফলে গমগুলো ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এরপর চালনি দিয়ে ঢেলে বড় আকৃতির টুকরোগুলো পুনরায় হপার দিয়ে যন্ত্রে প্রবেশ করিয়ে ভাঙা হয়।

২. **চালা ও ছাল ঝাড়া :** ক্রাশিং রোলার দ্বারা গমের ত্বক বা ছাল আলাদা করার সময় কিছু গমের এন্ডোস্পার্ম বা শস্য সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়ে ময়দা হয়ে যায়। এগুলো সূক্ষ্ম চালনি দিয়ে চেলে আলাদা করা হয়।

৩. **সূক্ষ্ম গুঁড়াকরণ :** গম মিলিং যন্ত্রে ৮-১০ জোড়া রোলার থাকে এগুলোকে রিডাকশন রোলার বলে। ভাঙ্গা গমকে পর্যায়ক্রমে কয়েকবার মসৃণ রোলার দ্বারা ভেঙ্গে সূক্ষ্ম বা মিহি গুঁড়ায় পরিণত করা হয়।

৪. **পিউরিফিকেশন :** বড় বড় মিলে রিডাকশন রোলার ব্যবহারের ফলে গমের কণা বেশি সূক্ষ্ম হয়ে ময়দায় পরিণত হয়। এ সূক্ষ্ম কণাকে বায়ু প্রবাহের দ্বারা ভ্যাকুয়াম স্থানে উঠিয়ে দেওয়া হয়। কণার আকার ও ওজনের ভিত্তিতে উড়ন্ত অবস্থা থেকে ময়দার কণা পৃথক করা হয়। এই পৃথক করার পদ্ধতিতে পিউরিফিকেশন বলে। নিম্নে গম থেকে ময়দা তৈরির Flow Chart– দেয়া হল;

গম → ব্রেকিং → চালা ও ছাল ঝাড়া → সূক্ষ্ম গুঁড়াকরণ → পিউরিফিকেশন → ময়দা

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের উৎপাদিত দানা ফসলের কত ভাগ গম থেকে আসে?

২. প্রতি হেক্টর জমিতে গমের উৎপাদন কত?

৩. গম কোন পরিবারে কী জাতীয় ফল বা বীজ?

৪. নরম ও শক্ত গমে আমিষের পরিমাণ কত?

৫. স্বাধীনতার পর গমের কোন জাত দুটি বেশ জনপ্রিয় হয়?

৬. গম ফসল বপনের সময় কখন?

৭. গমবীজের কোন অংশকে ভুসি বলে?

৮. গমবীজের অঙ্গ সমূহ কয়টি ও কী কী?

৯. এন্ডোস্পার্ম ও গমের ভ্রূণকে একত্রে কী বলে?

১০. গমের আমিষে কোন তিনটি এমাইনো এসিডের ঘাটতি থাকে?

১১. গমের ভুসি বা ব্রানে কী থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর?

১২. গমে কোন আমিষের উপস্থিতির কারণে আটা থেকে রুটি, কেক, পাউরুটি ইত্যাদি বানানো যায়?

১৩. সংরক্ষণের জন্য গমের আর্দ্রতা কত এর নিচে হওয়া উচিত?

১৪. গম সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে ভালো পাত্র কী কী?

১৫. বীজ সংরক্ষণের জন্য ড্রামের পাইপের মধ্যে কী ঝুলিয়ে দেওয়া হয়?

১৬. 'ড্যানেজ' বলতে কী বুঝায়?

১৭. গুদামজাত গম ফসলে মোট কতটি পোকা বেশি আক্রমণ করে?

১৮. শুসরী পোকার শরীর চ্যাপ্টা হওয়ায় এটি কী করে?

১৯. আটার মিলে বিভিন্ন ক্ষতি করে কোন পোকা?

২০. গম মিলিংএ গমবীজের কোন কোন স্তর বাদ পড়ে?

২১. যাঁতা থেকে প্রাপ্ত আটা দ্বারা কেক, বিস্কুট, পাউরুটি বানানো যায় না কেন?

২২. আধুনিক গম মিলিং-এর পর্যায় কয়টি ও কী কী?

২৩. গমের হালকা অপদ্রব্য যেমন- খড়কুটা, ধুলাবালি দূর করার যন্ত্রের নাম কী?

২৪. ম্যাগনেটিক স্ক্রিন দ্বারা কী করা হয়?

২৫. গম কন্ডিশনিং বলতে কী বুঝায়?

২৬. গম ভিজালে কতভাগ পানি শোষণ করে গম নরম হয়?

২৭. গম মিলিং-এর পর ময়দা পেতে কতটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়?

২৮. ক্রাশিং রোলার দিয়ে কী করে?

২৯. গম মিলে কয় জোড়া রিডাকশন রোলার থাকে?

৩০. উড়ন্ত অবস্থা থেকে ময়দার কণা পৃথক করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?

৩১. গম মিলিং-এর প্রবাহ চিত্রটি লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. গমের পরিচিতি ও গমের কয়েকটি জাতের বৈশিষ্ট্য লেখ।

২. গমের মৌসুম ও গম দানার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

৩. গমের পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

৪. বড় ড্রামে গমের সংরক্ষণ কীভাবে করে?

৫. গম ফসলের ক্ষতিকারক ১০টি পোকার নাম লিখ।

৬. শুসরী পোকা ও ক্যাডেল পোকা গমের কী ক্ষতি করে?

৭. গম পরিষ্কারকরণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

৮. গম মিলিং-এর ৪টি ধাপ কী কী? প্রথম দুটি ধাপের বর্ণনা দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গমের প্রধান ৫টি জাত, মৌসুম ও গমবীজের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ বর্ণনা কর।

২. গম সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৩. গোলাজাত গম ফসলের ক্ষতিকারক ১১টি পোকার নাম এবং যে কোনো ৪টি পোকার ক্ষতির বর্ণনা দাও।

৪. গম কন্ডিশনিংসহ গম মিলিং প্রক্রিয়ার ধাপ বর্ণনা কর।

অধ্যায়-০২

গম থেকে খাদ্য উৎপাদন

ভূমিকা : গম পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ফসল। পৃথিবীর পশ্চিমা দেশগুলোতে অধিক পরিমাণে গম উৎপাদন হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে গমের ফলন ভালো হয়। গম থেকে আমরা আটা ময়দা ও সুজি খাদ্য হিসেবে পেয়ে থাকি। বিভিন্ন প্রকার গম পৃথিবীতে উৎপন্ন হলেও গমকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- শক্ত ও নরম। শক্ত গমে তুলনামূলকভাবে বেশি প্রোটিন থাকে এবং উত্তম ধরনের ময়দা উৎপন্ন হয় যা থেকে স্থিতিস্থাপক খামির পাওয়া যায়। অপর পক্ষে নরম গমে প্রোটিন কম থাকে এবং ময়দা হয় দুর্বল প্রকৃতির এবং এ ময়দা কেক তৈরির জন্য ভালো। গম ব্যবহারের পূর্বে অবশ্য ময়দা বা আটায় রূপান্তর করা হয়।

গম ভাঙার পূর্বে গমের সাথে মিশ্রিত অন্য বীজ ধুলা, কাঁকর ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়। শুকানো গমের আর্দ্রতা ১৪% থাকে। চূড়ান্ত ময়দায় ৯% বা তার কম জলীয় অংশ থাকলে এবং আদ্রতা প্রতিরোধী মোড়কজাত করলে ময়দা সংরক্ষণ কাল সন্তোষজনক হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ময়দায় জলীয় অংশের পরিমাণ ১৪% এর কম রাখা হয় না। যার কারণে ময়দা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আটা, ময়দাও সুজি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার খাবারের একটি ছক নিম্নে দেওয়া হলো-

২.১ গম থেকে (আটা, ময়দা ও সুজি উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য)

আটা থেকে খাদ্য	ময়দা থেকে বিভিন্ন খাদ্য			সুজি থেকে খাদ্য
	নোনতা খাবার	মিষ্টান্ন	বেকারি	
আটার ছাতু	লুচি	খাজা, গজা	বিস্কুট ও টোস্ট বিস্কুট	সুজির রুটি
আটার হালুয়া	পরোটা	মুড়ালী	নান খাটাই	সুজির হালুয়া
স্যাঁকা রুটি	মোগলাই পরোটা	বালুশায়ী	কুকিজ	সুজির বরফি
তন্দুর রুটি	বাখরখানি	ডোনাট	কেক	নেশেস্তার হালুয়া
পুরি	লাচ্ছি সেমাই, নুডলস	সেমাই	পাউরুটি ও বনরুটি	সুজির পায়েস
ডালপুরি	শিঙাড়া	ম্যাকারনি	পিজা, চিকেন বন	
	ভেজিটেবল রোল		বার্গার	
	সমুচা		স্যান্ডউইচ	
	নিমকপারা			

২.২ গম থেকে আটা, ময়দা ও সুজি :

আটা : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গম মিলে ভেঙে যে গুঁড়ি পাওয়া যায় তাই আটা। আটা প্রস্তুত করার সময় শুধু গমের বাইরের আবরণ বা ভুসি ছেটে বাদ দিয়ে বাকি শস্যদানা গুঁড়া করে তৈরি করা হয়। গমের প্রায় সমস্ত

পুষ্টি উৎপাদন আটায় বর্তমান থাকে। আটাতে চাল অপেক্ষা বেশি আমিষ, প্রচুর ভিটামিন বি, ম্যাঙ্গানিজ লবণ পাওয়া যায়। গমে বহিস্তর বা খোসার ফাইটিক এসিড আটাতেও থাকে। ফাইটিক এসিড স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য আটা চালনি দিয়ে চেলে ভুসি বাদ দিয়ে খাওয়া উচিত।

ময়দা : উন্নতমানের গম ভেঙে চালনি দিয়ে চেলে যে সূক্ষ্ম গুঁড়ি পাওয়া যায় তাই ময়দা। গমের ভুসি বা ব্রান ছেটে শুধু দানার ভেতরের শ্বেতসার অংশ নেওয়া হয় বলে গম থেকে ৭০-৭২% ময়দা পাওয়া যায়। ময়দা পানিতে মেশালে ময়দায় অবস্থিত গ্লুটেন নামক প্রোটিন একপ্রকার আঠালো পিণ্ড বা খামিরে পরিণত হয়। এজন্য ময়দা পানিতে মিশিয়ে সহজেই রুটি বা লুচি তৈরা করা হয়।

ময়দায় গ্লুটেন কম হলে বিস্কুট বা কেক তৈরির উপযোগী হয়। কিন্তু পাউরুটি বা রুটি তৈরির উপযোগী হয় না। ময়দার গ্লুটেন এর পরিমাণ বেশি হলে এর কাঠিন্য বাড়ে, শক্তি বাড়ে। এই ময়দার খামির টেনে ধরলে সহজে ছিড়ে না, খামির ফুলে ওঠে। এজন্য অনেক দিন রাখলে ময়দা নষ্ট হয় না। কিন্তু আটা নষ্ট হয় বলে বেশি দিন রাখা যায় না। পুষ্টিমানের দিক থেকে ময়দা আটা থেকে নিচু মানের। ময়দায় শ্বেতসার ছাড়া অন্যান্য পুষ্টি কম থাকে।

গ্লুটেন : আটা ও ময়দায় অবস্থিত প্রোটিনকে গ্লুটেন বলে। ময়দায় মণ্ড বা খামির তৈরি করে তা সারারাত ভিজিয়ে পরদিন তা কচলিয়ে যে আঠালো বা থকথকে পদার্থ বের হয় তাহাই গ্লুটেন। গ্লুটেরের টুকরা ১০-১২ সে.মি বর্গাকার ও ১ সে.মি পুরু করে কেটে এক ঘন্টা লবণ পানিতে সিদ্ধ করে সয়াসস মাখিয়ে ফ্রীজে সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তীতে তা তরকারি সহযোগে রান্না করে খাওয়া যায়।

সুজি : উন্নতমানের ভালো পরিষ্কার গম মেশিনে ভেঙ্গে সুজি তৈরি করা হয়। মেশিনে গম ভেঙ্গে সুবিন্যস্ত করে শোধন করার পর যে মধ্যম মানের বস্তু পাওয়া তাই সুজি। সুজির রং হালকা ঘিয়ে বা সাদা এবং স্বভাবসুলভ স্বাদ ও গন্ধ থাকবে। সুজি কয়েক ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলে বিশুদ্ধ শ্বেতসার ও গ্লুটেন আলাদা হয়। এ বিশুদ্ধ শ্বেতসারকে নেশেস্তা বলে। নিম্নের ছকে আটা ও ময়দার পার্থক্য এবং পরবর্তী ছকে আটা, ময়দা ও সুজির উপাদান দেখানো হলো-

আটা ও ময়দার মধ্যে পার্থক্য

ক্র নং	আটা	ময়দা
১	প্রতি কেজি গম থেকে আটার পরিমাণ বেশি হয়।	কিন্তু ময়দার পরিমাণ কম হয়।
২	আটা দেখতে আঁশযুক্ত ও নিম্নমানের	ময়দা দেখতে সুন্দর ও মান উন্নত
৩	রান্না হতে বেশি সময় লাগে।	দ্রুত রান্না করা যায়।
৪	দামে সস্তা ।	দাম বেশি
৫	দানার ফাইটিক এসিড অপসারিত না হওয়ায় হজমে অসুবিধা হতে পারে।	ফাইটিক এসিড অপসারিত হওয়ায় দ্রুত শোষিত হয়।
৬	স্বাস্থ্যসম্মত।	ততটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

২০২২

আটা, ময়দা ও সুজির খাদ্য উপাদান

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	আটা	ময়দা	সুজি
০১.	আমিষ (গ্রাম)	১২.১	১১.০	১০.৪
০২.	শ্বেতসার (গ্রাম)	৬৯.৪	৭৩.৯	৭৪.৮
০৩.	চর্বি (গ্রাম)	১.৭	০.৯	০.৮
০৪.	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	৪৮	২৩	১৬
০৫.	লৌহ (মি. গ্রাম)	১১.৫	২.৫	১.৬
০৬.	ফসফরাস (মি. গ্রাম)	৩৫৫	১২১	১০২
০৭.	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	০.৪৯	০.১২	০.১১
৮.	রাইবোফ্লাবিন (মি. গ্রাম)	০.১৭	০.১৭	০.০৩
৯.	থায়াসিন (মি. গ্রাম)	৪.৩	২.৪	১.৬
১০.	ক্যালরি	৩৪১	৩৪৮	৩৪৮

২.৩ সেমাই ও নুডলস তৈরি :

সেমাই : মিষ্টান্নের মধ্যে সেমাই এর নাম প্রথমে আসে। শক্ত ও অর্ধশক্ত গম থেকে প্রাপ্ত ময়দা বা সুজি দিয়ে সেমাই তৈরি করা হয়। এক্সট্রুডার মেশিন দিয়ে সেমাই তৈরি করা হয়। কাঁচা সেমাই শুকানোর জন্য ওভেন বা ড্রায়ারের প্রয়োজন হয়। সেমাই তৈরিতে ময়দা, লবণ, তেল, প্রিজারভেটিভ, স্টার্চ ও হাইড্রোজের প্রয়োজন হয়। একুয়ার সাথে ময়দা, প্রিজারভেটিভ লবণ, হাইড্রোজ ইতাদি মিশিয়ে উচ্চ চাপে দ্রুত এক্সট্রুডিং করতে হয়। তারপর ওভেনে শুকিয়ে সেমাই তৈরি করা হয়। সেমাই প্যাকেট করে বাজারজাত করা হয়।

লাচ্ছা সেমাই : ময়দা, ঘি, লবণ, এরারুট সহযোগে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ হাতে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করা হয়। ময়দা পানি মিশিয়ে ভালোভাবে ডলে খামির তৈরি করা হয়। উক্ত খামির থেকে ছোট ছোট বল তৈরি করা হয়। অতঃপর এ বলকে ছিদ্র করে রিং আকৃতি করা হয়। রি-এর ফাঁকে ফাঁকে ঘি ও এরারুট মিশাতে হয়। ছোট রিং টেনে বড় রিং করা হয় আর বারবার ঘি এরারুট মিশাতে হয়। এ প্রক্রিয়া কয়েকবার করতে হয়। তারপর প্রতিটি রিং ছিঁড়ে ছোট ছোট ৭-৮টি বল তৈরি করা হয়। ঘি ও এরারুট মিশানোর ফলে উক্ত বলে অসংখ্য সুতার ন্যায় স্তর সৃষ্টি হয়। উক্ত বল বা গুটিকে হাতে চেপে চ্যাপ্টা করে বেলনে গোল করে বেলে ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ভাজা হয়। তেল ঝরিয়ে লাচ্ছা সেমাই টুকরিতে তোলা হয়। অতঃপর বাজারজাত করা হয়।

নুডলস : নুডলস হচ্ছে ময়দা দিয়ে তৈরি সরু, লম্বা শলাকা আকৃতির তবে সেমাই থেকে মোটা যা দিয়ে নুডলস রান্না করে খাওয়া হয়। নুডলস সোজা বা পেচানো হতে পারে। এটি দেশীয় খাবার না হলেও বর্তমানে অতিপ্রিয় খাবার। এটি ভাত ও রুটির বিকল্প হিসেবে খাদ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। এক সময় এটি চীনা হোটেলে বেশি পাওয়া যেত। কিন্তু এখন অনেকেই নুডলসের প্যাকেট কিনে বাসায় রেখে দেয় পরবর্তীতে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করে।

প্রস্তুতপ্রণালি : উপকরণ হিসাবে ৩০০ গ্রাম ময়দা, ১ টেবিল চামচ লবণ ও ১৫০ মি.লি. পানি লাগবে।

১. কড়াইতে পানি গরম করে লবণ মিশাতে হবে। বড় গামলায় ময়দা রেখে লবণ পানি যোগ করতে হবে। হাত দিয়ে মিশিয়ে গোলাকার করে ময়দার খামির করতে হবে। রুটি বেলা পিঁড়ির উপর ময়দার তাল নিয়ে হাত দিয়ে ঠেসে ঠেসে নিতে হবে।

২. মাখা ময়দার তাল একটি প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে ভরে কমপক্ষে ৩০ মিনিট রেখে দিতে হবে। তারপর পিঁড়ির উপর অল্প ময়দা ছিটিয়ে তার উপর ময়দার তাল গড়িয়ে নিতে হবে।

৩. এবার বেলন দিয়ে বেলে মোটামুটি ৩ মিলি. মি. পুরু একটি রুটি বানাতে হবে। তারপর অল্প ময়দা ছিটিয়ে রুটিটি কয়েক ভাজ করে চওড়ায় ৬-৭ সে.মি. করতে হবে। তার উপর ময়দা দিতে হবে। ৩ মিলি.মি. পুরু রুটিটিকে ফিতার মতো লম্বালম্বি করে কেটে স্তর গুলো আলাদা করতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যেন কাটা অংশে হালকা ময়দার আবরণ থাকে।

৪. বড় একটি সসপ্যানে পানি ফুটিয়ে নুডলসগুলোকে ৮-১০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। পানি ফেলে দিয়ে নুডলস ধুয়ে আবারও পানি ফেলে দিতে হবে। এভাবে স্থায়ী ও দেশীয় পদ্ধতিতে নুডলস তৈরি করা হয়। তবে আমরা যে প্যাকেটজাত নুডলস বাজারে পেয়ে থাকি তা অত্যাধুনিক মেশিনে হাইটেক পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

২.৪ আটা থেকে ছাতু, রুটি, তন্দুর রুটি তৈরি :

১. ছাতু : পরিষ্কার শুকনো গম কড়াইতে ভেজে সামান্য লবণ দিয়ে নেড়ে নামানো হয়। প্রতি কেজি গমে ২-৩ গ্রাম লবণ দেয়া হয়। কড়াইতে গম ভাজার সময় দুই একটা গম পুট পুট করে ফুটে উঠলে সাধারণত গম ভাজা হয়েছে ধরে নেওয়া হয়। তার পর তা পাটায় বেটে চিনি বা গুড় বা পাকা কলা মিশিয়ে খাওয়া যায়। নিম্নবিত্ত শ্রেণির খাদ্যের অভাব হলে ছাতু নিয়মিত খাবার হিসাবে ব্যবহার হয়।

২. স্যাঁকা রুটি : আটা চালনি দিয়ে চেলে তাতে লবণ, পানি পরিমাণমতো দিয়ে ভালো করে ডলে কাই করে খামির করতে হয়। আটা পানি দিলে আটা ফুটে ওঠে এবং পানি এনজাইমকে সক্রিয় করে। অতঃপর খামির থেকে রুটির বল নিয়ে পিঁড়িতে বেলন দিয়ে বেলতে হয়। রুটি রেলার সময় পিড়িতে একটু আটা ছিটিয়ে নিতে হয়। অন্যথায় রুটি বেলতে অসুবিধা হয়। আটাতে পানি দেওয়ার পর আটার গ্লুটেন স্থিতিস্থাপক ও আঠালো হয় এবং আকার বাড়তে থাকে। বেলনে বেলার সময় আটার বলের আকার বৃদ্ধি পায় এবং পাতলা হয়ে গোলাকার হয়। তারপর তাজা হয় ।

মাঝারি আঁচের চুলায় রুটি খুন্তি দিয়ে উল্টেপাল্টে বাদামি রং ধারণ করা পর্যন্ত ভাজা হয়। নরম পাতলা কাপড় কয়েক প্রস্থ ভাজ করে তার উপর স্যাঁকা রুটি রেখে ঐ কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয় । ১ কেজি আটা থেকে প্রায় ১৫-১৬টি রুটি তৈরি হয়। বর্তমানে আটার রুটি মেশিনে তৈরি ও ভাজা হয়।

৩. তন্দুর রুটি : বিশেষ ধরনের চুলা 'তন্দুরে' এই রুটি ভাজা হয় বলে একে তন্দুর রুটি বলে। এ চুলা মাটির তৈরি এবং এর গভীরতা ১৫০ সেমি, এর ব্যাস তলার দিকে ৬০ সে.মি. ও উপরের দিক ৩০ সে.মি.। চুলার মোট আয়তন ১/৩ ভাগ উপরের দিকে বেলানাকার এবং নিচের ১/৩ ভাগ সমতল। চুলার উপরের দিকের দেয়াল ভেতরের দিকে বাঁকানো অনেকটা অবতলের মতো।

২০২২

রুটি বানাবার ৩ ঘণ্টা পূর্বে খামির তৈরি করে কিছু বেকিং পাউডার মিশিয়ে রেখে দেওয়া হয়। রুটির বল নিয়ে রুটি বেলে রুটির আকারের কাপড়ের পুঁটুলির উপর রেখে তা চুলার দেয়ালে চাপ দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তন্দুর রুটি স্যাঁকা রুটির চেয়ে দ্বিগুণ মোটা হয়। চুলার আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে রুটি ভেজে কোলা কোলা তন্দুর রুটিতে পরিণত হয়। অতঃপর দুটি লোহার লম্বা শলাকার সাহায্যে চুলার দেয়ালে থেকে তাজা তন্দুর রুটি তুলে আনতে হয়। সবজি, মাংসের ঝোল ও বুটের ডাল দিয়ে এ রুটি খেতে ভালো লাগে।

৪. পুরি : পুরি তৈরির জন্য আটার খামির থেকে ছোট ছোট লেচি বা বল নিতে হয়। তারপর তার মধ্যে গর্ত করে মিষ্টি বা ঝাল পুর ভরে মুখটা আটকে আবার বেলে রুটির ন্যায় তৈরি করে তেলে ভেজে নিলেই পুরি তৈরি হবে।

৫. ডালপুরি : ছোলার ডাল সিদ্ধ করে বিভিন্ন মশলা দিয়ে ভেজে আলাদা পুর তৈরি করতে হয়। পুর ময়দার বলে ঢুকিয়ে পুরির মতো রুটি তৈরি করে ডুবো তেলে ভাজলে ডালপুরি তৈরি হয় ।

চিত্র : ডালপুরি

২.৫ ময়দা থেকে লুচি, পরোটা, শিঙাড়া, সমুচা, নিমকি :

১. লুচি : ময়দা ও লবণ পরিমাণমতো নিয়ে এর সাথে পানি ও ঘি মিশিয়ে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করতে হয়। খামির তৈরি হলে ছোট ছোট রুটির বল তৈরি করতে হয়। তারপর পিঁড়িতে ঘি মাখিয়ে রুটির বল বেলে ছোট ছোট পাতলা রুটির মতো বানাতে হয়। কড়াইতে ঘি বা তেল গরম করে রুটিগুলো ডুবো তেলে এপিঠ ওপিঠ উল্টিয়ে ভেজে তুলতে হয়। পাত্রে ভাজা লুচি একটির উপর আরেকটি রেখে তেল ঝরিয়ে নিতে হবে।

২. পরোটা : পরিমাণমতো ময়দা, লবণ ও পানি দিয়ে ভালো করে মিশাতে হয়। প্রতি কেজি ময়দায় ৭৫ গ্রাম হিসেবে তেল দিয়ে উক্ত খামির ময়ান দিতে হয়। অতঃপর ছোট ছোট বল করে পিঁড়িতে বেলতে হয়। রুটিতে ঘি দিয়ে তিন ভাজ করে পুনরায় বেলতে হয়। বেলন দিয়ে বেলে চার কোণা আকৃতি করে তৈরি করে তাওয়ায় ঘি গরম করে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে তুললে পরোটা তৈরি হয় ।

৩. শিঙাড়া : আলুর টুকরা, নারিকেল কুচি, মটর ডাল, ফুলকপির টুকরা, চিনাবাদাম ইত্যাদির সাথে লবণ, মরিচ ও গরম মশলার গুঁড়াসহ অল্প পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ঘিয়ে ভেজে শিঙাড়ার পুর তৈরি করা হয়। এ পুরে মাছ, মাংসের কিমা, কলিজা, পনির ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। তারপর রুটির খামির তৈরি করে ডিমের

আকারের ন্যায় রুটি বেলে মাঝ বরাবর কাটা হয়। কর্তিত অংশ হাতে নিয়ে পানের খিলির মতো ভাজ দিয়ে তার মধ্যে পুর ভরে দিতে হয়। সামান্য পানি দিয়ে শিঙাড়া জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর চোখা মুখ উপরে রেখে থালায় সাজিয়ে রাখতে হয়। কড়াইয়ে তেল গরম করে হালকা আঁচে ১৫-২০ মিনিট ভাজতে হয়। হালকা বাদামি ও মচমচে হলে চুলা থেকে নামিয়ে সসসহ খাওয়া যায়।

৪. নিমকপারা : ময়দায় বেকিং পাউডার ও ঘি বা ডালডা মিশিয়ে ময়ান দিতে হয়। তারপর পরিমাণমতো লবণ, পানি দিয়ে ময়দার খামির তৈরি করতে হয়। ময়দায় কালিজিরা মিশিয়ে রুটির জন্য বল তৈরি করতে হয়। পিঁড়িতে ময়দা ছিঁটিয়ে রুটি বেলতে হয়। ছুরি দিয়ে রুটি ছোট ছোট বরফি আকারে কাটাতে হয়। ডুবো তেলে উক্ত বরফি হালকা আঁচে অনেকক্ষণ ভাজতে হয়।

৫. সমুচা : আদা, রসুন, মরিচ, গোলমরিচ, এলাচি বেটে নিতে হবে। মাংস কিমা করে বাটা মসলা, তেজপাতা, লবণ, তেল পানি দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে রান্না করতে হবে। মাংসে কারি পাউডার দেওয়া যেতে পারে। পানি শুকালে পেঁয়াজ, ধনেপাতা, কাঁচামরিচ দিয়ে ভেজে নামাতে হবে।

ময়দা পানি ও লবণ মিশিয়ে ময়ান দিতে হবে। ময়দার খামির তৈরি হয়ে গেলে রুটির জন্য ছোট ছোট বল করে নিতে হবে। একটি রুটির উপর তেল দিয়ে তার উপর আর একটি রুটি নিয়ে আবার তেল লাগাতে হবে। এভাবে ৩-৫টি রুটির পাতলা স্তর করে বেলে বড় করতে হবে। তাওয়া গরম হলে বড় রুটিগুলো একসাথে গরম করে নামিয়ে সাবধানে আলাদা করতে হবে। রুটি যেন বেশি ভাজা না হয়। সব নামিয়ে রুটি আলাদা করার পর ছুরি দিয়ে ২০ X ৮ সে.মি. সাইজ করে কাটতে হবে। সামান্য ময়দা পানি দ্বারা গুলিয়ে লেই তৈরি করে রাখতে হবে। এক টুকরা কাটা রুটি ত্রিভুজ আকারে তিন ভাঁজ করে তার মধ্যে কিমার পুর দিতে হবে। অতঃপর সমুচা ডুবা তেলে ভেজে সস বা চাটনিসহ পরিবেশন করতে হবে।

চিত্র : শিঙাড়া

চিত্র : সমুচা

চিত্র : নিমকপারা

২.৬ ময়দা থেকে মিষ্টি খাদ্য :

১. গজা : লুচি তৈরির খামিরের চেয়ে আরো ভালো করে ছেনে নিতে হবে। খামির ভালো করে ছেনে না নিলে গজা ভালো হবে না। কিছু কালিজিরা মিশিয়ে নিতে হবে। চিনি ও পানি চুলায় ভালো করে জ্বাল দিয়ে সিরা তৈরি করে রাখতে হবে। খামির বেলে লুচির মতো করতে হয়। চারদিক থেকে ১.৫ সেমি. করে বাদ দিয়ে ৫-৬টি লম্বা টুকরা করতে হয়। তারপর সাবধানে মাদুরের মতো বেলে দুই দিকে টিপে দিতে হয়। যাতে করে বেলনের হাতলের মতো দুইটি হাত তৈরি হয়। হাতল ধরে গজা ডুবোতেলে অল্প আঁচে ভেজে চিনির সিরায় দিতে হয়। মিনিট খানেক সিরায় ডুবিয়ে রেখে প্লেটে সাজিয়ে রাখা হয়। বিকেলে চায়ের সাথে নাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২. খাজা : এক কেজি ময়দায় ২৫০ গ্রাম ঘি দিয়ে ভালো করে ছেনে খামির তৈরি করতে হয়। খামির থেকে লেচি কেটে ৫-৮ সে.মি. চওড়া ও ১৫-১৮ সে.মি. লম্বা করে রুটি বেলে নিতে হয়। তারপর রুটিতে ঘি-এর প্রলেপ দিয়ে দুইভাজ করে তার উপর ঘি ছড়িয়ে ময়দার ঠুঙ্গির মতো করতে হয়। ঠুঙ্গিটা পিড়ির উপর রেখে হাত দিয়ে চ্যাপ্টা করতে হয়। আবার দুই ভাজ করে ঘি মিশাতে হয়। এ রকম কয়েকবার কুণ্ডলী পাকানো ও ঘি মিশাতে হয়। শেষে লুচির মতো ভেজে পাত্রে তুলে রাখতে হবে। তাহলেই খাজা তৈরি হয়।

৩. মুড়ালী : ময়দা, লবণ, খাবার সোডা ও পানি ভালো করে মিশিয়ে খামির বা মণ্ড তৈরি করতে হয়। তারপর বেলন বা পিড়ির সাহায্যে রুটি তৈরি করতে হয়। ছুরি দিয়ে উক্ত রুটি থেকে ১ X ৮ সে.মি. আকৃতির টুকরা করতে হয়। কড়াইতে তেল গরম করে হালকা আঁচে ভেজে তুলতে হয়। চিনি, রং ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে সিরা তৈরি করতে হয়। সিরা আঁশ আঁশ হলে ভাজা মুড়ালী দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হয়। চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে মুড়ালী খাওয়া ও বিক্রয়ের জন্য তৈরি হয়। গ্রামে ও গঞ্জের মেলায় এ মুড়ালী বেশি পাওয়া যায়।

চিত্র : খাজা

চিত্র : গজা

চিত্র : মুড়ালী

৪. ডোনাট : মুরগির ডিমে সামান্য দুধ, চিনি ও ঘি দিয়ে ফেটাতে হবে। ময়দার সাথে বেকিং পাউডার ও ফেটানো ডিম এক সাথে মিশিয়ে ভালোভাবে ময়ান করে মণ্ড বা খামির তৈরি করতে হয়। পিঁড়িতে সামান্য শুকনা ময়দা দিয়ে তাতে আধা সেমি. পুরু করে রুটি বেলে নিতে হয়। ডোনাট কাটার দিয়ে রুটি কেটে তা ডুবোতেলে ভেজে নিলেই ডোনাট তৈরি হয়ে যাবে। যে কোনো বিস্কুট কাটার নকশা দিয়েও কাটা যায়। ডোনাট বিকেলের নাস্তায় খাওয়া যায়।

৫. জিলাপি : জিলাপি তৈরির জন্য ময়দা ঘন করে গুলে শীতের দিনে দুই দিন এবং গরমের দিনে একদিন ঢেকে রাখতে পারলে ভালো হয়। এছাড়া ময়দা ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে জিলাপি তৈরি করা হয়। চিনি পানিতে গুলে জ্বাল দিয়ে ফুটে উঠলে ময়লা ছেঁকে নিতে হয়। তারপর গোলাপ জল বা কেওড়া জল মিশিয়ে সিরা তৈরি করতে হয়। ময়দার উপর ২/১টি বুদবুদ উঠলে জিলাপি তৈরির উপযোগী হয়। ময়দার উপরের জমানো পানি ফেলে সামান্য জর্দার রং দিয়ে ভালো করে ময়দা ও পানি স্টেয়ারিং করে বা নেড়ে ঘন গোলা তৈরি করতে হয়। চারকোণা মোটা কাপড়ের একটুকরার মাঝে ছিদ্র করে ভিজিয়ে নিতে হয়। তারপর ভিজা কাপড়ে ময়দা গোলা নিয়ে পুঁটলি আকারে নিতে হয়। কড়াইতে তেল বা ঘি গরম করে ময়দার গোলার পুঁটলি কড়াইয়ের উপর ধরতে হয়। গোলা চাপ দিয়ে প্রথমে গোল করে এক প্যাচ ২য় বার ২য় প্যাচ এবং ৩য় বার অর্ধেক প্যাচ করে গোলা গরম তেলে দিতে হয়। এভাবে আড়াই প্যাঁচের জিলাপি পরপর লম্বা করে তৈরি করতে হয়। অল্প আঁচে বাদামি করে ভেজে উল্টেপাল্টে চিনির সিরায় ৮-১০ মিনিট ডুবিয়ে সিরা ঝরিয়ে প্লেটে তুলতে হয়। জিলাপি গরম গরম পরিবেশন করলে অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। ময়দা ছাড়াও মাষকলাই, সয়াবিন ও আলু দিয়ে জিলাপি তৈরি করা যায়।

চিত্র : ডোনাট

চিত্র : জিলাপি

২.৭ সুজি থেকে নেশেস্তার হালুয়া, বরফি ও পায়েস :

সুজি থেকে খাদ্য : সুজি থেকে উৎপাদিত সাধারণ খাদ্যগুলো হচ্ছে সুজির রুটি, হালুয়া, বরফি, পায়েস ও নেশেস্তার হালুয়া ইত্যাদি।

১. সুজির রুটি : পরিমাণমতো সুজি, লবণ ও পানি দিয়ে ভালোভাবে মেখে একটি মণ্ড বা তাল পাকিয়ে নিতে হয়। অতঃপর তা ফুটন্ত গরম পানিতে ৩০ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। পরে ঐ মণ্ড নিয়ে ভালো করে ময়দা ছানার মতো ছেনে নিতে হয়। অতঃপর খামির বানিয়ে পিঁড়ি ও বেলন দ্বারা রুটি তৈরি করে ভেজে নিতে হয়।

২. সুজির হালুয়া : একটি পাত্রে ২ কাপ চিনি এবং ঘন দুধ ১ কাপ নিয়ে এক সঙ্গে জ্বাল দিতে হয়। অন্য কড়াইতে আধা কাপ ঘি এক কাপ সুজি দিয়ে ভালোভাবে ভাজতে হয়। এরপর দুধ ও চিনির মিশ্রণ দিয়ে নাড়তে হয়। ১৫-২০টি কিশমিশ, পরিমাণমতো বাদাম ও আধা চা চামচ এলাচ গুঁড়া দিতে হয়। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। শক্ত হলে কেটে পরিবেশন করতে হয়। সুজির মোহনভোগ বা বরফির আকার বিধায় একে সুজির বরফিও বলা যায়।

৩. সুজির পায়েস : কড়াইতে সুজি বাদামি করে ভেজে নিতে হয়। অন্য পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হয়। এর সাথে চিনি দিয়ে আরো ঘন করতে হয়। তারপর সুজি দিয়ে অল্প জ্বাল দিতে হয়। বেশি সময় জ্বাল দেওয়া যাবে না। নামাবার সময় কিশমিশ ও এলাচ দিয়ে পায়েস পরিবেশন করতে হয়।

৪. নেশেস্তার হালুয়া : ১৫০ গ্রাম সুজি ৬-৭ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ধীরে ধীরে সুজি থেকে ঘোলা ঘোলা পানি বা মাড় বা শর্করা বের হতে থাকে। পাতলা কাপড় দিয়ে একটি পাত্রে দ্রবণ ছেঁকে নিতে হয়। এই দ্রবণের সাথে ২৫০ গ্রাম চিনি মেশাতে হয়। অন্য পাত্রে ১০০ গ্রাম ঘি নিয়ে তাতে ঐ শর্করা দ্রবণ ঢেলে দিতে হয়। সামান্য ফুড কালার দেওয়া হলে হালুয়া দেখতে আকর্ষণীয় হয়। জ্বাল দেওয়া শুরু হলে ৮-১০ মিনিটের মধ্যে মিশ্রণ থকথকে হয়ে এলে বাকি সব উপকরণ যেমন– কিশমিশ, পেস্তাবাদাম কুঁচি, এলাচ গুড়া, গোলাপজল পরিমাণমতো দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। ঘন হয়ে এলে ঘি মাখানো ট্রেতে ঢেলে ঠাণ্ডা করে নিতে হয়। ঠাণ্ডা হলে পছন্দমতো টুকরা করে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হয়। জেলির মতো দেখতে এই হালুয়া খুবই সুস্বাদু ও আকর্ষণীয়।

২০২২

চিত্র : সুজির হালুয়া

চিত্র : পায়েস

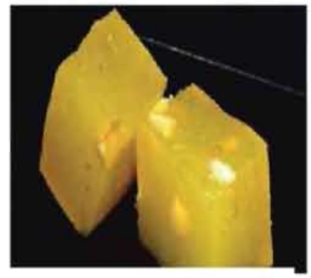

চিত্র : নেশেস্তার হালুয়া

২.৮ ময়দা থেকে বেকারি খাদ্য ঃ

১. বিস্কুট তৈরি : আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের বিস্কুট তৈরি হচ্ছে। কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে রপ্তানিযোগ্য বিস্কুটও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু মফস্বল শহর ও গ্রামে ইট ও মাটি নির্মিত চুল্লিতেও বিস্কুট তৈরি হয়ে থাকে। বিস্কুট তৈরির অনেক ফর্মুলা আছে। নিম্নে একটি সাধারণ পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো-

উপকরণ :

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ	ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ
০১	গমের ময়দা	৩২০ গ্রাম	৬	ডিম	২ টা
০২	চিনি (পাউডার)	১৫০গ্রাম	৭	খাবার লবণ	২ গ্রাম
০৩	দুধ (পাউডার)	৫ গ্রাম	০৮	বেকিং পাউডার	৩ গ্রাম
০৪	অথবা তরল দুধ	১৫ মি.লি	০৮	ভ্যানিলা	০.৫ মিলি
০৫	ঘি	১০ গ্রাম	১০	অরেঞ্জ অয়েল	২.৫ মিলি

প্রস্তুতপ্রণালি : একটি পাত্রে ময়দা, লবণ, দুধ ও বেকিং পাউডার মিশানো হয়। মিশানোর পর চালুনিতে ছাঁকা যেতে পারে। ভ্যানিলা, অরেঞ্জ অয়েল, ডিম ও ঘি দুই মিনিট ধরে উত্তমভাবে মেশানো হয়। আগের তৈরি শুষ্ক মিশ্রণ এতে আস্তে আস্তে যোগ করা হয়। প্রায় ৩ মিনিট ধরে মেশানোর কাজ চলে। খামির বা ডো তৈরি হলে তা ১৫ মিনিট রেখে দেওয়া হয় এবং তারপর এমনভাবে ঘূর্ণায়মান যন্ত্র দ্বারা চাপ প্রয়োগ করা হয় যাতে ৩ মি.মি. পুরু হয়।

চিত্র : বিস্কুট কাটার

তারপর বিস্কুট কাটার দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাটা হয়। অয়েল পেপার বিছানো বা তৈলাক্ত ট্রেতে বিস্কুটগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয়। এবং বিস্কুটের উপরিভাগে ডিম বা দুধ বা চর্বি দ্বারা হালকা প্রলেপ দেওয়া

২০২২

হয় এবং ১০ মিনিট এভাবে রেখে দেওয়া হয়। চুল্লিতে ২০৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হালকা বাদামি বর্ণ হওয়া পর্যন্ত ১০ মিনিট তাপ দেওয়া হয়। তারপর কক্ষ তাপমাত্রায় বিস্কুট ঠাণ্ডা করা হয়। পলিথিন কাগজের মোড়ক বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে বিস্কুট সিল করা হয়। চুল্লির পরিবর্তে ঘরোয়া ওভেনে বিস্কুট তৈরি করা যায়।

২. কেক তৈরি : কেক তৈরির উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ	ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ
০১	ময়দা	৩০০ গ্রাম	৬	ডিম	৩-৪ টি
০২	চিনি (পাউডার)	২৫০গ্রাম	৭	খাবার লবণ	৩ গ্রাম
০৩	দুধ (পাউডার)	৪০ গ্রাম	০৮	বেকিং পাউডার	৮-১০ গ্রাম
০৪	তরল দুধ	১০০ মি.লি	০৮	ভ্যানিলা	০.৫ মিলি
০৫	বাটার	২০০ গ্রাম	১০		

প্রস্তুতপ্রণালি : একটি পাত্রে ময়দা, বেকিং পাউডার ও লবণ মেশানো হয়। বাটার বা মাখনের সাথে ভ্যানিলা যোগ করে ভালোভাবে মিশানো হয়। এর সাথে আস্তে আস্তে চিনি যোগ করে এমনভাবে নেড়ে মেশানো হয় যাতে সম্পূর্ণ চিনি গলে যায় এবং মিশ্রণ অনেকটা হালকা হয়ে যায়। দুধ ও ডিম উপরোক্ত মিশ্রণে যোগ করে এমনভাবে নেড়ে মেশানো হয় যাতে মিশ্রণটি আরও হালকা হয়। প্রথম ধাপে তৈরিকৃত শুষ্ক মিশ্রণ এবং পরে তৈরি হালকা মিশ্রণে যোগ করে ভালোভাবে মিশানো হয়। কেকের ফর্মা বা ছাঁচে অয়েল পেপার সহকারে ভরা হয়। ১৭৬ ডিগ্রি ফরেনহাইট তাপমাত্রায় ৪০-৪৫ মিনিট ওভেনে তাপ দেওয়া হয়। কেক তৈরি হলে কক্ষ তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয়। তারপর প্যারাপিন কাগজের মোড়কে রাখা হয়।

৩. পাউরুটি তৈরি : পাউরুটি আমাদের দেশের শহর এলাকা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় খাদ্য। পাউরুটি তৈরি কৌশল সহজ ও নিরাপদ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে ঝামেলামুক্ত। বর্তমানে পাউরুটি তৈরির অনেক আধুনিক যন্ত্র এসেছে এবং প্যাকেজিং-এর গুণগতমানের উন্নতি ঘটেছে। পাউরুটি তৈরির প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে (১) ময়দা (২) পানি (৩) ইস্ট (৪) লবণ এবং ঐচ্ছিক উপাদানগুলো হচ্ছে–

ক্রমিক নং	উপাদান	ক্রমিক নং	উপাদান
০১	চিনি	০৫	জারক পদার্থ (পটাশিয়াম ব্রোমেট)
০২	চর্বি ও তেল	০৬	মিনারেল ইস্ট ফিড
০৩	মল্ট ময়দা	০৭	ওয়াটার কন্ডিশনার
০৪	গুঁড়া দুধ	০৮	মোল্ড ও জীবাণু প্রতিষেধক (সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপায়োনেট)

প্রস্তুতপ্রণালি :

১. **চালুনি ছ্যাঁকা :** ময়দা থেকে অপদ্রব্য পরিষ্কার করে, ঝরঝরে করে ও ময়দায় বাতাস প্রবেশ করানো হয়।

২. **ওজন দেওয়া :** সব উপাদানসমূহ (প্রধান ও ঐচ্ছিক) পরিমাণমতো মেপে নিতে হয়।

৩. **মেশানো :** একটি মিক্সিং মেশিনে বা পাত্রে সবগুলো উপাদান ভালোভাবে মেশানো হয়। মিশ্রণটি বেশি শক্ত হবে না, আবার বেশি পাতলাও হবে না। মেশানোর অনুমোদিত সময় হচ্ছে ৩ মিনিট।

৪. **ফারমেন্টেশন (চোলাইকরণ) :** মিশ্রণ বা খামির ফারমেন্টশন চেম্বারে ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২ ঘণ্টা রাখা হয়। এ খামিরের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। যেমন– চিনির সাথে ইস্ট ক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে ময়দার পরতে পরতে জমা হয়। ফলে খামিরের আয়তন বেড়ে যায়।

৫. **নক-ব্যাক বা গ্যাস দূরীভূতকরণ :** ফুলে ওঠা খামিরের উপর বাহির থেকে চাপ প্রয়োগ (হাত দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে) করতে হয় যাতে খামির থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দূরীভূত হয়। চাপ প্রয়োগ করতে হয় কয়েকবার।

৬. **মধ্যবর্তীকালীন প্রুফ :** নক ব্যাকের পর প্রায় ২৫ মিনিট কাল এমনি রেখে দিতে হয়।

৭. **মোল্ডিং :** আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং পাকানো হয়। প্রেসার বোর্ডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। তারপর মোল্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাপে রাখতে হয়।

৮. **চূড়ান্ত প্রুফ :** মোল্ডে ভর্তি করার পর ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৮০% আর্দ্রতায় প্রায় ৫৫ মিনিট রাখতে হয়। এ সময় খামিরের অভ্যন্তরে গ্যাস উৎপন্ন হয়ে রুটির আয়তন বাড়ে। তাছাড়া ময়দার গ্লুটেন নরম ও কোমল হওয়ার কারণে রুটির সর্বত্র গ্যাস ধারণ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। রুটির ভেতরের গঠন সুন্দর ও স্পঞ্জি হয়। তবে এটা ময়দার শক্তি, জারণ দ্রব্যের প্রকৃতি এবং কন্ডিশনের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে।

চিত্র : মোল্ড বা প্যানে খামির ১ ঘণ্টা সংরক্ষণ

৯. **বেকিং বা তাপন :** বেকিং সাধারণত বৈদ্যুতিক ওভেনে করা হয়। চুল্লিতে ২৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ২৫ মিনিট রাখা হয়। এসময় রুটির উপরিভাগ বা ক্রাস্ট এর রং সোনালি হলে রুটি তৈরি সম্পন্ন হয়। বেকিং-এর সময় ওভেনের মধ্যে একটি পাত্রে পানি রেখে স্টিম বা বাষ্প তৈরি করা হয়। এতে রুটির উপরিভাগ উজ্জ্বল হয়, ফাটার সম্ভাবনা থাকে না।

১০. কুলিং ও ঠাণ্ডা করা : কক্ষ তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয় বলে জলীয় কণা ঘনীভূত হতে পারে না। ফলে রুটি সহজে স্টেলিং বা নষ্ট হয় না।

১১. টুকরা বা ফালিকরণ : ছুরি দিয়ে ছোট ছোট স্লাইস করা হয়।

১২. প্যাকেজিং : পলিথিন ব্যাগের মোড়কে ভর্তি করে সিল করা হয়।

পাউরুটি তৈরির ফ্লোচার্ট দেওয়া হলো-

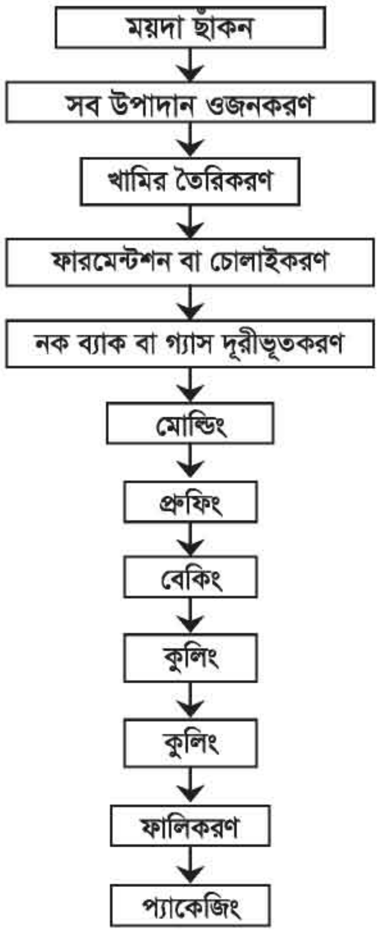

২.৯ ময়দা থেকে ফাষ্টফুড :

১. স্যান্ডউইচ তৈরি : ইংল্যান্ডের এক জমিদার ভীষণ ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি তাড়াতাড়ি খাওয়া সম্পন্ন করার জন্য দুই স্লাইস পাউরুটির মাঝে এক টুকরা মাংস পুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুপুরের খাবার সারতেন। সে থেকে এ খাবারের নাম স্যান্ডউইচ। বর্তমানে এ খাদ্য অতি মুখরোচক ও অতি সহজেই পুষ্টিকরভাবে তৈরি করা যায়।

২০২২

স্যান্ডউইচের জন্য পাউরুটি বা রুটির ভিতর রান্না করা ডিম, মাছ, মাংস, সবজি, পনির, পিকলস, মাখন, মেয়নেজ, সালাদ ইত্যাদি ড্রেসিং দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করা যায়। পাউরুটি ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে তার মধ্যে পছন্দনীয় পুর দিতে হয়। পুরে আকর্ষণীয় রঙের সবজি ও বিভিন্ন স্বাদের খাবার থাকলে ভালো হয়। স্যান্ডউইচ টিস্যু কাগজে বা পলিথিনে মুড়ে ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

পাউরুটিপ্রতি স্লাইসে মাখন বা মেয়নেজ লাগিয়ে, লাগানো পিঠে পুর দিয়ে অন্য একটি স্লাইস মাখন বা মেয়নেজ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এভাবে ২-৩টি স্যান্ডউইচ তৈরি করে একটার উপর আরেকটা স্যান্ডউইচ রেখে ছুরি দিয়ে পাউরুটি স্লাইসগুলোর চতুর্দিকে পোড়া ও শক্ত ধার কেটে ফেলতে হয়। তারপর প্রতিটি স্যান্ডউইচ কোণাকুণি কেটে ত্রিকোণাকৃতি আকারে পেপারে মুড়ে পরিবেশন করা হয়।

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের স্যান্ডউইচ

২। **টোস্ট :** টোস্ট তৈরি করতে পাউরুটির স্লাইসগুলো আগুনে সেঁকে মচমচে হয়ে এলে তা নামিয়ে নিতে হয়। তারপর স্লাইসগুলোর উপর যে পোড়া দাগ পড়ে তা ফেলে দিতে হয়। দুইখানা স্লাইস পাশাপাশি ঘষলেও ময়লা গুঁড়াগুলো পড়ে যেতে পারে। গরম পাউরুটির স্লাইসের উপর মাখনের প্রলেপ দিয়ে তার উপর চিনি বা গোল মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে টোস্ট তৈরি করতে হয়।

৩। **ফ্রেঞ্চ টোস্ট :** ডিম ভেঙে ভালো করে ফেটিয়ে তার সাথে পেঁয়াজ বাটা, লবণ ও মরিচের গুঁড়া মিশাতে হয়। তারপর এ মিশ্রণের মধ্যে পাউরুটির স্লাইস ডুবিয়ে নিয়ে কড়াইয়ে তেল গরম করে এপিঠ ওপিঠ লাল করে ভেজে নিতে হয়। এভাবে ফ্রেঞ্চ টোস্ট তৈরি করে নাস্তা হিসেবে দেওয়া হয়। একে বোম্বে টোস্টও বলে।

৪। **পিজ্জা :** এটি ময়দা দিয়ে তৈরি রুটি, মাংস ও অন্যান্য মশলা সহযোগে তৈরি আকর্ষণীয় ফাস্টফুড। ময়দা, ইস্ট, লবণ ও তেল দিয়ে ভালো করে খামির তৈরি করতে হয়। পুরু করে রুটি তৈরি করে পিজ্জা তৈরির পাত্রে ভরতে হয়। টমেটো সিদ্ধ, পনির স্লাইস, তেলে ভাজা পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা, টমেটো সস ও প্রয়োজনীয় মশলা পাতলা ও চ্যাপ্টা মতো পুরু করে রুটির মাঝে ও চারদিকে বসাতে হয়। তারপর তা ২০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে ওভেনে ২০-৩০ মিনিট বেক করে মজাদার পিজ্জা তৈরি করা যায়।

৫। **ভেজিটেবল রোল :** আলু, ফুলকপি টুকরা করে, চীনাবাদাম, লবণ, মরিচ গরম মশলার গুঁড়ো ইত্যাদি মিশিয়ে অল্প পানি দিয়ে ঘিয়ে ভেজে একত্রে রেখে দিতে হবে। পেস্তাবাদাম, গাজর, মটরশুঁটি, বরবটি ইত্যাদি উক্ত পুরে দেয়া যায়।

ময়দায় তেল দিয়ে পরিমাণমতো লবণ ও পানি মিশিয়ে ময়ান করতে হবে। খামির তৈরি হলে রুটি করার জন্য বল করতে হবে। পিঁড়িতে যতদূর সম্ভব পাতলা করে বেলে রুটি তৈরি করতে হবে। অতপর রুটির মাঝে সবজির পুর দিয়ে রুটি মুড়ে রোল করতে হবে। রোলের দুই মাথা মুড়ে দিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলতে হবে।

চিত্র : পিজা

চিত্র : টোস্ট

চিত্র : ভেজিটবেল রোল

অনশীলনী-০২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গম ভালো হয়?

২. গম কত প্রকার ও কী কী?

৩. নরম গম কী ধরনের এবং এ থেকে কী হয়?

৪. গম ভাঙানোর সময় এর জলীয় অংশ কত থাকা উচিত?

৫. গমকে ময়দা করে মোড়কজাতের সময় এর জলীয় অংশ কত রাখা উচিত?

৬. কেন আমাদের দেশের ময়দা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়?

৭. ময়দার বেকারির খাদ্যগুলো কী কী?

৮. সুজির বিভিন্ন খাদ্যগুলো কী কী?

৯. আটাতে চাল অপেক্ষা কী কী বেশি থাকে?

১০. আটার ভুসি কেন চেলে নেয়া হয়?

১১. গমের ভুসি ছেঁটে বাদ দিলে কয়ভাগ ময়দা পাওয়া যায়?

১২. ময়দা পানিতে মেশালে যে আঠালো পিণ্ড পাওয়া যায় তার নাম কী?

১৩. পুষ্টিমানের দিক দিয়ে আটা ও ময়দা থেকে কোনটা উন্নতমানের?

১৪. ময়দা অনেক দিন রাখলে কেন নষ্ট হয় না?

১৫. গ্লুটেন কাকে বলে?

১৬. গ্লুটেনকে কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়?

১৭. গমের কোন অংশকে সুজি বলে?

১৮. নেশেস্তা কাকে বলে?

১৯. কী ধরনের গম দিয়ে সেমাই তৈরি করে?

২০. সেমাই তৈরি করার মেশিনের নাম কী?

২১. কাঁচা সেমাই শুকানোর জন্য কী প্রয়োজন?

২২. সেমাই তৈরির উপকরণগুলো কী কী?

২৩. নুডলস দেখতে কী রকম?

২৪. নুডলস তৈরির উপকরণগুলো কী কী?

২৫. আটার মধ্যে পানি দিলে কী পরিবর্তন ঘটে?

২৬. ১ কেজি আটা থেকে কয়টি স্যাঁকা রুটি বানানো যায়?

২৭. তন্দুর রুটির চুলার মাপ কত?

২৮. ভাজা তন্দুর রুটি চুলার ভেতর থেকে কীভাবে বের করা হয়?

২৯. পুরি কাকে বলে?

৩০. পুরি ও ডালপুরির মধ্যে পার্থক্য কী?

৩১. পরোটা তৈরিতে প্রতি কেজি ময়দায় কতটুকু তেল দিতে হয়?

৩২. সিঙাড়ার পুরে কী কী দেয়া যায়?

৩৩. ময়দা থেকে উৎপন্ন কোন খাবারে কালিজিরা মেশাতে হয়?

৩৪. গজার আকৃতি কিসের মতো হয়ে থাকে?

৩৫. মুড়ালী কী কী দিয়ে তৈরি করা হয়?

৩৬. ডোনাট কী ধরনের খাবার?

৩৭. সাধারণত কয় প্যাঁচ দিয়ে জিলাপি বানানো হয়?

৩৮. সুজির হালুয়াকে আর কী নামে বলা হয়?

৩৯. নেশেস্তার হালুয়া দেখতে কেমন?

৪০. চুল্লিতে কত তাপমাত্রা ও কত সময়ে বিস্কুট তৈরি করা হয়?

৪১. কেক তৈরিতে কত তাপমাত্রায় কতক্ষণ ওভেনে বেকিং করতে হয়?

৪২. পাউরুটি তৈরির প্রধান উপাদানগুলো কী কী?

৪৩. পাউরুটিতে ইস্ট কেন দেয়া হয়?

৪৪. পাউরুটির ছাঁচে বা মোল্ডে কত তাপে খামির কতক্ষণ সময় রাখতে হয়?

৪৫. স্যান্ডউইচ বলতে কী বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নরম ও শক্ত গমের উপকারিতা ও অপকারিতা কী?

২. আটার বৈশিষ্ট বর্ণনা কর।

৩. ময়দা থেকে সহজেই রুটি বানানো যায় কেন?

৪. গ্লুটেনের প্রয়োজনীয়তা কী?
৫. আটা ও ময়দার মধ্যে পার্থক্য কী?
৬. আটা ও ময়দার পুষ্টিমান লেখ?
৭. সেমাই কীভাবে তৈরি করে?
৮. লাচ্ছা সেমাই তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৯. দেশীয় পদ্ধতিতে কীভাবে নুডলস তৈরি করে?
১০. স্যাঁকা রুটি কীভাবে ভাজা হয়?
১১. তন্দুর রুটি চুলার বর্ণনা দাও।
১২. শিঙাড়া কীভাবে তৈরি করে?
১৩. সমুচা ভাজার প্রক্রিয়া লেখ।
১৪. গজা ও খাজার মধ্যে পার্থক্য কী?
১৫. মুড়ালী বা ডোনাট তৈরির প্রক্রিয়া লেখ।
১৬. সুজির হালুয়া তৈরি করার পদ্ধতি লেখ।
১৭. জিলাপি অথবা নেশেস্তার হালুয়া বানানোর কৌশল বর্ণনা কর।
১৮. বিস্কুট ও কেক তৈরির উপকরণগুলো কী কী?
১৯. পাউরুটি তৈরির ফ্লোচার্টটি লেখ।
২০. স্যান্ডউইচ কীভাবে তৈরি করে লেখ?
২১. টোস্ট ও ফ্রেঞ্চ টোস্ট বলতে কী বুঝায়?
২২. পিজা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. গম থেকে কী কী খাদ্য তৈরি হয়? আটা, ময়দা, সুজি ও গ্লুটেনের বর্ণনা দাও।
২. সেমাই, লাচ্ছা সেমাই ও নুডলস তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. আটা ও ময়দার পার্থক্য লিখ। আটা থেকে রুটি, তন্দুর রুটি ও পুরি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. ময়দা থেকে বিভিন্ন নোনতা খাবার তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. ময়দা থেকে কী কী মিষ্টি খাদ্য তৈরি করা যায়? এগুলোর প্রস্তুতপ্রণালি লেখ।
৬. নেশেস্তা কী? সুজি থেকে বিভিন্ন খাবার তৈরি বর্ণনা কর।
৭. বিস্কুট ও কেক তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৮. পাউরুটি তৈরির উপকরণ ও প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।
৯. ময়দা থেকে স্যান্ডউইচ, টোস্ট, ফ্রেঞ্চ টোস্ট, পিজা ও রোল তৈরির প্রণালি লেখ।

অধ্যায়-৩

ভুট্টার জাত, মৌসুম, পুষ্টিমান, সংরক্ষণ, পোকামাকড় ও মিলিং

ভূমিকা : ভুট্টা একটি অধিক ফলনশীল দানা শস্য। এটি বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় গাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম জিয়া মেইজ। একই গাছে পুরুষ ফুল এবং স্ত্রী ফুল জন্মে। পুরুষ ফুল একটি মঞ্জরী হতে বিন্যস্ত হয়ে গাছের মাথায় দেখা যায়। একে টাসেল বলে। স্ত্রী ফুল গাছের মাঝামাঝি অবস্থায় কাণ্ড ও পাতার কক্ষ থেকে বের হয়। স্ত্রী ফুল পরাগায়িত হয়ে কব মঞ্জরী বা মোচায় পরিণত হয়। মোচার ভিতরে দানা সৃষ্টি হয়। ভুট্টার দানা ক্যারিওপসিস জাতীয় ফল। এতে ফলত্বক ও বীজত্বক এক সাথে মিশে থাকে। তাই ফল ও বীজ আলাদা করে চেনা যায় না।

পৃথিবীতে ভুট্টা উৎপাদনকারী প্রধান দেশসমূহ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও মেক্সিকো। বিশ্বে উৎপাদন ও ব্যবহার দিক দিয়ে ভুট্টা তৃতীয় দানাদার খাদ্য ফসল। মেক্সিকোর প্রধান খাদ্যই হচ্ছে ভুট্টা। ভুট্টার ফলনও বেশি, যেখানে পৃথিবীতে চাল ও গমের হেক্টরপ্রতি ফলন ২.৩ ও ৩.০ টন, সেখানে ভুট্টার হেক্টরপ্রতি ফলন ৬.৬ টন। বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে রবি মৌসুমে মোট ৩.৫৫ লাখ হেক্টর জমিতে মোট ভুট্টা উৎপাদন হয় ২৩.৬১ লাখ মে. টন।

চিত্র : ভুট্টা গাছ

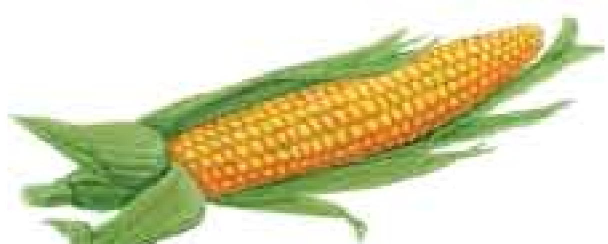
চিত্র : ভুট্টার কব বা মোচা

ভুট্টা একটি বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য উচ্চ ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন ফসল। ভুট্টা একাধারে খাদ্যশস্য, পশু খাদ্য, জ্বালানী ও শিল্পজাত দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ভুট্টা রবি এবং খরিপ উভয় মৌসুমে আবাদ করা হয়। সাথী ফসল হিসেবে ভুট্টার সাথে বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, চীনা বাদাম, আলু এবং ডাল জাতীয় ফসল আবাদ করা যায়। ভুট্টা কিছুটা খরাসহিষ্ণু ফসল। এতে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়ে থাকে।

৩.১ ভুট্টার জাত ও চাষের মৌসুম :

আমাদের দেশে ভুট্টার বেশ কয়েকটি জাত রয়েছে। এর মধ্যে বারি (বি.এ.আর.আই) জয়দেবপুর, গাজীপুর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহ নিম্নরূপ

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
শুভ্রা	১৯৮৬	রবি	৪.৫-৫.৫	১৩৫-১৪৫	দানা সাদা, সেমিফ্লিন্ট
বর্ণালি	১৯৮৬	রবি	৫.৫-৬.০	১৪০-১৪৫	দানা সোনালি হলুদ, সেমিফ্লিন্ট
খৈ-ভুট্টা	১৯৮৬	রবি	৩.৫-৪.০	১২৫-১৩০	দানা হলুদ ফ্লিন্ট
	১৯৯১	রবি	৫.০-৫.৫	১৩৫-১৪৫	দানা উজ্জ্বল হলুদ ফ্লিন্ট
বারি ভুট্টা-৫	১৯৯৮	রবি	৫.০-৫.৫	১৪৫-১৫৫	দানা উজ্জ্বল হলুদ ফ্লিন্ট
বারি ভুট্টা-৬	১৯৯৮	রবি	৬.৫-৭.০	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ সেমিফ্লিন্ট
বারি ভুট্টা-৭	২০০২	রবি	৬.৫-৭.৫	১৪৫-১৫৫	দানা হলুদ, ডেন্ট
বারি মিষ্টি ভুট্টা-১	২০০২	রবি	১০-১০-.৫	১১৫-১২০(কাঁচা মোচা)	দানা হলুদ ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১	২০০২	রবি	৮.৫-৯.৫	১৪০-১৫০	দানা কমলা হলুদ ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-২	২০০২	রবি	৮.০-৯.০	১৪৫-১৫০	দানা কমলা হলুদ সেমিফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৩	২০০২	রবি	৯.৫-১০.০	১৪০-১৪৫	দানা হলুদ ফ্লিন্ট ডেন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৪	২০০২	রবি	৭.৫-৮.৫	১৪০-১৪৫	দানা কমলা হলুদ ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫	২০০৪	রবি	৯.৫-১০.০	১৪০-১৪৫	দানা কমলা হলুদ ফ্লিন্ট কিউ এম পি এম জাত
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৬	২০০৬	রবি	৯.৫-১০.০	১৪০-১৪৫	দানা হলুদ ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭	২০০৬	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪০-১৪৫	দানা হলুদ ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৮	২০০৭	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯	২০০৭	রবি	১১.৫-১২.৫	১৪৫-১৫০	দানা কমলা হলুদ ডেন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০	২০০৯	রবি	১০.০-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ ডেন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১	২০০৯	রবি	১০.৫-১১.৫	১৫০-১৫৫	দানা হলুদ ফ্লিন্ট
বারি বেবি কর্ন-১	২০১৩	রবি	১.২৭-১.৩০	৮৫-১০০	প্রতি গাছে দুইটি মোচা

বিঃদ্রঃ ফ্লিন্ট বলতে চ্যাপ্টা আকৃতি এবং ডেন্ট বলতে দাতের মতো গোলাকৃত বুঝানো হয়েছে।

উপরে বর্ণিত ভুট্টার জাত ছাড়াও আরও দুইটি বিশেষ জাতের ভুট্টার চাষ হয়ে থাকে।

১) মিষ্টি ভুট্টা বা সুইট কর্ন : এটি একটি বিশেষ জাতের ভুট্টা যার মধ্যে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে তাকে মিষ্টি ভুট্টা বলে। এই ভুট্টা সবজি হিসাবে মাছ ও মাংসের সাথে খাওয়া যায়। মিষ্টি ভুট্টা সরাসরি কোটা বা টিনে প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা যায়।

২) বেবি কর্ন : এটি একটি বিশেষ জাতের ভুট্টা। এ জাতের ভুট্টা কচি অবস্থায় খাওয়া হয় বলে তাকে বেবি বলে। এই ভুট্টা কচি অবস্থায় খোসা ছিলে টিনজাত করে রপ্তানি করা যায়। আমাদের দেশে উৎপাদিত বেবি কর্ন চায়নিজ রেস্তোরাঁয় বিক্রি করা হয়।

চিত্র : সুইট কর্ন

চিত্র : বেবি কর্ন

ভুট্টার মৌসুম : ভুট্টা রবি ও খারিফ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের ৩য় সপ্তাহ অর্থাৎ নভেম্বর ১ম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর এর ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত ভুট্টাবীজ বপন করা যায়। খরিপ মৌসুমে ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ভুট্টাবীজ বপন করা যায়।

ভুট্টার দানার গঠন : ভুট্টা দানা বা বীজ, ধানের মতো ক্যারিওপসিস জাতীয় ফল। তবে ভুট্টায় ধানের মতো কোন তুষ নেই। এতে ফলত্বক ও বীজত্বক একসাথে মিশে থাকে তাই ফল ও বীজ আলাদা করে চেনা যায় না। বীজ চ্যাপ্টা ও আয়তকার। বীজের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো-

১. **বীজ ত্বক :** বীজত্বক ফলত্বক মিলে ভুট্টা দানাকে ঘিরে একটি সোনালি অর্ধস্বচ্ছ আবরণ সৃষ্টি করে। এ স্তর দুটি অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ আলাদা করা যায় না।

২. **অন্তর্বীজ :** বীজতকের ভিতর সমদয় অংশকে অন্তর্বীজ বা কার্নেল বলে। অন্তর্বীজের মধ্যে সস্য ও ভ্রূণ থ

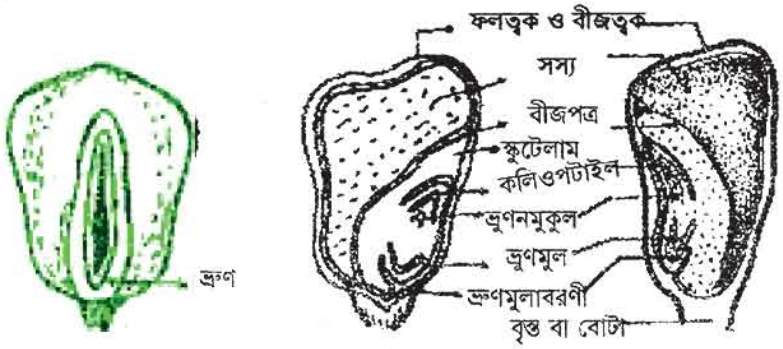

চিত্র : ভুট্টা বীজের বিভিন্ন অংশ

৩. **সস্য বা আন্ডোস্পার্ম :** অন্তর্বীজের অধিকাংশ জুড়ে থাকে সস্য। সস্যে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ ও কিছু আমিষ থাকে।

৪. **ভ্রূণ :** ভুট্টার ত্বকের উপর ত্রিকোণাকার একটি সাদা অংশ দেখা যায়। একে ডেলটয়েড অবতল বলে। এ অবতলে ভ্রূণ অবস্থান করে। ভ্রূণ, ভ্রূণাক্ষ ও বীজপত্র নিয়ে গঠিত। বীজপত্র সস্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে ভ্রূণকে সরবরাহ করে। বীজপত্রের নিচের পাতলা স্তরকে এপিথেলিয়াল স্তর বলে। বীজপত্রের উপর ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণ মুকুলাবরণী বা কলিওপটাইল এবং ভ্রূণাক্ষের নিচে ভ্রূণমূল বা ভ্রূণমূলাবরণী বা কলিওরাইজা থাকে।

৩.৩ ভুট্টার পুষ্টিমান :

ভুট্টা যথেষ্ট শক্তিদায়ক ও পুষ্টিকর খাদ্য। খাদ্যের প্রায় সবকটি উপাদান এতে বিদ্যমান। পুষ্টিমানের দিক দিয়ে ভুট্টা গমের সমমানের হলেও চালের চেয়ে অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ। ভুট্টায় যথেষ্ট ক্যারোটিন আছে কিন্তু চালে নেই। তবে গমে ভুট্টার প্রায় এক-তৃতীয়াংশে ক্যারোটিন থাকে। চাল ও গমের তুলনায় ভুট্টায় চর্বির পরিমাণও অনেক বেশি থাকে।

ক্রমিক নং	উপাদান	ভুট্টার দানা		গমের আটা (পুরো)	চাল (কলে ছাঁটা)
		শুকনা	কাঁচা		
১.	শক্তি (কিলোক্যালরি)	৩৪২	১২৫	৩৪১	৩৪৬
২.	আমিষ	১১.১	৪.৭	১২.১	৬.৪
৩.	শর্করা (গ্রাম)	৬৬.২	২৪.৬	৬৯.৪	৭৯.০
৪.	চর্বি (গ্রাম)	৩.৬	০.৯	১.৭	০.৪
৫.	খনিজ দ্রব্য (গ্রাম)	১.৫	০.৮	২.৭	১.৭
৬.	আঁশ (গ্রাম)	২.৭	১.৯	১.৯	০.৩
৭.	ক্যারোটিন (মি.গ্রাম)	৯০.০	৩১.০	২৯.০	-
৮.	থায়ামিন (মি.গ্রাম)	০.৪	০.১	০.৫	০.২
৯.	থায়াসিন (মি.গ্রা)	১.৮	০.৬	৪.৩	৩.৮
১০.	ভিটামিন-সি (মি.গ্রা)	-	৬.০	-	-
১১.	জলীয় অংশ	১৪.৯	৬৭.১	১২.২	১৩.৩

ভুট্টার আমিষে লাইসিন ও ট্রিপটোফেন নামক দুইটি এমাইনো এসিডের পরিমাণ খুব কম। ফলে প্রোটিনের গুণাগুণ ততটা উন্নত নয়। তবে বর্তমানে অধিক পরিমাণে লাইসিন ও ট্রিপটোফেন সম্পন্ন আমিষসমৃদ্ধ ভুট্টার জাত উদ্ভাবিত হওয়ায় ভুট্টার গ্রহণযোগ্যতাও অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে। ভুট্টায় বিদ্যমান অনুখনিজ পদার্থের পরিমাণও চালের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি এবং গমের প্রায় সমপর্যায়ের। নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো-

সারণি : ভুট্টা, চাল ও গমের তুলনামূলক অনু খনিজ পদার্থের পরিমান (মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম)

ক্রমিক নং	অনু খনিজ পদার্থ	ভুট্টা	গম	চাল
১.	ক্যালসিয়াম	১০.০	৪১.০	৯.০
২.	ফসফরাস	৩৪৮.০	৩০৬.০	১৪৩.০
৩.	ম্যাগনেসিয়াম	১৪৪.০	১৩৮.০	৩৮.
৪.	সোডিয়াম	২৫.৯	১৭.১	১০.০
৫.	পটাশিয়াম	২৮৬.০	২৮৪.০	১১৭.০
৬.	সালফার	১১৪.০	১২৮.৯	৭৯.০
৭.	লৌহ	২.০	৪.৯	৪.০
৮.	ক্লোরিন	১০২.০	৭৭.০	৭২.০

উৎস : গোপলান ও অন্যান্য-১৯৮১

ভুট্টার দানায় ৭-১২% তেল থাকে। এ তেল বর্ণহীন ও গন্ধহীন । শিশুদের বৃদ্ধি, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য বিশেষ উপকারী। ভুট্টার তেল লিভার ও কিডনির জন্য উত্তম। এছাড়া এ তেল কোলেস্টেরল মুক্ত বিধায় হৃদরোগের আশঙ্কা কম। ভুট্টা মানুষের মতো হাঁস-মুরগির জন্যও পুষ্টিকর। হলুদ ভুট্টার দানায় ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি এজন্য ডিমের কুসুমের রং হলুদ হয় এবং হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। প্রচলিত গো খাদ্যের তুলনায় ভুট্টার পাতা ও গাছ উত্তম গো খাদ্য। ভুট্টার পাতায় ক্ষতিকর হাইড্রো-সায়ানিক বা প্রুসিক এসিড নাই।

৩.৪ ভুট্টা সংরক্ষণ

১. **টিনের উন্নতমানের পাত্রে :** এম এস শীট দিয়ে এ পাত্র তৈরি করা হয়। মুখের ঢাকনা এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন এর চারদিক তুষ মিশ্রিত কাঁদামাটি দিয়ে বাতাস চলাচল বন্ধ করা যায়। ঢাকনায় ২.৫ ও ২.৫ সে.মি. মাপের এক টুকরা কাঁচ বসানো থাকে তাই ঢাকনা না খুলেও ভিতরের বীজের অবস্থা ভালো দেখায়।

২. **মাটির উন্নত পাত্র :** মাটির তৈরি পাত্রের ভিতরে পুরু পলিথিন ব্যাগ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ভুট্টা বীজ রেখে তাপ দিয়ে ব্যাগের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাটির পাত্রের মুখ এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে সিলিং পদার্থ আটকে দিয়ে বায়ু চলাচল রোধ করা যায়।

৩. **পলিথিনসহ পাটের ব্যাগ :** পাটের তৈরি ব্যাগের ভিতরে শুধু পলিথিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ভুট্টার দানা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ভরে এর মুখ তাপ দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ দড়ি দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে ব্যাগটি ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

চিত্র : ভুট্টা সংরক্ষণের টিন, পাত্র ও পলিথিন ব্যাগ

৩.৫ গোলাজাত ভুট্টার পোকামাকড় :

গুদামজাত ভুট্টা শস্যদানার ক্ষতিকারক পোকাসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে।

১. চালের শুঁড় পোকা বা রাইস উইভিল।

২. ধানের সরুই পোকা বা রাইস মথ।

৩. ভুট্টার শুঁড় পোকা বা মেইজ উইভিল।

উপরোক্ত পোকার মধ্যে প্রথম দুইটি পোকার ক্ষতির প্রকৃতি সম্পর্কে নবম শ্রেণির ২য় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় শুধু ভুট্টার শুঁড় পোকার বর্ণনা দেওয়া হলো-

ভুট্টার শুঁড় পোকা বা মেইজ উইভিল : এই পোকা চালের শুঁড় পোকার মতোই তবে দেখতে কিছুটা কালো এবং লম্বায় বড় (৩.৫-৪০ মি.মি) এ পোকা ভুট্টার দানা ছাড়াও চাল, গম ও যবের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকার আক্রমণ ও লক্ষণ চালের শুড় পোকার মতোই।

৩.৬ গোলাজাত ভুট্টার পোকামাকড় দমন :

ক. সতর্কতা অবলম্বন :

১. ভুট্টার শস্যদানা গোলাজাত করার পূর্বে ৩-৪ বার ভালোভাবে শুকিয়ে দানার আর্দ্রতা ১০-১২% এর মধ্যে রাখতে হবে।

২. দানা গোলাজাত করার পূর্বে গোলাঘরের দেয়াল বা মেঝেতে কোনোরূপ ফাটল থাকলে তা বন্ধ করতে হবে। ঘরের চারপাশ পরিষ্কার করতে হবে।

৩. গোলাঘর, ভুট্টা রাখার ব্যাগ বা পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে সেভিন বা ম্যালাথিয়ন ১০% পাউডার দ্বারা শোধন করা যেতে পারে। অথবা ডেসিস ২.৫ অনুমোদিত হারে স্প্রে করা যায়।

৪. গোলা ঘরে (চিত্র) প্রয়োজনমতো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং বৃষ্টির দিনে যেন পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫. সঠিক পাত্রে সঠিকভাবে ভুট্টা সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. মাঝে মাঝে ভুট্টার দানা শুকাতে হয়। এতে ভেতরের কীড়া মারা যায়।

চিত্র : ভুট্টা সংরক্ষণ গোলাঘর

খ. কীটনাশক প্রয়োগ :

১. প্রতি কেজি শস্য দানায় ১ গ্রাম সেভিন বা মালাথিয়ন ১০% পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

২. গুদামঘরে স্তূপীকৃত প্রতি টন শস্যের জন্য ৩-৬টি ফসটসিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. গুদামঘরে বস্তায় রাখা স্তূপীকৃত প্রতি ১০০০ ঘনফুট দানার জন্য ১৫-২৫ টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা প্রিমিফস মিথাইল (একটেলিক) ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. প্রতি কেজি ভুট্টার বীজে ১০মিলি হারে নিম তেল ব্যবহার করে শুড় পোকা দমন করা যেতে পারে। এ ছাড়া নিশিন্দা, বিষকাটালী ও ল্যান্টানা নামক জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৭ ভুট্টা মিলিং :

ভুট্টা মিলিং করলে ভুট্টা থেকে ভুট্টার আটা পাওয়া যায়। এটি গম ভাঙানোর মিলে করতে হয়। তবে ভুট্টা ভাঙানোর জন্য ভিন্ন ধরনের চাকতি ব্যবহার করা হয়। ভুট্টা থেকে আটা তৈরির দুই ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। যথা-শুকনা মিলিং ও ভিজা মিলিং।

শুকনা মিলিং : ভুট্টা থেকে আটা তৈরির জন্য শুকনা মিলিং পদ্ধতিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা (ক) ভ্রূণ সহ মিলিং ও (খ) ভ্রূণ ছাড়া মিলিং।

ভ্রূণসহ মিলিং করে যে আটা পাওয়া যায় তা বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না, কারণ ভ্রূণে ৮৫% তেল জাতীয় পদার্থ থাকে। তাই ভুট্টা ভ্রূণ ছাড়া শুকনো মিলিং পদ্ধতিতে ভাঙানো হয়ে থাকে। জার্ম সেপারেটরের সাহায্যে ভুট্টার ভাঙা দানা ও স্টার্চ থেকে ভ্রূণকে আলাদা করা যায়।

ভুট্টার দানা প্লেট গ্রাইন্ডার বা চাকতির মাধ্যমে গুঁড়া করা হয়। চাকতি যত বেশি জোরে ঘুরবে আটার কণা তত সূক্ষ্ম হয়। চাকতি যদি প্রতি মিনিটে ৫০০-৬০০ আর পি এম (রোটেশন পার মিনিট) এ ঘুরে তবে আটার মান ভালো হয়। যদি চাকতির গতি এর চেয়ে কম হয় তবে আটার কণা মোটা হয়। চাকতির গতি যদি ৩০০ আরপিএম হয় তবে আটার পরিমাণ ১৪.৫-২০ ভাগে নেমে আসে। চাকতির গতির সাথে ভুট্টার আটা ও সুজির পরিমাণ নির্ভর করে।

তা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো-

ক্রমিক নং	প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন গতি	আটার পরিমাণ (%)	সুজির পরিমাণ (%)
১.	৫০০-৬০০	৩৩-৪৫	৬৭-৫৫
২.	৩০০	১৪.৫-২০	৮৫.৫-৮০

ভুট্টার আটায় গ্লুটেন কম থাকে। তাই গমের আটার চেয়ে ভুট্টার আটা তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণে পানি শোষণ করে। গমের ১০০ গ্রাম আটা যেখানে ৫০ মি.লি. পানি শোষণ করতে পারে সেখানে ভুট্টার আটা ১২০ মি.লি পানি শোষণ করে। ভুট্টার আটা মিলিং করার পর পরই কোন পাত্রে বন্ধ রাখলে আটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই মিলিং-এর পর এ আটা ওলট-পালট করে কয়েক ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। ভুট্টার আটায় গ্লুটেন না থাকার করাণে এর সাথে ২০ ভাগ গমের আটা মিশিয়ে রুটি তৈরি করতে হয়। এ ধরনের মিশ্রিত আটার রুটি অনেক সময় নরম হয়। নিম্নে

ভুট্টার শুকনা মিলিং-এর প্রবাহ চিত্র দেওয়া হলো।

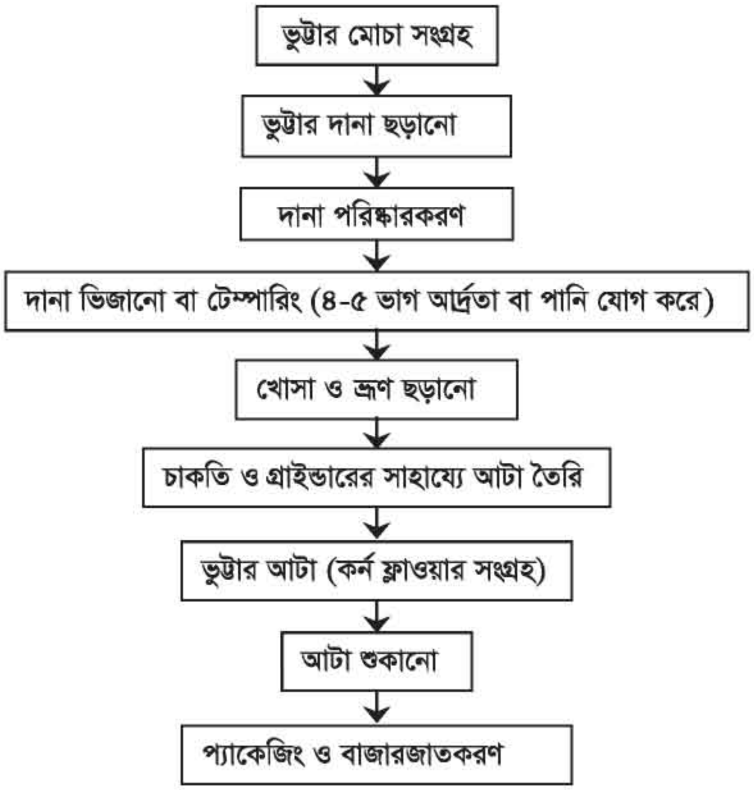

ভিজা মিলিং : এ পদ্ধতিতে ভুট্টা মিলিং করার জন্য ভিজানো হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. **ভুট্টা সংগ্রহকরণ :** পুষ্ট, দোষমুক্ত উন্নত মানের ভুট্টা সংগ্রহ করতে হবে।

২. **ভুট্টা শুষ্ক ও পরিষ্কারকরণ :** ভালোভাবে রোদে বা প্রয়োজনে যান্ত্রিক ড্রায়ারে ৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শুকানো ভুট্টা ভালোভাবে ঝেড়ে ধুলাবালি, কাঁকর বা খড়কুড়া, পোকামাকড়ের মল ও লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে।

৩. **ভুট্টা ভিজানো বা স্টিপিং :** প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভুট্টাকে ৩০-৪০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এ সময় যাতে ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাক জন্মাতে না পারে সেজন্য ০.১% হারে সালফার ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করে দেয়া হয়। ভুট্টা পানিতে ভিজালে দানার আয়তন বেড়ে যায় এবং খোসা , আঁশ ও অঙ্কুর বা ভ্রূণ ইত্যাদি আলাদা করা সহজ হয়।

৪. **অঙ্কুর বিচ্ছিন্নকরণ :** ভেজানো ভুট্টা দানাকে হালকাভাবে ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে দানা থেকে ভ্রূণের অংশটি আলাদা হয়ে যায়। এরপর ভ্রূণ আলাদাকরণ বা জার্ম সেপারেটর মেশিন দ্বারা ভুট্টার ভ্রূণ ও স্টার্চ আলাদা করা হয়।

৫. অঙ্কুর আলাদাকরণ : তেল সমৃদ্ধ ভুট্টার ভ্রূণগুলো ভালো করে চিকন চালনি দিয়ে ছেঁকে ধুয়ে পরিষ্কার করে আলাদা করা হয়। মোটা কাপড়ের সাহায্যে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে স্টার্চ মুক্ত করা হয়। তারপর ভ্রূণ থেকে নিষ্কাশন পদ্ধতিতে ভুট্টার তেল আহরণ করা হয় এবং পশুখাদ্য হিসেবে খৈল পাওয়া যায়।

৬. মিলিং : অবশিষ্ট ভুট্টার কণা ও খোসাসহ পানির দ্রবণ থেকে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন দ্বারা গ্লুটেন আলাদা হয়।

৭. স্টার্চ ড্রাইং : গ্লুটেন অপসারণের পর উক্ত ভুট্টার স্টার্চ ড্রায়ার দ্বারা শুকিয়ে বিশুদ্ধ স্টার্চ বা ভুট্টার আটা পাওয়া যায়। সুতরাং একই সাথে ভুট্টার তেল, খৈল, আমিষ ও স্টার্চ (মোচ চারটি পদার্থ) পাওয়া যায়।

৮. প্যাকেজিং : এরপর এই আটা শুকিয়ে বাজারজাত করা হয়। অথবা এই আটা কর্ন সিরাপ, ডেক্সট্রোজ, স্টার্চ, কাগজ গাম বা খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার হয়।

ভুট্টার ভিজা মিলিং ফ্লোচার্ট নিম্নে দেওয়া হলো-

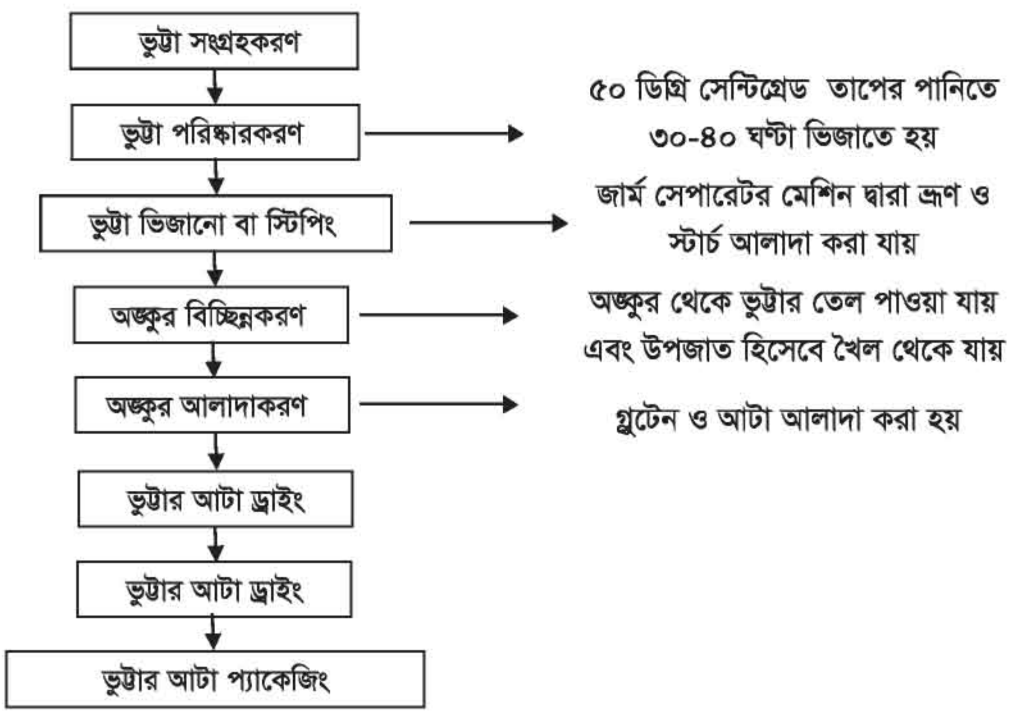

৩.৮ ভুট্টা মিলিং এর উপজাত :

ভুট্টা এমনই একটি বহুমুখী ফসল যার প্রতিটি অংশই বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। ভুট্টার আটা যেমন মানুষের খাদ্য, তেমনই পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। ভুট্টার দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে যেমন উপাদেয় তেমনি এর সবুজ পাতা ডাঁটা ও দানা গরু-মহিষ ও হাঁস-মুরগির অত্যন্ত উৎকৃষ্ট খাদ্য।

পশুখাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার : পশু খাদ্য হিসেবে ভুট্টা চার প্রকারের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন -

ক) সবুজ পাতা ও চারা গাছ : ভুট্টার সবুজ পাতা অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের গো-খাদ্য। শুধু গো-খাদ্য হিসেবে সবুজ পাতা উৎপাদন করতে হলে ভুট্টা ঘন করে আবাদ করা হয়। গাছের বয়স ১ মাস হলে পর্যায়ক্রমে গাছ পাতলা করে তা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শুধুমাত্র সবুজ পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। একই জমিতে একত্রে ভুট্টার দানা ও সবুজ পাতা চাষ করা যায়। অন্য ফসলের সাথে আন্ত ফসল হিসেবেও সবুজ পাতা হিসেবে ভুট্টা চাষ করা যায়। এ ছাড়াও ভুট্টার মোচার সিল্ক কালো হয়ে গেলে মোচার নিচের পাতাগুলো গরু ও মহিষকে খাওয়ানো যায়। ভুট্টার পাতার পুষ্টিমান নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো-

গো-খাদ্যের প্রকার	আমিষ(%)	চর্বি(%)	শর্করা(%)	আঁশ	ক্যালসিয়াম গ্রাম/১০০ কেজি	ফসফরাস গ্রাম/১০০ কেজি
ভুট্টার সবুজ পাতা (কচি পাতা)	১২.১	১.১	৪৪.২	২৯.৬	৬৮.০	২১০
ফুল আসার সময় পাতা	৬.৪	০.৯	৫১.২	২৯.৯	৬১০	১৯০
দানা পুষ্ট হওয়ার সময় পাতা	৫.১	১.৫	৫৯.২	২৬.৯	৪৯০	১৯০
ভুট্টার দানা (হলুদ)	১২.১	-	৭৯.৪	১.৪	২০	৩৩০
ভুট্টার দানা (সাদা)	১০.৪	-	৮১.৪	১.৯	২০	৩৬০
ভুট্টার মোচা	২.১	-	৫৭.৪	৩৬.৫	৫০	৬০
ধানের খড়	৩.৮	৪৩.৬	৪৩.৬	৩০.৬	৩৬০	১১০

উৎস : জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, কৃষি স্টাডি নং ৭৯৬ (১৯৭৫) পশুপালন বিভাগ, বিধান চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

পরিপক্ব গাছ : ভুট্টার মোচা সংগ্রহের পর গাছের ডাঁটা ও আধা পাকা পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মোহর জাতের ভুট্টা এজন্য অত্যন্ত উপকারী। মোচা থেকে গেলেও এ জাতের পাতা যথেষ্ট সবুজ থাকে। গাছের ডাঁটা ও পাতাগুলো ছোট করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে নরম করে ধানের খড় বা কুঁড়া খেসারির ভুসি বা তেলের খৈল মিশিয়ে উত্তম গো-খাদ্য তৈরি করা যায়।

ভুট্টার সাইলেজ : বায়ুরোধক অবস্থায় ঘাস সংরক্ষণ করা হলে তাকে সাইলেজ বলে। এ পদ্ধতিতে মাটির নিচে গর্ত বা পরিখা খনন করে সেখানে অনেক দিন ঘাস সংরক্ষণ করে রাখা যায়। অমৌসুমে গো-খাদ্য হিসেবে সাইলেজ ব্যবহার হয়। শুকনা ঘাস বা খড়ের সাথে ভুট্টার সাইলেজ খাওয়ানো হয়। সে সাথে অবশ্যই আমিষ জাতীয় খাদ্যসহ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লবণ, ভিটামিন-এ, ও ভিটামিন-ডি, মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ভুট্টার সাইলেজের সাথে কলাইয়ের ভুসি যোগ করে খাওয়ালে মাংস ও দুধ উভয়ই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

২০২২

ভুট্টার দানা : বিশ্বের উন্নত দেশে ভুট্টার দানা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ভুট্টার আমিষ লাইসিন ও ট্রিপ্টোফেন নামক এমাইনো এসিডসমৃদ্ধ এবং এর হলুদ রঙের দানায় ক্যারোটিন থাকা তা পশুর দৈহিক গঠনের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

ভুট্টার দানা চূর্ণ করে গরু-ছাগলকে খাওয়ানো যায়। এছাড়া দানার গুঁড়ো ভেজানো ধানের খড় বা কুঁড়া, খৈল, ঝোলা গুঁড় বা খেসারির ভুসির সাথে মিশিয়েও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পোল্ট্রি খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার :

১। ভুট্টার ভাঙা,

২। দানাদার সুষম খাদ্য তৈরির উপকরণ।

১। ভুট্টার ভাঙা : পোল্ট্রি খাদ্যে প্রায় ৫০ ভাগ দানাদার খাদ্য প্রয়োজন। ভুট্টার দানায় ক্যালরি, ভিটামিন-বি ও ক্যারোটিন বেশি থাকে। ফলে মুরগির স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও ডিমের কুসুম হলুদ হয়। ডিম পাড়া মুরগির খাদ্যে ২৫ ভাগ ভুট্টা ব্যবহার করলে খামারে পালিত মুরগির ডিম হলুদ করে। আমাদের দেশে মুরগির খাদ্যে দানাদার খাদ্য হিসেবে গম ব্যবহার করা হয়, তাই ডিমের কুসুম সাদা হয়। ক্রেতা সাধারণত হলুদ কুসুমসম্পন্ন ডিম বেশি পছন্দ করে।

২। দানাদার সুষম খাদ্য তৈরির উপকরণ : আমাদের দেশে পোল্ট্রির দানাদর সুষম খাদ্য উপকরণ হিসেবে শুধু গম ব্যবহার করা হয়। পোল্ট্রির সুষম দানাদার খাদ্য তৈরির জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে গমের পরিবর্তে তেলের খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়ো, চালের কুঁড়া, গমের চিকন ভুসি, বাদাম খৈল, সরিষার খৈল, নারিকেলের খৈল, মাছের তেল বা সয়াবিন তেল, ঝিনুকের গুঁড়ো, লবণ, মিশ্রিত ভিটামিন ও খনিজদ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ভুট্টা পোল্ট্রি খাদ্য হিসেবে উন্নতমানের কিন্তু সহজলভ্য নয়। এদিক মুরগির খামার বাণিজ্যিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দানাদার সুষম খাদ্যের উপকরণ ভুট্টার কদর দিন দিন বাড়ছে।

অনুশীলনী-০৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ভুট্টার বৈজ্ঞানিক নাম কী?

২. ভুট্টার পুরুষ ফুলকে কী বলে?

৩. ভুট্টার স্ত্রী ফুল পরাগায়িত হয়ে কী উৎপাদন করে?

৪. ভুট্টার দানা কী জাতীয় ফল?

৫. ভুট্টা উৎপদানকারী দেশগুলো কী কী?

৬. চাল ও গমের তুলনায় ভুট্টার হেক্টর প্রতি ফলন কত?

৭. ভুট্টা একাধারে কী কী হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

২০২২

৮. ভুট্টার সাথে সাথী ফসল হিসেবে কী কী ফসল চাষ করা যায়?

৯. সুইট কর্ণ বলতে কী বুঝায়?

১০. বেবি কর্ন বলতে কী বুঝায়?

১১. ভুট্টার বীজ কখন বপন করতে হয়?

১২. ভুট্টার অন্তর্বীজ বা কার্নেল কাকে বলে?

১৩. সস্য বা এন্ডোসপার্মে কী থাকে?

১৪. ভুট্টার ভ্রূণ কী কী নিয়ে গঠিত?

১৫. ভুট্টার ক্যারোটিনের পরিমাণ কত?

১৬. ভুট্টার দানায় কত ভাগ তেল থাকে?

১৭. ভুট্টার শস্যদানা গোলাজাত করার সময় আর্দ্রতা কত রাখতে হয়?

১৮. গোলাঘর ও ভুট্টা রাখার পাত্র কীভাবে শোধন করতে হয়?

১৯. গুদামঘরে ফসলের জন্য কী ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয়?

২০. গুদাম ঘরে কী কী জৈব কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়?

২১. ভুট্টা মিলিং কতভাবে করা যায়?

২২. কিসের সাহায্যে ভুট্টার দানা থেকে ভ্রূণ আলাদা করা হয়?

২৩. ভুট্টার আটা মিলিং করার পর পরই কী করা উচিত?

২৪. ভুট্টার আটার সাথে কী দিয়ে রুটি বানাতে হয়?

২৫. স্টিপিং বলতে কী বুঝায়?

২৬. ভিজা মিলিং থেকে একই সাথে ভুট্টা থেকে কী কী পদার্থ পাওয়া যায়?

২৭. ভুট্টার আটা থেকে কী কী দ্রব্য পাওয়া যায়?

২৮. পশুখাদ্য হিসেবে ভুট্টা কতভাবে ব্যবহার হয়?

২৯. ভুট্টা গাছের ডাঁটা ও পাতা থেকে কীভাবে উত্তম গো-খাদ্য তৈরি করা যায়?

৩০. সাইলেজ কাকে বলে?

৩১. ভুট্টার সাইলেজ কীভাবে খাওয়ালে গরুর মাংস ও দুধ বৃদ্ধি পাবে?

৩২. ভুট্টার দানা কী কী অ্যামাইনো এসিড সমৃদ্ধ?

৩৩. ভুট্টার দানার সাথে কী কী মিশিয়ে উত্তম গো-খাদ্য তৈরি করা যায়?

৩৪. মুরগির খাদ্যে কতভাগ ভুট্টা ব্যবহার করলে ডিমের কুসুম হলুদ হবে?

৩৫. বর্তমানে মুরগির খাদ্যে গমের পরিবর্তে ভুট্টার কদর বাড়ছে কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. ভুট্টার পরিচিত ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. সুইট কর্ন ও বেবি কর্ন কী?

৩. ভুট্টার দানার গঠন বর্ণনা কর।

৪. চাল ও গমের তুলনায় ভুট্টার পুষ্টিমান কীরূপ?

৫. ভুট্টার তেলের উপকারিতা কী কী?

৬. ভুট্টার সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৭. গোলাজাত ভুট্টার পোমাকড় কয়টি ও কী কী?

৮. ভুট্টার শুকনা মিলিং-এর ফ্লোচার্ট লেখ।

৯. ভুট্টার ভিজা মিলিং-এর ফ্লোচার্ট লেখ।

১০. ভুট্টা মিলিং-এর পর ভুট্টার উপজাতগুলো কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভুট্টার পরিচিতি, উল্লেখযোগ্য জাত, দানার বিভিন্ন অংশ ও পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

২. ভুট্টা সংরক্ষণ, গোলাজাত, পোকামাকড়ে আক্রমণ ও সেগুলোর দমন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৩. ভুট্টার শুকনা মিলিং বর্ণনা কর।

৪. ভুট্টার ভিজা মিলিং বর্ণনা কর।

৫. ভুট্টা মিলিং-এর উপজাতগুলো কী কী?

অধ্যায়-৪

ভুট্টা থেকে বিভিন্ন খাদ্য

ভূমিকা : ভুট্টা বিভিন্ন আকারে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। ভেজা অবস্থায় ইহা মাঠ থেকে তোলা হয়। তখন এটা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ জাতের ভুট্টার দানা শুকিয়ে Popcorn হিসেবে ভেজে খাওয়া হয়। অন্যান্য দানা শস্যের মত খোসা ও জার্ম (অঙ্কুর) দূর করার জন্য মিলিং করা হয়। ভুট্টার মিলিং দুইভাবে। যেমন- শুষ্ক মিলিং ও ভেজা মিলিং।

শুষ্ক অবস্থায় মিলিং করার সময়, ভুট্টার দানায় ২১% জলীয় অংশ থাকে। পরে তা শুকিয়ে ১৫% জলীয় অংশে আনা হয়। ভেজা অবস্থায় মিলিং করার ক্ষেত্রে ভুট্টার দানা পরিষ্কার করে এসিড ও SO_2 যুক্ত গরম পানিতে ডুবানো হয়। নরম দানাগুলোকে পরে মিলিং প্রক্রিয়ার শেষে গুঁড়া করে ভুট্টার স্টার্চ বা ভুট্টার আটা তৈরি করা হয়। ভুট্টার পুষ্টিমান চাল ও গমের চেয়ে বেশি। ভুট্টা থেকে ছাতু, নাড়ু, শিশু খাদ্য, খৈ, পিঠা ছাড়াও আরও বহু রকমের খাদ্য আমরা পেতে পারি।

ভুট্টার শর্করাকে হাইড্রোলাইসিস করে কর্ন সিরাপ উৎপন্ন হয় যা মিষ্টি বৃদ্ধিকারক হিসেবে ব্যবহার হয়। এতে বিভিন্ন মাত্রার ডেক্সোট্রিন, মালটোজ ও গ্লুকোজ বিদ্যমান থাকে। গ্লুকোজকে ভেঙে ফ্রুকটোজ উৎপন্ন করা হয় যা একটি মিষ্টি যৌগ। ভুট্টার খৈ ও কর্নফ্লেক্স সারা বিশ্বের লোকের কাছে সমাদৃত। জনপ্রিয় কর্নস্যুপ, হরলিক্স ও ওভালটিন প্রস্তুতে ভুট্টা ব্যবহার হয়। ভারত ও পাকিস্তানে ভুট্টার আটার রুটি খুবই প্রচলিত। ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ায় সিদ্ধ ভুট্টা জনপ্রিয় খাবার।

খাদ্য হিসেবে ভুট্টার উপকারিতা :

১) চাল ও গমের চেয়ে ভুট্টায় তেলের পরিমাণ বেশি।

২) ভুট্টার তেল গন্ধহীন ও বর্ণহীন।

৩) ভুট্টার তেলে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকায় রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কম।

৪) চাল ও গমের চেয়ে ভিটামিন-এ (ক্যারোটিন) ভুট্টায় বেশি।

৫) সহজ উপায়ে রান্না করে খাওয়া যায়।

৬) তাপ উৎপাদনকারী খাদ্য হিসেবে গম ও ভুট্টা পাশাপাশি অবস্থানে।

৭) ভুট্টায় আঁশের পরিমাণ বেশি বলে কৌষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

৮) ভুট্টা মানুষের এবং পশুপাখির খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়।

৪.১ ভুট্টা থেকে উৎপাদিত খাদ্যের নাম ঃ

ভুট্টা থেকে উৎপাদিত খাদ্যকে নিম্নে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়ঃ-

ক) ভুট্টার আটা ও দানা ভিত্তিক খাবার :

১	মিশ্র রুটি	৯	ভুট্টার ফিরনি
২	মিশ্র পরোটা	১০	ভুট্টার ক্ষীর
৩	মিশ্র লুচি	১১	শিশুর খাদ্য
৪	ভুট্টার গজা	১২	মিষ্টি ভুট্টার স্যুপ
৫	আলু ভুট্টা রুটি	১৩	মিষ্টি ভুট্টা দানার স্যুপ
৬	ভুট্টার ছাতু	১৪	চিকেন কর্ন স্যুপ
৭	ভুট্টার ডালপুরি	১৫	ভুট্টার পোলাও
৮	ভুট্টার খিচুড়ি	১৬	ভুট্টার ময়দা ও ভুট্টার চূর্ণ মিশ্র খাবার

খ. কাঁড়িচা মোচা ভিত্তিক খাবার :

১. মোচা পোড়ায়ে বা ঝলসানো খাবার। ২. মোচা সিদ্ধ।

৩. কঁচি মোচার সবজি। ৪. ভুট্টার চানা।

গ. খই ভুট্টাভিত্তিক খাবার :

১. খই ২. মোয়া ৩. মুড়কি ৪. নাড়ু

৪.২ ভুট্টার আটা ও দানাভিত্তিক খাবার :

১. ভুট্টার আটার রুটি : এই রুটি তৈরি করতে ভুট্টার আটা ও গমের আটা ৪ঃ১ বা ২ঃ১ বা ১ঃ১ অনুপাতে মিশানো যায়। দুই ধরনের আটা মেপে একত্রে গরম পানি ও লবণ মিশিয়ে ভালো করে ডলে খামির তৈরি করতে হয়। খামির থেকে ছোট ছোট গোলা বা বল নিয়ে পিঁড়ি ও বেলনের সাহায্যে রুটি বেলে নিতে হয়। চুলায় তাওয়া গরম হলে রুটি সেঁকে নিতে হয়।

২. ভুট্টার আটার পরোটা : ভুট্টার আটা ১ ভাগ, গমের আটা ২ ভাগ, তেল বা ঘি, লবণ ও পানি পরিমাণ মতো নিতে হয়। তারপর রুটি বানানোর মতো খামির তৈরি করতে হয়। পিঁড়ি ও বেলনে বেলে চারকোণা ও একটু মোটা করে বেলতে হয়। তারপর ঘি বা তেলে একটু বাদামি করে ভেজে তুললেই পরোটা হয়ে যায় ।

৩. আলু ভুট্টা রুটি : এ রুটি তৈরি করতে ১০০ গ্রাম ভুট্টার আটার সাথে মাঝারি সাইজের ৪টি আলু নিতে হয়। ঘি ২০ গ্রাম, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, ও লবণ পরিমাণমতো নিতে হয়। আলু সিদ্ধ করে খোসা ছিলে চটকে নিতে হয়। ভুট্টার ময়দা, চটকানো আলু এবং সব মসলা একত্রে ডলে খামির তৈরি করতে হয়। এরপর ছোট ছোট করে গোলা বা বল তৈরি করে রুটি বানাতে হয়। ঘি দিয়ে রুটির উভয় পিঠ সেঁকে নিতে হয়। প্রয়োজনে আরও ঘি বা তেল দিয়ে তাওয়ায় রুটি ভেজে নিতে হয়। খাওয়ার জন্য গরম থাকতে পরিবেশন করতে হয়।

৪. ভুট্টার চাল খিচুড়ি : এই খিচুড়ি তৈরি করতে কচি ভুট্টার দানা ১৫০ গ্রাম, চাল ৩০০ গ্রাম, ঘি আধাকাপ, আদা বাটা, সরিষা, লবণ ও পানি পরিমাণ নিতে হয়।

চাল দু ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। হাঁড়িতে ঘি গরম করে সব শুকনা মশলা দিয়ে চাল ও ভুট্টা ছেড়ে দিতে হয়। অবশেষে লবণ, আদা বাটা এবং পানি দিতে হয়। চাল ও ভুট্টার দানা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে হয়। পানি শুকিয়ে খিচুড়ি ঝরঝরে হলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

৫. ভুট্টা পোলাও : সিদ্ধ কচি ভুট্টার দানা ২৫০ গ্রাম, চাল ২৫০ গ্রাম পেঁয়াজ, আদা, কাঁচা মরিচ কুচি ও ঘি পরিমাণ মতো, স্বাভাবিক পোলাওর অন্যান্য মশলা দিয়ে পোলাও রান্না করতে হয়।

চাল ধুয়ে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হয়। ঘি গরম করে মশলা, চাল ও ভুট্টা একটু ভাজতে হয়। তারপর তিন কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হয় চাল ও ভুট্টা সিদ্ধ হবার পর চুলা থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

৬. ভুট্টা পোরিজ বা ফিরনি : ফিরনি তৈরি করার জন্য ভাঙা ভুট্টা ৬০ গ্রাম, দুধ ১০০ গ্রাম, গুড় বা চিনি ৫০ গ্রাম, ঘি ৫০ গ্রাম এবং পানি পরিমাণমতো নিতে হবে।

ভাঙা ভুট্টা পানিতে প্রায় ১ ঘণ্টার মতো ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পানি ঝরিয়ে ভুট্টা ঝলসাতে হবে যে পর্যন্ত উজ্জ্বল বাদামি রঙের না হয়। ঘি গরম করে এই ভুট্টা আরও পাঁচ মিনিট ভাজতে হবে। তারপর পানি দিয়ে কম তাপে সিদ্ধ করতে হয়। ভুট্টা নরম হলে চিনি বা গুড় দিয়ে ভালো করে মিশাতে হয়। তারপর চুলা থেকে নামাতে হয়। পরিবেশনের সময় দুধ মিশিয়ে খেতে হয়।

৭. শিশুর পরিপূরক খাদ্য : এই খাদ্য তৈরিতে ভুট্টার ময়দা ৬০ গ্রাম, ননীমুক্ত গুঁড়োদুধ ১৫ গ্রাম এবং চিনি ১০ গ্রাম নিতে হয়। ময়দা চেলে গুঁড়ো দুধ মিশাতে হয়। একটু পানি মিশিয়ে সেদ্ধ করা হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট অল্প আঁচে রান্না করার সময় অনবরত নাড়তে হয় যেন তলায় না লেগে যায়। রান্নার সময় চিনি বা লবণ দিয়ে না গলা পর্যন্ত জ্বাল দিতে হয়। শিশুর পরিপূরক এ খাদ্য থেকে ৩১০ ক্যালরী শক্তি পাওয়া যায়। দুধের পরিবর্তে ডিম দিয়েও এ খাদ্য তৈরি করা হয়।

৮. সুইট কর্ন স্যুপ : মাঝারি আকারের একটি কচি ভুট্টার মোচা, ১ চা চামচ চিনি, সাদা গোল মরিচের গুঁড়া, পরিমাণমতো টেস্টিং সল্ট, সয়া সস, কর্ন ফ্লাওয়ার বা এরারুট দিয়ে এই স্যুপ তৈরি করা যায়। ভুট্টার মোচা থেকে খোসা ও সুতা বা সিল্ক ছাড়িয়ে নিতে হয়। আস্ত ভুট্টার মোচা পানি দিয়ে চুলায় বা প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করতে হয়। ভুট্টার দানা নরম হলে ঠান্ডা করে ছুরি দিয়ে আধা কাপ ভুট্টা ছাড়িয়ে নিয়ে বাকি আস্ত

চিত্র : এক বাটি কর্ন স্যুপ

২০২৫

ভুট্টা কুরানি দিয়ে কুরে নিতে হয়। এবার পানিতে ভুট্টার দানা ও কুরানো ভুট্টা জ্বাল দিতে হয়। তারপর লবণ, চিনি, গোলমরিচের গুঁড়া ও সয়াসস মিশাতে হয়। সবকিছু তিন মিনিট ফুটানোর পর এক টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার বা এরারুট মিশাতে হয়। স্যুপ অনবরত নাড়তে হয়। অল্প আঁচে জ্বাল দিয়ে ফুটে উঠলে নামিয়ে গরম অবস্থায় পরিবেশন করতে হয়। অনেকটা একই পদ্ধতিতে মিষ্টি ভুট্টা দানার সাথে মুরগির ডিম ও সিদ্ধ করা মুরগির মাংস দিয়ে চিকেন কর্ন স্যুপ তৈরি করা যায়।

৪.৩ ভুট্টার কাঁচা মোচা ভিত্তিক খাবার :

১. ঝলসানো ভুট্টার মোচা : দানা নরম থাকা অবস্থায় ভুট্টার মোচার খোসা ছাড়াতে হয় তারপর কয়লার আগুনে ঝলসাতে হয়। আগুনের উপর রেখে তার উপর মোচা পোড়ালে ভালো হয়। তারপর তা খাওয়া যায় এছাড়া গরম বালুতেও মোচা ঝলসানো যায়।

চিত্র : ভুট্টা পোড়ানো বা ঝলসানো

২. সিদ্ধ ভুট্টা : পানিতে ভুট্টার মোচা সিদ্ধ করে মোচা আলাদা করে নিতে হয়। কাঁচা মরিচ ও পেয়াজ কুচি কুচি করে কেটে ঘি দিয়ে ভাজতে হয়। এর সাথে সিদ্ধ ভুট্টার দানা, লবণ ও ধনে পাতা ছেড়ে দিতে হয়। কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করতে হয়।

৩. ভাজা ভুট্টা : কচি ভুট্টার মোচা থেকে দানা আলাদা করতে হয়। দুধ গরম করে ফুটন্ত দুধে দানা গুলো ছেড়ে দিতে হয়। জ্বাল দেবার পর ভুট্টার দানা যখন দুধ চুষে নেয় বা দুধ যখন শুকিয়ে আসে তখন চুলা থেকে নামাতে হয়। কড়াইতে ঘি গরম করে জ্বাল দেওয়া ভুট্টার দানা দিয়ে ঘিয়ে ভেজে ঠান্ডা করে পরিবেশন করা হয়।

৪. ভুট্টা ভাজি : মোচা থেকে দানা ছাড়িয়ে নিয়ে চুলায় সিদ্ধ করতে হয়। নরম ও দৃঢ় হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হবে। কড়াইতে পেয়াজ কুচি করে কেটে তেল দিয়ে বাদামি করে ভাজতে হয়। তারপর আলুর টুকরা ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। এ সময় প্রয়োজনমতো মসলা ও ভুট্টা দিয়ে নাড়তে হয়। পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে ৩-৪ মিনিট চুলায় রেখে পরিবেশন করা যায়।

খৈ ভুট্টা ভিত্তিক খাবার :

১. ভুট্টার খৈ : ভুট্টার সকল জাতের দানা থেকে খৈ তৈরি করা যায় না। শুধুমাত্র খৈ ভুট্টা জাতের ভুট্টার দানা থেকে সুন্দর খৈ করা যায়। প্রথমে খৈ ভুট্টার দানা ধুয়ে নিতে হয়। নিশ্চিত হতে হবে যে, দানার ১৪-১৫% আর্দ্রতা আছে। তবেই খৈ সর্বাধিক ফুলে উঠবে। বড় তলা বিশিষ্ট পাত্রে কিছু সয়াবিন তেল দিয়ে গরম করতে হয়। তেল গরম হলে (ধোঁয়া ওঠা পর্যন্ত) ৫০ গ্রাম ভুট্টার দানা পাত্রে ঢেলে দিয়ে সাথে সাথে ঢাকনা লাগিয়ে মুখ বন্ধ করে

চিত্র : পপকর্ন মেশিন

দিতে হয়। মুখবন্ধ করে পাত্রটি ধীরে ধীরে ঘুরাতে হয় যে পর্যন্ত খৈ ফুটার আওয়াজ বন্ধ না হয়। প্রয়োজনমতো লবণও দিয়ে নিতে হয়। খৈ ভাজা হলে ঠাণ্ডা করে পলি ব্যাগে প্যাকেট করে বাজারজাত করা হয়। বর্তমানে ভুট্টার খৈ ভাজার ছোট যন্ত্র ভ্যানগাড়িতে বসিয়ে শহরে বন্দরে গরম গরম ভুট্টা ভেজে বিক্রি করা হয়। যা সকলের নিকট খুবই আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় উঠছে।

২. **ভুট্টার মোয়া :** ভুট্টার মোয়া তৈরি অনেকটা মুড়ির মোয়া তৈরির মতোই। প্রথমে খৈ তৈরি করে নিতে হয়। তারপর একটি পাত্রে পরিমাণমতো পানি দিয়ে আখের গুড় জ্বাল দিতে হয়। প্রায় ৫-৭ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর ফুটন্ত গুড়ের মধ্যে খৈগুলো ছেড়ে দিতে হয়। তারপর গরম পাত্রটি নামিয়ে দ্রুত হাতা দিয়ে নাড়তে হয় যেন গুড় সমানভাবে খৈতে মেখে যায়। এবার গরম থাকতেই গুড় মাখানো খৈ হাতে নিয়ে মুঠ করে চেপে মোয়া তৈরি করতে হয়। মনে রাখতে হবে গরম গুড়ের আঠাতেই কেবল সুন্দর মোয়া তৈরি হয়। গুড় ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মোয়া তৈরি করা যায় না।

৩. **ভুট্টার মুড়কি :** প্রথমে খৈ ভুট্টার দানা ২০০ গ্রাম, সয়াবিন তেল ১০০ মিলি লিটার, গুড় ৩০০ গ্রাম ও লবণ পরিমাণমতো নিতে হয়। খৈ ভেজে নিতে হয়। মোয়া তৈরির মতো একই প্রণালিতে একটি পাত্রে গুড় জ্বাল দিতে হয়। ফুটন্ত গুড়ের ভিতর খৈ গুলো ছেড়ে দেওয়া হয় অথবা খৈ-এর মধ্যে গুড় ছেড়ে হাতা দিয়ে তাড়াতাড়ি ওলটপালট করে নাড়তে হবে। গুড় ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই খৈ এর সাথে সমস্ত গুড় মাখিয়ে ফেলতে হবে। কেননা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে গুড় খৈ এর গায়ে লাগে না। খৈ গুলোতে গুড় মাখায়ে ঝরঝরে করা হলে মুড়কি তৈরি হয়ে যায়। একইভাবে গুড়ের পরিবর্তে চিনি দিয়ে ভুট্টার মুড়কি তৈরি করা যায়।

৪. **ভুট্টার নাড়ু :** খৈ ভাজার পর দেখা যায় কিছু কিছু ভুট্টার দানা খৈ হয় না। এ অফুটন্ত দানা কিছুটা গুঁড়া করে নিতে হয়। একটি পাত্রে পরিমাণমতো নরম গুড় বা ঝোলা গুড় বা শুকনো গুড়ের সাথে পানি মিশিয়ে ৬-৭ মিনিট জ্বাল দেওয়া হয়। তারপর ফুটন্ত গুঁড়ার মধ্যে ভুট্টার দানা ছেড়ে দিতে হয়। এরপর পাত্রটি নামিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হয়। গরম থাকতেই হাতে তেল মেখে মুঠি করে গোলাকার নাড়ু তৈরি করা যায়। ভুট্টার গুঁড়ার সাথে তিলের গুঁড়া ও নারিকেল কোরা মিশিয়ে দিলে নাড়ু খুব মজাদার হয়।

চিত্র : ভুট্টার নাড়ু

৪.৩ ভুট্টা থেকে শিল্পজাত :

ভুট্টা শিল্পজাত দ্রব্য : বাংলাদেশে প্রতিবছরে ১৫-২০ হাজার টন স্টার্চ আমদানি করা হয়। সমপরিমাণ স্টার্চ তৈরি করতে ৩০-৪০ হাজার টন ভুট্টার প্রয়োজন। আমাদের দেশে ভুট্টা চাষ তেমন প্রসার লাভ করেনি বিধায় ভুট্টা ভিত্তিক শিল্পকারখানা এখনও বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠেনি। ভুট্টা থেকে নিম্নের শিল্প উপাদান তৈরি করা যায়-

১. স্টার্চ
২. কর্ন ফ্লেক্স
৩. ভুট্টার তেল
৪. বলবর্ধনকারী খাবার
৫. কনফেকশনারি দ্রব্য
৬. কর্ন সিরাপ
৭. টিনজাত দ্রব্য
৮. কারফিউরাল শিল্প
৯. ইথানল
১০. বিবিধ শিল্প

১) **স্টার্চ :** ভুট্টার শুকানো দানা ৬৬-৭৮% স্টার্চ থাকে। ভুট্টাকে প্রক্রিয়াজাত করে সহজেই উক্ত স্টার্চ পাওয়া যায়। স্টার্চ টেক্সটাইল শিল্প, ভেষজ শিল্প, কাগজের মিল, এসবেস্টস বোর্ড, যন্ত্রাংশের ছাঁচ তৈরি ও ড্রাইসেল ব্যাটারি ইত্যাদি শিল্পে ব্যবহার হয়।

২) **কর্নফ্লেক্স :** ভুট্টার শর্করাকে হাইড্রোলাইসিস করে কর্ন সিরাপ উৎপন্ন করা হয় যা মিষ্টি বৃদ্ধিকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন প্রকার ডেক্সট্রিন, মালটোজ ও গ্লুকোজ বিদ্যমান থাকে। আরও ভালভাবে হাইড্রোলাইসিস করে বেশি পরিমাণ গ্লুকোজকে ভেঙে ফ্রুকটোজ উৎপন্ন করে যা একটি মিষ্টি যৌগ। দুধ ও চিনি দিয়ে ভিজানো কর্নফ্লেক্স শিশু ও কিশোরদের মজাদার খাবার।

৩) **কর্ন অয়েল :** ভুট্টার ভ্রূণ অপসারণ, নিষ্কাশন ও পরিশোধন করে বিশুদ্ধ ভুট্টার তেল বা কর্ন অয়েল পাওযা যায়। ভুট্টার তেলে কোলেস্টরেল নেই বললেই চলে। যুক্তরাষ্ট্রে এই তেলকে মেজোলা ওয়েল বলে। রান্না ছাড়াও ভুট্টার তেল গোলাবারুদ, রং, বার্নিশ, কৃত্রিম রাবার, সাবান, বেকারি সামগ্রী, মেওনেজ, মরিচারোধক দ্রব্য ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

৪) **বলবর্ধনকারী খাবার :** হরলিক্স, মালটোভা, বুস্ট ইত্যাদি বলবর্ধনকারী খাবার তৈরিতে ভুট্টার দানা ব্যবহার করা হয়।

৫) **কনফেকশনারি দ্রব্য :** বিভিন্ন প্রকার রুটি, বিস্কুট, কেক ও কনফেকশনারি দ্রব্য তৈরিতে ভুট্টার গুঁড়া ব্যবহার হয়।

৬) **কর্ন সিরাপ :** ভুট্টার স্টার্চকে হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও ডেক্সট্রিন ইত্যাদি কর্ন সিরাপ তৈরি করা হয়। এই সিরাপ খাবার শিল্প, চামড়া শিল্প, সাবান শিল্প ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

৭) **টিনজাত ভুট্টা :** ভুট্টার অপরিপক্ব মোচাকে টিনজাত বা ক্যানিং করে খাওয়ার জন্য বাজারজাত করা হয়।

৮) **কারফিউরাল শিল্প :** ভুট্টার মোচা থেকে দানা ছাড়িয়ে নেওয়ার পর যে অংশ বাকি থাকে তাকে কব বলে । তা থেকে কারফিউরাল নামক রাসায়নিক দ্রব্য পাওয় যায়। যা দিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, কৃত্রিম রাবার, নাইলন, রেজিন ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে।

৯) **ইথানল :** ভুট্টার স্টার্চকে গাজানো বা ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ইথানল তৈরি করা যায়। ইথানলের সাথে পেট্রোল বা অকটেন মিশিয়ে গাড়ির জ্বালানি তৈরি করা সম্ভব।

১০) **বিবিধ শিল্প :** ভুট্টায় জিন নামক তৃতীয় শ্রেণির আমিষ পাওয়া যায় যা দিয়ে কর্ক, বাঁধাই ও ছাপার কালি তৈরি হয়। ভুট্টার এমাইলোজ দিয়ে খাবার মোড়ক তৈরি করা যায়। এই খাবার মোড়ক না খুলেই রান্না করা যায় । ভুট্টার এমাইলোপেকটিন প্লাস্টিক, ফিল্ম, ফনোগ্রাফ রেকর্ডিং আঠা তৈরিতে ব্যবহার হয়।

চিত্র : ভুট্টা হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ধরনের খাদ্য

অনুশীলনী-০৪

অতি সংক্ষিপত প্রশ্ন :

১. ভিজা অবস্থায় ভুট্টা কীভাবে খাওয়া হয়?

২. কোন জাতের ভুট্টা পপকর্ন হিসেবে খাওয়া হয়?

৩. ভুট্টার দানার কোন কোন অংশ অপসারণ করে মিলিং করা হয়?

৪. শুষ্ক মিলিং-এ ভুট্টার দানার জলীয় অংশ কততে আনা হয়?

৫. সারা বিশ্বের লোকের কাছে ভুট্টার কোন খাদ্য সমাদৃত?

৬. সিদ্ধ ভুট্টা কোন কোন দেশের জনপ্রিয় খাদ্য?

৭. কোন ভুট্টার তেল ব্যবহারে রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কম?

৮. ভুট্টার আটা ও দানা ভিত্তিক কয়েকটি খাবারের নাম লেখ?

৯. ভুট্টা ও গমের আটা কি অনুপাতে মিশিয়ে রুটি তৈরি করা হয়?

১০. ভুট্টার পোলাও রান্নার জন্য কি ধরনের ভুট্টা নিতে হয়?

১১. ভুট্টা পোরিজ মানে কী?

১২. শিশুর পরিপূরক খাদ্যের উপকরণগুলো কী কী?

১৩. সুইট কর্নস্যুপ ও চিকেন কর্নস্যুপ বলতে কী বুঝায়?

১৪. খৈ ভাজার ভুট্টার আর্দ্রতা কত থাকতে হয়?

১৫. ভুট্টার শুকনা দানাতে কতভাগ স্টার্চ থাকে?

১৬. কর্নফ্লেক্স কী?

১৭. ভুট্টা বীজের কোন অংশ থেকে ভুট্টার তেল বা কর্ন অয়েল পাওয়া যায়?

১৮. কর্ন সিরাপ কীভাবে পাওয়া যায়?

১৯. ডেক্সট্রোজ কী?

২০. কারফিউরাল রাসায়নিক কোথা থেকে পাওয়া যায়?

২১. ভুট্টা থেকে ইথানল কোন প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ভুট্টার পরিচিতি বর্ণনা কর।

২. খাদ্য হিসেবে ভুট্টার উপকারিতা কী?

৩. ভুট্টার আটা ও দানাভিত্তিক খাদ্যগুলো কী কী?

৪. ভুট্টার আটার রুটি ও পরোটা বানানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. ভুট্টার পোলাও বা ভুট্টার পোরিজ তৈরি প্রণালী বর্ণনা কর।

৬. ভুট্টা থেকে কীভাবে শিশুর পরিপূরক খাদ্য তৈরি হয়?

৭. সুইট কর্নস্যুপ বা চিকেন কর্নস্যুপ তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮. সিদ্ধ ভুট্টা ও ভাজা ভুট্টা রান্নার নিয়ম বর্ণনা কর।

৯. ভুট্টার খৈ ভাজার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

১০. ভুট্টার মোয়া বা মুড়কি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১. ভুট্টা থেকে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের নাম লিখ।

১২. ভুট্টার স্টার্চ ও তেল কী কাজে লাগে?

১৩. কর্নফ্লেক্স ও কর্নসিরাপ কীভাবে তৈরি করে?

১৪. ভুট্টা থেকে কারফিউরাল ও ইথানল কীভাবে পাওয়া যায়।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. খাদ্য হিসেবে ভুট্টার পরিচিতি, উপকারিতা ও ভুট্টার খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

২. ভুট্টার আটা ও দানাভিত্তিক খাবারগুলো রান্নার নিয়ম বর্ণনা কর।

৩. ভুট্টার কাঁচা মোচাভিত্তিক খাবার ও খৈ ভুট্টাভিত্তিক খাবারের বর্ণনা দাও।

৪. ভুট্টা থেকে শিল্পজাত দ্রব্য কী কী? এগুলোর উপকারিতা কী কী?

২০২২

অধ্যায়-০৫

আখের পুষ্টি, রস নিষ্কাশন, গুড় ও চিনি উৎপাদন

ভূমিকা : আখ গ্রামিণী পরিবারভুক্ত বহুবর্ষজীবী ফসল। এর বৈজ্ঞানিক নাম স্যাকারাম অফিসিনেলিস। আখ প্রধানত চিনি ও গুড় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আখ একটি নবায়নযোগ্য কৃষি সম্পদ, কারণ চিনি ছাড়া জৈব জ্বালানি আঁশ, সার ও বিভিন্ন ধরনের উপজাত দ্রব্য আখ থেকে উৎপাদিত হয়। আখ মানবসম্পদের জন্য শক্তির একটি পুরাতন উৎস। সাম্প্রতিককালে ব্রাজিল ও অন্যান্য দেশে ইক্ষু, গাড়ির প্রয়োজনীয় জীবাশ্ম জ্বালানীর একটি বিকল্প উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আখ-এর উৎপত্তিস্থল পাপুয়া নিউগিনিতে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে আখের বিস্তার ঘটে। আখ দেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। এটি দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান অর্থকরি ফসল। বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাঁচামাল হচ্ছে আখ । তবে বাংলাদেশে চিনি থেকে গুড় তৈরিতে অধিক আখ ব্যবহৃত হয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট ২ লক্ষ ২৭ হাজার জমিতে মোট আখের ফলন হয়েছে ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার মেট্রিক টন (BBS ২০১৭)। বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৪৪টি আখের জাত উদ্ভাবন করেছেন। জাতগুলো হলো ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ এবং বিএসআরআই আখ ৪১ থেকে বিএসআরআই আখ ৪৪। এর মধ্যে ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ এবং বিএসআরআই আখ ৪৪ এই তিনটি জাত লবণাক্ততা সহনশীল।

৫.১ আখ ও সুগারবিটের পরিচিতি ও পুষ্টিমান :

আখের পরিচিতি : আখ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। গাছটি দণ্ডাকৃতি, একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছের পাতা ভুট্টা গাছের পাতার ন্যায়। আখ গাছ উচ্চতায় ১.৮-৩.৭ মিটার লম্বা, সম্পূর্ণ দণ্ডটি গিঁটযুক্ত। দণ্ডের রং হাল্কা বেগুনি, সবুজ বা হলদে সবুজ। শিকড় ধান, গম ও ভুট্টার ন্যায় গুচ্ছমূল। চাষের জন্য আখ দণ্ডকে টুকরা টুকরা করে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি বীজের টুকরাতে ২-৩ গিঁট বা চোখ থাকে যা থেকে আখের চারা গজায়।

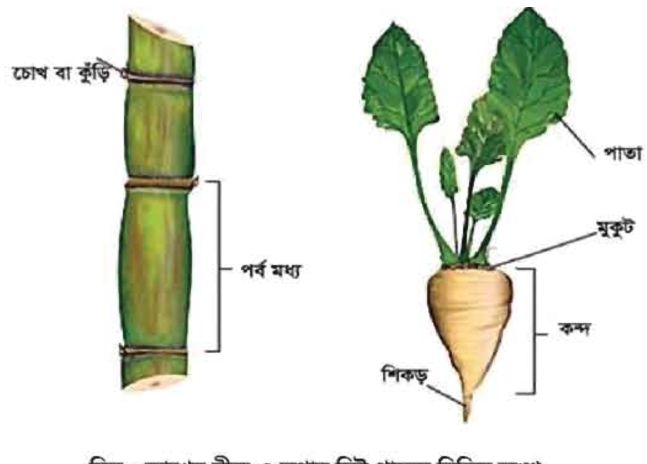

চিত্র : আখের বীজ ও সুগার বিট গাছের বিভিন্ন অংশ

দীর্ঘমেয়াদি ফসল আখের সাথে সাথী ফসল হিসাবে একই জমিতে আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুঁটি, বাঁধাকপি, পালংশাক, গাজর, টমেটো, বেবীকর্ন, লেটুস, ধনে, কালিজিরা, মেথি, মুগডাল, মৌরী, তিল, কচু ইত্যাদি শস্য সফলভাবে আবাদ করা যায়। বিজ্ঞানীরা জানান, সফলভাবে সাথী ফসল আবাদের মাধ্যমে একটি জমির বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিতের পাশাপাশি বছরে একই জমি থেকে কমপক্ষে ৪টি ফসল পাওয়া যায়।

সুগারবিট পরিচিতি :

সুগারবিট একটি স্বল্পমেয়াদি শীতপ্রধান দেশের মিষ্টি জাতীয় ফসল। বিশ্বের মোট চিনি উৎপাদনের প্রায় ২৫-৩০ ভাগ সুগারবিট থেকে উৎপাদিত হয়। সর্বাধিক ৫-৫.৫ মাসের মধ্যে ফলন দেয়। সুগারবিটের ফলন ৬০-৮৫ টন/হে. এবং চিনি আহরণের হার শতকরা ১৪-১৮ ভাগ। সুগারবিট থেকে চিনি, গুড়, ইথানল ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ ছাড়াও সুগারবিট পাল্প থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদিত হয়। এটি একটি উত্তম পশু খাদ্য এবং এটিকে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আখের চেয়ে সুগার বিটের ফলন বেশি। সময় কম লাগে তাই সরকার আখের পাশাপাশি সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের আখ গবেষণা ইনস্টিটিউটে গ্রীষ্মকালে সুগারবিটের গবেষণা কাজ চলছে। ইতিমধ্যে শুভ্রা ও কাবেরী নামে দুটি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

আখের পুষ্টিমান : আখের রসে পানি, চিনি, কিছু পরিমাণ গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, খনিজ পদার্থ ও নাইট্রোজেন গঠিত জৈব পদার্থ থাকে। আখের রসে মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের পরিমাণ ২০-২২ ভাগ। ডিসেম্বর মাসে আখে চিনির পরিমাণ ১২-১৪ ভাগ হয়। রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা আখের রসের চিনি পরীক্ষা করে আখ পরিপক্ব হয়েছে কি না দেখে আখ কাটা হয়। পরিপক্ব আখ তাড়াতাড়ি না কাটলে চিনি ও গুড়ের পরিমাণ কমে যায়।

ক্রমিক নং	উপাদনের নাম	শতকরা হার (%)
১.	পানি	৭৪.৯৬
২.	চিনি	১৩.৪০
৩.	ছোবড়া	
	ক) লিগনেয়াস পদার্থ	২.১৪
	খ) পেন্টোসান্স	৩.০৪
	গ) ক্রুড সেলুলোজ	৪.৮৬
	ঘ) ছাই	০.৬৪
	ঙ) নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ	০.৫৮
	চ) চর্বি ও মোম	০.৩৮
৪.	মোট	১০০

প্রতি ১০০ কেজি আখ থেকে ১০ কেজি গুড় বা ৬ কেজি চিনি পাওয়া যায়। আখের রস, গুড় ও চিনিতে প্রধানত : শর্করাই পাওয়া যায়। গুড়ের পুষ্টিমূল্য চিনি অপেক্ষা বেশি, দাম উভয়েরই প্রায় সমান। আখের রস, গুড় ও চিনির খাদ্য উপাদান নিম্নে দেখানো হলো-

সারণি: প্রতি ১০০ গ্রাম আখের রস, গুড় ও চিনি খাদ্য উপাদান :

ক্রমিক নং	খাদ্য	জলীয় অংশ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	শক্তি (কিলোক্যালরি)	ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	লৌহ (মিলি গ্রাম)	ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম)
১.	আখের রস	৯০.২	৯.১	৩৮৩	১০	১.১	৬
২.	গুড়	৩.৯	৯৫.০	৩৯	৮০	১১.৪	১৬৮
৩.	চিনি	০.৪	৯৯.৪	৩৯৮	১২	-	-

সারণি : সুগারবিটের পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে) :

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রামে)	ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রামে)
১.	খাদ্য শক্তি	৪৩ কিলোক্যালরি	১২	ভিটামিন বি ৩	০.৩৩৪ মিলি গ্রাম
২.	শর্করা	৯.৫৬ গ্রাম	১৩	ভিটামিন বি ৫	০.১৫৫ মিলি গ্রাম
৩.	চিনি জাতীয় পদার্থ	৬.৭৬ গ্রাম	১৪	ভিটামিন বি ৬	০.০৬৭ মিলি গ্রাম
৪.	আঁশ/তন্তু	২.৮ গ্রাম	১৫	ভিটামিন বি (ফোরেট)	১০৯ মাইক্রো গ্রাম
৫.	চর্বি	০.১৭ গ্রাম	১৬	ভিটামিন সি	৪.৯ মিলি গ্রাম
৬.	আমিষ	১.৬১ গ্রাম	১৭	ক্যালসিয়াম	১৬ মিলি গ্রাম
৭.	পানি	৮৭.৫৮ গ্রাম	১৮	লৌহ	০.৮০ মিলি গ্রাম
৮.	ভিটামিন এ	২ মাইক্রো গ্রাম	১৯	ম্যাগনেসিয়াম	২৩ মিলি গ্রাম
৯.	বিটা ক্যারোটিন	২০ মাইক্রো গ্রাম	২০	ফসফরাস	৪০ মিলি গ্রাম
১০.	ভিটামিন বি ১	০.০৩১ মিলি গ্রাম	২১	পটাশিয়াম	৩২৫ মিলি গ্রাম
১১.	ভিটামিন বি ২	০.০৪০ মিলি গ্রাম	২২	দস্তা	০.৩৫ মিলি গ্রাম

৫.২ আখের রস নিষ্কাশনের বিভিন্ন ধাপ :

আখের কর্তন : আখ কাটার পর পরই মাড়াই করা উচিত। মাড়াইয়ের জন্য মাঠে দাড়ানো অবস্থা থেকেই পোকা ও রোগাক্রান্ত আখ বাদ দিয়ে কাটতে হয়। আখ কাটার সময় দা বা হাঁসুয়া দিয়ে কাটলে আখে প্রায় ৮-১০ ভাগ মাটির নিচে থেকে য়ায়। তাই দা বা হাঁসুয়া দিয়ে আখ কাটা উচিত নয়। ধারালো কোদাল দিয়ে মাটির সমতলে বা সম্ভব হলে একটু মাটির গভীরেই আখের গোড়া কাটা উচিত। আখ কাটার পর পাতা না ছাড়িয়েই মাড়াই স্থানে আনা উচিত। তাতে আখ শুকায় না। তবে আখ মাড়াইয়ের পূর্বে পাতা ছাড়িয়ে সম্ভব হলে পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। কেননা তাতে আখের রসে ময়লা বা গাদের পরিমাণ কমে যাবে।

রস নিষ্কাশন পদ্ধতি বা মাড়াই : আমাদের দেশে আখ থেকে রস নিষ্কাশন পদ্ধতি দুই ধরনের। যথা-

ক) পাঁচ রোলার বিশিষ্ট মাড়াই কল: এটি ৫ রোলার বিশিষ্ট ও দুই স্তরে আঁখ মাড়াই উপযোগী কল। এই কলে বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য মাড়াইকল থেকে শতকরা ১০-১৫ ভাগ বেশি রস আহরণের ক্ষমতাসম্পন্ন। মাড়াই কলটি একটি ৪ চাকা বিশিষ্ট ১২ ফুট লম্বা ও ৩.৫ ফুট চওড়া মজবুত লোহার ফ্রেমের উপর স্থাপিত। এই মাড়াই কলে ঘন্টায় ৫০০-৫৬০ কেজি আখ মাড়াই করা হয়। অনেক সময় ৩ রোলার বিশিষ্ট মাড়াইকল ও ব্যবহার হয়ে থাকে।

চিত্র : পাঁচ রোলার বিশিষ্ট আখ ভাঙার মেশিন

খ) **যান্ত্রিক পদ্ধতি রস আহরণ :** এ পদ্ধতিতে মাড়াই করার জন্য আখ চলমান কনভেয়ার এ ফেলে দেওয়া হয়। আখগুলো যেতে যেতে ঘূর্ণায়মান ছুরির সাহায্যে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়। পরে ঐ টুকরাগুলো থেকে পেষণযন্ত্রের সাহায্যে রস বের করা হয়। চিনি তৈরির জন্য এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রস আহরণ করা হয় এবং আহরণের পরিমাণ ৮০-৮৫ ভাগ।

আখের রস থেকে গুড় উৎপাদন : আখ, খেজুর বা তাল গাছের শোধিত বা অশোধিত রস থেকে উৎপাদিত ঘনীভূত তরল বা কঠিন পদার্থকে গুড় বলে। মিঠাই, সন্দেশ, মণ্ডা ও পিঠা তৈরিতে গুড়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। গ্রামে আখ চাষিরা নিপুণ কারিগর দিয়ে স্বল্প পরিমাণ গুড় তৈরি করে থাকেন। গুড় উৎপাদন তিনটি ধাপে করা হয়ে থাকে। যথা-

১. **রস নিষ্কাশন :** এ পদ্ধতি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

২. **রস পরিষ্কারকরণ :** রস পরিষ্কারকরণের উদ্দেশ্য হলো গুড় থেকে আনাকাঙ্খিত দ্রব্যাদি অপসারণ, গুড়ের রং সুন্দর করা, গুড়কে কঠিন করা ও গুড়ে চিনি ছাড়া অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতি রোধ করা। এজন্য কিছু জৈব ও অজৈব পরিষ্কারক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

ক) জৈব বা উদ্ভিদজাত পরিষ্কারক :

১. ঢেঁড়স গাছের কাণ্ডের নিচের অংশ ও শিকড় পিষে যে বিজ্জল পদার্থ পাওয়া যায় তা দ্বারা রস পরিষ্কার করা যায়।

২. মান্দার ও শিমুল গাছের রস একাজে ব্যবহার করা যায়।

৩. ঘৃতকাঞ্চন বা ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরার নির্যাস প্রতি কেজি রসে ১০-১৫ গ্রাম বা ১ কড়াই অর্থাৎ ২০০-২৪০ কেজি রসে ২-২.৫ কেজি হারে ব্যবহার করা হয়। ঘৃতকুমারীর ছাল তুলে ভিতরের নির্যাস বের করে ফুটন্ত রসে ব্যবহার করতে হবে।

খ) অজৈব বা রাসায়নিক পরিষ্কারকারক :

১. সাধারণত ১ কেজি রসের সাথে ১ গ্রাম চুনের পানি মিশিয়ে গুড় শক্ত ও পরিষ্কার করা যায়।

২. গুড় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও পরিষ্কার করার জন্য সোডিয়াম বাই কার্বনেট ব্যবহার করা যায়।

৩. সোডিয়াম বাই কার্বনেটের পরিবর্তে পরিষ্কার সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের (৬০:৬.৪:৪.৫) সমন্বয়ে গঠিত সাজ্জি ও ব্যবহার করা য়ায়।

৪. গুড়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য হাইড্রোজ ব্যবহার করা হয়। তবে এর বেশি ব্যবহার ক্ষতিকারক।

৫. গুড় শক্ত না করে তরল গুড় তৈরির জন্য ফিটকিরি ব্যবহার হয়।

৬. গুড়ে ৭০ পিপিএম এর বেশি সালফার ডাই-অক্সাইড থাকলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

রস জাল প্রক্রিয়া : বড় কড়াইতে রস জ্বাল দিতে হয়। কড়াইয়ের মাপ ১৮০ সে.মি. লম্বা, ৯০ সে.মি.প্রস্থ, ১৫ সেমি. উচ্চতা হয়। জ্বাল দিলে প্রচুর পরিমানে গাঁদ ভেসে ওঠে যা দ্রুত হাতা দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হয়। এর পর ভেষজ নির্যাস ব্যবহার করতে হয়। এই গাদ গরু ও মহিষের ভালো খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়।

রস খনীভূতকরন: ভেষজ নির্যাসে প্রচুর পরিমাণে ভেজিটেবল প্রোটিন আছে, যা উত্তপ্ত রসে ঢেলে দিলে জমাটবদ্ধ হয়ে আশেপাশের ময়লা-আবর্জনাকে আটকিয়ে ধরে গাদে পরিণত করে ভেসে ওঠে। হাতা দিয়ে এই ময়লা গাদ ফেলে দিতে হবে, এতে রস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অধিকতর স্বচ্ছ রসে পরিণত হয় এবং গুড়ের মান বৃদ্ধি পায়। গাদ সরিয়ে ফেলতে বেশি দেরি হলে রসের সহিত মিশে জটিল অপরিশোধন যোগ্য হয়ে পড়ে এবং গুড়ের ক্ষতি হয়। রস ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

চিত্র : কড়াইতে আখের গুড় জ্বাল দেওয়া

চিত্র : আখের গুড়

গুড় তৈরি : এমতবস্থায় হাতার সাহায্যে কড়াইয়ের ফুটন্ত ঘনীভূত রস লাগাতারভাবে নাড়তে হবে এবং চুলার তাপ কমিয়ে ফেলতে হবে। ফুটন্ত ঘনীভূত রস সিরাপের ন্যায় হলে চুলা থেকে কখন নামানো উচিত তা নির্ধারণের জন্য হাতার সাহায্যে যৎসামান্য ঘনীভূত রস পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানির মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। যদি তা দ্রুত জমাট বাঁধে এবং পানিতে ছড়িয়ে না য়ায় তা হলে বুঝতে হবে গুড় চুলা থেকে নামানোর জন্য উপযোগী হয়েছে এ সময় রসের তাপমাত্রা ১১০-১০৫°c এ উন্নীত হয়। এ সময়ে ১০০ লিটার রসে ২০মি.লি নারিকেল তেল মিশালে রস ফেটে য়ায় না ও লেগে য়ায় না। গুড়ের দানার আকার ও আকৃতি ভালো হয়। কড়াই চুলা থেকে দ্রুত নামিয়ে কিছুটা ঠাণ্ডা করে চাহিদামতো কাঠের বা পোড়া ছাঁচে ঘনীভূত ঐ রস ঢালতে হবে। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিলেই রস ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যাবে এবং তা গুড় হিসাবে বিক্রি অথবা সংরক্ষণ করা যাবে।

২০২২

উন্নতমানের গুড়ের বৈশিষ্ট্য :

১. গুড়ের রং হালকা ও এর কাঠিন্যতা বেশি হতে হবে।

২. গুড় বেশি দানাদার হবে।

৩. এর স্বাদ মিষ্টি ও উত্তম গন্ধ থাকতে হবে।

৪. গুড়ের দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ক্ষমতা থাকতে হবে।

তবে গুড়ের গুণগত মান নির্ভর করে আখের রসের মিশ্রণ, রস জ্বাল দেয়ার পদ্ধতি, রস পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত উপাদানের ব্যবহারের উপর।

আখ থেকে চিনি উৎপাদন : মাড়াইযোগ্য আখকে প্রথমে চিনি কলের ঘূর্ণায়মান ছুরির সাহায্যে টুকরা টুকরা করে কাটা হয়। পরে ওই টুকরাগুলোকে পেষন করে রস বের করা হয়। তবে অবশিষ্ট আখের ছোবড়ায় (১-৩%) চিনি থেকে য়ায়। তাই আরো বেশি পরিমাণ চিনি আহরণের জন্য ছোবড়ায় উপর পানি সিঞ্চন করে বার বার পেষণ করা হয়। পাতলা কাপড়ের সাহায্যে রস ছেঁকে নিতে হয়। আখের রস কিছুটা অম্ল স্বাদযুক্ত এবং এতে গন্ধক, চুন যোগ করা হয়। ফলে সমস্ত অবাঞ্ছিত দ্রব্য থিতিয়ে পড়ে এবং দানা তৈরিতে সুবিধা হয়। পরে পরিষ্কার ও পরিশোধিত রস থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন মেশিনের সাহায্যে চিনি তৈরি করা হয়।

আখ থেকে চিনি উৎপাদনের ফ্লোচার্ট

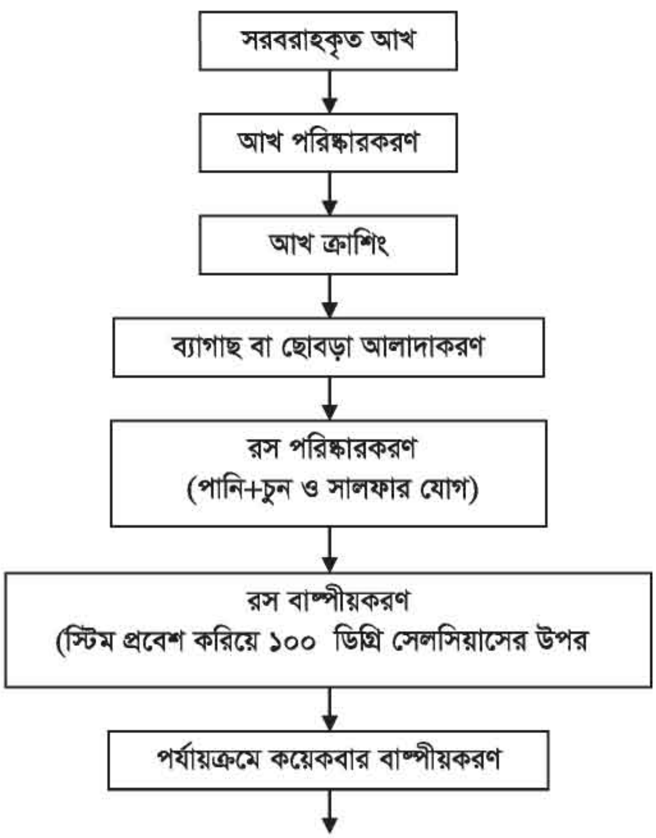

২০২২

ভ্যাকুম প্লান্টে প্রবেশ (স্টিম দেওয়া হয়)

↓

কাঁচা সুগার পরিণতকরণ
(রস ঘনকরণ করা হয়)

↓

সেন্ট্রিফিউগালে প্রবেশ
(মোলাসেস ও অন্যান্য পদার্থ আলাদা করা)

আইসিং সুগার : কনফেকশনারির খাবার প্রস্তুতের জন্য মেশিনে একপ্রকার গুঁড়া চিনি তৈরি হয়। একেই আইসিং সুগার বলে।

ব্রাউন সুগার : অশোধিত বাদামি রং এর চিনিকে ব্রাউন সুগার বলে। এটি বিদেশে পাওয়া য়ায় । আমাদের দেশের চিনি কলসমূহে আইসিং সুগার ও ব্রাউন সুগার তৈরি ও বাজারজাতকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই।

অনুশীলনী-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আখ কী ধরনের ফসল?

২. আখের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

৩. আখ কেন নবায়নযোগ্য কৃষি সম্পদ?

৪. কোন দেশে আখ জীবাশ্ম জ্বালানির মূল উৎস?

৫. আখের উৎপত্তি কোন দেশে?

৬. ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর আখের মোট চাষকৃত জমি ও ফলন কত?

৭. বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিউট কোথায় অবস্থিত?

৮. কৃষিবিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত কত গুলো আখের জাত উদ্ভাবন করেন?

৯. কোন তিনটি আখের জাত লবণাক্ততা সহনশীল?

১০. আখের পাতা দেখতে কোন গাছের মতো?

১১. আখের বীজ দেখতে কেমন?

১২. আখের প্রতিটি বীজে কয়টি চোখ থাকে?

১৩. আখের সাথে কোনগুলো সাথী ফসল হিসেবে চাষ হয়?

২০২২

১৪. বিশ্বের মোট চিনি উৎপাদনের কতভাগ সুগারবিট থেকে পাওয়া যায়?

১৫. সুগারবিটের কতদিনের মধ্যে ফলন হয়?

১৬. সুগার বিটের ফলন কত?

১৭. সুগার বিটের চিনি আহরণের পরিমাণ কত?

১৮. সুগার বিটের পাল্প থেকে কী পাওয়া যায়?

১৯. কেন সরকার সুগার বিট থেকে চিনি আহরণ করতে চাচ্ছেন?

২০. সুগার বিটের কয়টি জাত বের হয়েছে এবং তা কী কী?

২১. কোন যন্ত্র দ্বারা আখের চিনি পরিমাপ করা হয়?

২২. পরিপক্ব আখ সঠিক সময় না কাটলে কী হয়?

২৩. ডিসেম্বর মাসে আখে চিনির পরিমাণ কত হয়?

২৪. প্রতি ১০০ কেজি আখ থেকে কতটুকু চিনি ও গুড় পাওয়া যায়?

২৫. চিনি ও গুড়ের মধ্যে কার পুষ্টিমূল্য বেশি? কারণ কী?

২৬. দা বা হাঁসুয়া দিয়ে আখ কাটা উচিত নয় কেন?

২৭. ৫ রোলার বিশিষ্ট মাড়াইকলে কত আখ মাড়াই করা যায়?

২৮. যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আখের রস থেকে চিনি আহরণের পরিমাণ কত?

২৯. গুড় কাকে বলে?

৩০. গুড় পরিষ্কার করার জন্য জৈব পরিষ্কারকগুলো কী কী?

৩১. গুড় পরিষ্কার করার জন্য ঘৃতকুমারীর রস কী হারে ব্যবহার করতে হয়?

৩২. গুড়ে ব্যবহৃত অজৈব পরিষ্কারক কী কী?

৩৩. গুড়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য কী দেয়া হয়?

৩৪. তরল গুড় করার জন্য কী দেয়া হয়?

৩৫. গুড়ে কী পরিমাণ SO_2 থাকলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর?

৩৬. গুড় জ্বাল দেয়ার কড়াইয়ের মাপ কত?

৩৭. গুড় থেকে বের করা গাদ কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

৩৮. গুড়ের গাদ ফেলতে দেরি হলে কী ঘটে?

৩৯. রস ঘন হয়ে সিরাপের ন্যায় হলে তাপমাত্রা কত হয়?

৪০. গরম রসে কেন নারিকেল তেল দেয়?

৪১. গুড়ের গুণগত মান কিসের উপর নির্ভর করবে?

৪২. আখের রসের সকল অবাঞ্ছিত দ্রব্য কীভাবে দূর করে?

৪৩. ব্যাগাছ কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আখের গুরুত্ব ও উৎপাদন সম্পর্কে লেখ?

২. আখের পরিচিত ও জাত সম্পর্কে লেখ।

৩. সুগার বিটের জাত ও পরিচিতি সম্পর্কে লেখ।

৪. আখের রস, গুড় ও চিনির পুষ্টিমান তুলনা কর।

৫. সুগার বিটের পুষ্টিমান উল্লেখ কর।

৬. আখের মাড়াই কীভাবে হয়?

৭. আখের কর্তন কীভাবে করা হয়?

৮. গুড় উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপগুলো কী কী?

৯. গুড় পরিষ্কারের জন্য অজৈব পরিষ্কারকগুলো কী হারে ব্যবহার হয়?

১০. অজৈব পরিষ্কারক কী কী এবং কীভাবে দেয়া হয়?

১১. রসজাল এবং গুড় তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

১২. উন্নতমানের গুড়ের বৈশিষ্টগুলো কী কী?

১৩. আইসিং সুগার ও ব্রাউন সুগার কী?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. আখের গুরুত্ব, উৎপাদন, পরিচিতি ও জাত সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২. সুগারবিটের পরিচিতি ও পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

৩. 'গুড়ের পুষ্টিমান আখ থেকে বেশি' ব্যাখ্যা কর।

৪. আখের কর্তন, মাড়াই ও গুড়ের বৈশিষ্ট্য লেখ।

৫. আখের রস থেকে গুড় তৈরিকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৬. আখের রস থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং চিনি উৎপাদনের ফ্লোচার্ট লেখ। ২০২২

অধ্যায়-৬

মশলার পরিচিতি, পুষ্টি, সংরক্ষণ, মিলিং ও ব্যবহার

ভূমিকা : ভারতীয় উপমহাদেশকে একসময় মশলার দেশ বা সুগন্ধি গাছের দেশ বলা হতো। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশই নয়, এশিয়া মহাদেশজুড়ে ছিল মসলা ও সুগন্ধি গাছপালার প্রাচুর্য। চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশজুড়ে পাওয়া যেত নানা রকম সুগন্ধি গাছ বা মশলা।

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ প্রজাতির সুগন্ধি গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের প্রধান মসলাগুলো হচ্ছে পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, হলুদ ও ধনিয়া। বিগত ২০১৬-২০১৭ সালে দেশে মোট ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার একর জমিতে ২৫ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন মশলার উৎপাদন হয়। সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় পিয়াঁজ (১৮.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন)। এর পরই রসুন উৎপাদন হয় ৪.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং তৃতীয় স্থানে আছে হলুদ ১.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশের প্রধান ৬টি মসলা ছাড়া আর কোন মসলা বা সুগন্ধি গাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয় না। শীত ও গ্রীষ্ম দুই মৌসুমেই পেঁয়াজ ও মরিচ উৎপাদিত হয়। অথচ অন্যান্য প্রায় প্রতিটি মসলাই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার সুযোগ আছে। প্রতি বছর দেশের আর্যুবেদিক ও হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল পরিমাণে এ সকল মসলা গাছ তাদের ঔষুধের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

আমাদের দেশে মসলা ও সুগন্ধি গাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সঠিকভাবে আবাদকৃত গাছগুলো হচ্ছে-

১	মরিচ	৯	মেথি
২	পেঁয়াজ	১০	কালোজিরা
৩	রসুন	১১	রাঁধুনি
৪	আদা	১২	আম আদা
৫	ধনিয়া	১৩	পুদিনা
৬	বিলাতি ধনিয়া	১৪	তেজপাতা
৭	মৌরি	১৫	দারুচিনি
৮	জৈন	১৬	বাজনা ইত্যাদি

আরোও কিছু সুগন্ধি গাছ আছে যেগুলো এদেশে অল্প পরিমাণে হয় বা বনে-জঙ্গলে পাওয়া যায় যেমন-

১	কারিপাতা
২	পোলাও পাতা
৩	লেবু ঘাস বা লেমন গ্রাস
৪	ঘাগড়া ইত্যাদি।

অন্য দেশ হতে আমদানি করে আমরা যে সকল মসলা খেয়ে থাকি সেগুলো হলো-

১	এলাচ
২	জিরা
৩	শা জিরা
৪	জয়ফল
৫	জৈত্রী
৬	লবঙ্গ
৭	কাবাব চিনি
৮	জাফরান
৯	গোলমরিচ

৬.১ বিভিন্ন মশলার নাম, চাষ মৌসুম ও জাত :

বেশিরভাগ মসলাই রবি মৌসুম বা শীতকালে জন্মে থাকে। নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ঋতুতে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা কম থাকে। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী সেচের দরকার হয়। আকাশ পরিষ্কার থাকে বৃষ্টি বাদল কম হয় এবং রোগবালাই কম হয় বলেই মসলা চাষের উপযোগী হয়। তবে কিছু কিছু মসলা আছে তা সারা বছরই জন্মে থাকে।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার মশলার নাম ও চাষ মৌসুম বর্ণনা করা হলো :

ক্রমিক নং	মশলার নাম	চাষ মৌসুম
১	পেয়াঁজ	তিন মৌসুমে, খরিপ-১-আগাম জাত খরিপ-২-নাবি জাতপ রবি মৌসুম-শীতকালীন জাত
২	রসুন	রবি মৌসুম (অক্টোবর হতে মার্চ পর্যন্ত)
৩	মরিচ	রবি মৌসুম (গ্রীষ্মকালীন ও সারাবছর)
৪	মিষ্টি মরিচ	রবি মৌসুম (সেপ্টেম্বের-নভেম্বর)
৫	হলুদ	সারা বছর (মার্চ-জানুয়ারি)
৬	আদা	সারা বছর (মার্চ-জানুয়ারি)
৭	বিলাতি ধনিয়া	সারা বছর
৮	ধনিয়া	রবি মৌসুম (অক্টোবর/নভেম্বর-মার্চ)
৯	মৌরী	রবি মৌসুম (অক্টোবর/নভেম্বর ফেব্রুয়ারি)
১০	মেথি	রবি মৌসুম (নভেম্বর-এপ্রিল)
১১	কালিজিরা	রবি মৌসুম (অক্টোবর-মার্চ)

১২	রাঁধুনি	রবি মৌসুম (সেপ্টেম্বর/নভেম্বর-মার্চ)
১৩	জৈন	রবি মৌসুম (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-মার্চ)
১৪	কারি পাতা	সারা বছর (জুন/জুলাই-এপ্রিল)
১৫	তেজপাতা	সারা বছর (জুন/জুলাই-এপ্রিল)
১৬	পুদিনা পাতা	সারা বছর (অক্টোবর/নভেম্বর-সেপ্টেম্বর)
১৭	দারুচিনি	সারা বছর (জুন/জুলাই-এপ্রিল)
১৮	গোল মরিচ	সারা বছর (মে/জুন-জানুয়ারি)
১৯	চই	সারা বছর (জুন/জুলাই-এপ্রিল)
২০	কর্পূর	সারা বছর (জুন/জুলাই-এপ্রিল)
২১	লেবু ঘাস	খরিপ মৌসুম (মার্চ-জুলাই)
২২	পার্সলি	রবি মৌসুম (অক্টোবর-জানুয়ারি)
২৩	লিক	রবি মৌসুম (অক্টোবর-জানুয়ারি)
২৪	পাতা পেঁয়াজ	সারা বছর
২৫	আলু বুখারা	ফেব্রুয়ারি-জুন
২৬	বাঞ্চিং অনিয়ন	রবি মৌসুম (অক্টোবর-জানুয়ারি)

বিভিন্ন মশলার জাত :

বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুরের মসলা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহের তথ্যাবলি নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রঃ নংঃ	জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
১	বারি মরিচ-১	২০০০	সারা বছর	১০-১২ (কাঁচা) ২.৫-৩.০ (শুকনা)	১২০-১৫০	কাঁচা এবং পাকা মরিচের ঝাল সহনীয়।
২	বারি মরিচ-২	২০১৩	গ্রীষ্মকালীন	২০-২২ (কাঁচা)	২৪০-২৫০	প্রতিটি মরিচের দৈর্ঘ্য গড়ে ৭ সেন্টিমিটার ও ওজন গড়ে ২.৫ গ্রাম।
৩	বারি মরিচ-৩	২০১৩	শীতকালীন	৮-১০ (পাকা)	১৬০-১৯০	মরিচের ফল (পড) লম্বা আকৃতির, দৈর্ঘ্য গড়ে ১০ সেন্টিমিটার এবং ওজন গড়ে ৩.০ গ্রাম।
৪	বারি পেঁয়াজ-১	১৯৯৬	শীতকালীন	১২-১৮ (কন্দ)	১২০-১৩৫	কন্দের আকার চ্যাপ্টা, গোলাকার, বোঁটা চিকন, মধ্যমাকৃতির, লালচে পাটল বর্ণের এবং অধিক ঝাঁঝযুক্ত।
৫	বারি পেঁয়াজ-২	১৯৯৬	গ্রীষ্মকালীন	১২-১৪ (কন্দ)	৯০-১০৫	কন্দ গোলাকার এবং লালচে বর্ণের। কন্দ সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচলযুক্ত শুকনা স্থানে ৮-৯ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

২০২২

৬	বারি পেঁয়াজ-৩	১৯৯৯	গ্রীষ্মকালীন	১৪-১৮ (কন্দ)	৯০-১০৫	কন্দ সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচলযুক্ত শুকনা স্থানে ৮-৯ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
৭	বারি পেঁয়াজ-৪	২০০৮	শীতকালীন	১২-১৬ (কন্দ)	১২০-১৩৫	কন্দের আকার ঈষৎ লম্বাটে, কন্দ মধ্যমাকৃতির, ধূসর লালচে বর্ণের এবং ঝাঁঝযুক্ত।
৮	বারি পেঁয়াজ-৫	২০০৮	গ্রীষ্মকালীন	১৬-২২	৯০-১০৫	গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৭০-৮০ গ্রাম হয়। বীজ হার ৫-৬ কেজি/হেক্টর।
৯	বারি রসুন-১	২০০৬	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ)	৬-৭	১৩৫-১৫০	এই জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
১০	বারি রসুন-২	২০০৭	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ)	৭-৮	১৩৫-১৫০	এই জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
১১	বারি হলুদ-১	১৯৯৬	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৮-৩২ (কাঁচা)	২৭০-২৮০	রং গাঢ় হলুদ।
১২	বারি হলুদ-২	১৯৯৬	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৫-২৮ (কাঁচা)	২৭০-২৮০	রং গাঢ় হলুদ।
১৩	বারি হলুদ-৩	২০০০	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৫-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০	রং গাঢ় হলুদ।
১৪	বারি হলুদ-৪	২০১৩	মধ্য এপ্রিল-মধ্য ফেব্রুয়ারি	২৮-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০	অন্তর রং (Core color) কমলা হলুদ (Orange Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২০-২২ ভাগ।
১৫	বারি হলুদ-৫	২০১৩	মধ্য এপ্রিল-মধ্য ফেব্রুয়ারি	১৮-২০ (কাঁচা)	২৭০-৩০০	অন্তর রং (Core color) কমলা হলুদ (Orange Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২৬-৩০ ভাগ।
১৬	বারি আদা-১	২০০৮	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	৩০-৩৫ (কাঁচা)	২৭০-৩০০	জাতটির রোগ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
১৭	বারি ধনিয়া-১	১৯৯৬	শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ)	৩.৫-৪.৫ (পাতা) ১.৭-২.০ (বীজ)	১২০-১৩৫	বীজগুলো হরিদ্রা বর্ণের মাঝারি আকারের। পাতা ও বীজ উভয়ই ব্যবহার্য।
১৮	বারি বিলাতি ধনিয়া-১	২০১৩	সারা বছর	৩০-৫০ (পাতা) ৩০০-৪০০ কেজি (বীজ)	১৫০-২৮০	পাতা জাতীয় মসলা যা সারা বছর চাষ করা যায়।

২০২২

১৯	বারি কালিজিরা-১	২০০৮	শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ)	০.৮-১.০	১২০-১৩৫	প্রতি গাছে প্রায় ৫-৭ গ্রাম বীজ হয়ে থাকে এবং ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৩.০০-২.২৫ গ্রাম।
২০	বারি মেথি-১	২০০০	শীতকালীন (নভেম্বর-	১.২-১.৫	১২০-১৩৫	বীজগুলো শুষ্ক ও হলুদাভ বাদামি বর্ণের। এ জাতের

৬.২ মশলার শ্রেণিবিভাগ ও পুষ্টিমান :

খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদজাত দ্রব্য খাদ্য তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়, সাধারণত তাদেরকেই মসলা বলে। প্রকার ভেদে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, রূপান্তরিত কাণ্ড, কাণ্ডের বাকল, পাতা, ফুল, ফুলের পাপড়ি এবং ফল বা বিচি মসলা হিসেবে ব্যবহার হয়।

সকল প্রকার মসলাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

(ক) স্পাইসেস (Spices)

(খ) কন্ডিমেন্টস (Condiments) ও

(গ) কালিনারি হার্ব (Culinary herb)

(ক) স্পাইসেস : খাদ্য রান্না করার সময় খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি, খাদ্যকে আকর্ষণীয় ও খাদ্যে সুগন্ধি আনার জন্য যেসকল উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ দ্রব্য প্রধান খাদ্যের সাথে যোগ করা হয়, সেগুলোকে স্পাইসেস বলে। যেমন- কাঁচামরিচ, শুকনা মরিচ, পেয়াঁজ, আদা, রসুন ইত্যাদি।

চিত্র : বিভিন্ন রকমের স্পাইসেস

(খ) কন্ডিমেন্টস : খাদ্যকে সুগন্ধি, আকর্ষণীয়, রঙিন ও বিশেষ ঘ্রাণ সৃষ্টি করার জন্য রান্নার শেষ পর্যায়ে বা রান্নার পর যেসকল উদ্ভিদজাত দ্রব্য মিশানো হয় তাদের কন্ডিমেন্টস বলে। যেমন- এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা গোলমরিচ, জিরা ইত্যাদি।

চিত্র : বিভিন্ন রকমের কন্ডিমেন্টস ।

(গ) কিউলিনারি হার্ব : যেসকল উদ্ভিদজাত দ্রব্য রান্নার পর খাদ্য বা খাবারের টেবিল আকর্ষণীয় করার জন্য এবং স্বাদ বৃদ্ধির জন্য পরিবেশনের পূর্বে খাদ্যে মিশ্রণ বা যোগ করা হয়, তাকে কিউলিনারি হার্ব বলে। যেমন– ধনিয়া, বিলাতি ধনিয়া, পাতা পেয়াঁজ, কারিপাতা, পুদিনা পাতা, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি।

চিত্র : বিভিন্ন রকমের কিউলিনারি হার্ব ।

মশলার পুষ্টিমান : আমরা যেসকল মসলা খাদ্যে ব্যবহার করে থাকি তন্মধ্যে কয়েকটি বেশ পুষ্টিগুণসম্পন্ন। বাকি মসলা তেমন পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ নয় তবে এ সকল মসলা সাধারণত খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও রঙ বৃদ্ধিতে এবং খাদ্যকে আকর্ষণীয় করার কাজেই বেশি ব্যবহার হয়। যে সকল মসলা খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বৃদ্ধি করে কিন্তু রং সৃষ্টি করে না সেগুলোকে ফ্লেভিনয়েডস (Flavinoids) বলে। পুষ্টিমানের দিক দিয়ে প্রধান কিছু কিছু মশলার পুষ্টিমূল্য জানা থাকলেও বেশিরভাগ গৌণ মশলার পুষ্টিমানের কথা জানা যায় না। এ সকল গৌণ মসলা বিভিন্ন খাদ্যে খুব কম পরিমাণে ব্যবহার হয় বলে এগুলো পুষ্টিগুণের উৎস হিসেবে তেমন প্রভাব বিস্তার করে না। এসব গৌণ মসলায় বিশেষ ধরনের সুগন্ধি রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেমন- গোল মরিচে আছে পাইপারিন, জিরায় আছে কিউমিনালডিহাইড, লবঙ্গে আছে ইউজিনল, এলাচে আছে সিনেউল, বর্নিউল, তেজপাতায় আছে ইউজিনল এবং দারুচিনিতে আছে সিনামালডিহাইড ইত্যাদি যা ঐ সকল মশলার বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তৈরি খাদ্যের সংরক্ষণে ও গুণাগুণ রক্ষার্থে এদেরকে বেশি ব্যবহার করা হয়। নানা প্রকার আচার, চাটনি, কেচাপ, মোরব্বা প্রভৃতি তৈরিতে এবং এদের সংরক্ষণ গুণাগুণ বৃদ্ধিতে সাধারণত এসব মসলা ব্যবহার করা হয়। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন মশলার পুষ্টিমান দেখানো হলো :

সারণি : বিভিন্ন মসলা ফসলের পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে)।

ক্রঃ নংঃ	মসলার নাম	জলীয় অংশ	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	খনিজ পদার্থ	ভিটামিন এ (আই.ইউ)	ভিটামিন সি (মি.গ্রা)
০১	পেয়াঁজ	৮৮	১.৪	০.৮	৮.০	০.৪	-	১১
০২	রসুন	৬২	৬.৩	০.১	২১.৮	১.০	-	১৩
০৩	মরিচ (কাঁচা)	৮২.৬	২.৯	০.৬	৬.১	১.০	৪৫৪	১১১
০৪	মরিচ (শুকনা)	১০.০	১৫.৯	৬.২	৩১.৬	৬.১	৫৭৬	৫০
০৫	আদা	৮০.০	২.৩	০.৫	১২.৩	১.২	১৭৫	১২
০৬	হলুদ	-	৬.৩	৫.১	৬৯.৪	৩.৫	১৭৫	৪৯.৮
০৭	ধনিয়া	১১.২	১৪.১	১৬.১	২১.৬	৪.৪	১৭৫	১২.০
০৮	জিরা	১১.৯	১৮.৭	১৫.০	৩৬.৬	৫.৮	১৭৫	১৭.২
০৯	মেথি	৬.৩	৯.৪	১০	৪২.৩০	১৩.৪০	-	সামান্য
১০	রাঁধুনি	৫.১০	১৮.১০	২২.৮	৪০.৯	১০.২	-	সামান্য
১১	সলুক	৬০.	১৩.১	-	৩৫.৭	৬	-	-
১২	চই	৯.৫	১২.২	১.৫	৩৯.৫	-	-	-
১৩	কারিপাতা	-	৬.১০	১.০	১৬	৪.২	সামান্য	সামান্য
১৪	আলু বুখারা	-	-	-	-	১২	৫	১৩
১৫	অল স্পাইস	৮.৮	৬	৬.৬	৫২.৮	১.৮	-	-
১৬	জয়ফল ও জৈত্রী	১৪.৩	৭.৫	-	১৮.৫	২.০	-	-
১৭	ধনিয়া পাতা	৮৮	৩.২	-	৬.০	২	৭০০০	১২০
১৮	পুদিনা পাতা	৮৬	৩.৫	-	৩.৪	১.৬	১৬০০	২৬
১৯	লেটুস	৯৪	২.০	-	২.৫	০.৫	-	১০
২০	মৌরি	১৩	১৮	-	৮.২৩	৫	-	-
২১	বাঞ্চিং অনিয়ন	-	২.২	০.৩৫	-	-	০.৭	৮০

২০২২

৬.৩ মসলা শুকনো ও সংরক্ষণ ঃ

সংরক্ষণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বীজ শুধু উৎপাদন করলেই চলে না। বীজ উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে পরবর্তী ৩ মাস থেকে ১২ মাস সময়ের মধ্যে নষ্ট না হয়ে যায়। কারণ এ সময়ের আগে বীজ সাধারণত ফসল উৎপাদনের জন্য বপন করা হয় না। নিম্নে প্রধান প্রধান মসলা ফসলের শুকানো ও সংরক্ষণ বর্ণনা করা হলো-

১. **মরিচ :** কাঁচামরিচ স্বাভাবিক পরিবেশে ২-৩ দিন রাখা যায়। তবে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকলে ৫-৭ দিন পর্যন্ত রাখা যায়। কাঁচা মরিচে পানি দেয়া যাবে না। তাতে মরিচ পচে যাবে। কাচামরিচ ৩২° C তাপমাত্রায় ৯৫-৯৮% আর্দতায় ৪০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের জন্য পাকা মরিচ বোঁটাসহ তুলে ৩-৪ দিন ঘরে রাখতে হয়। এতে করে মরিচের কিছুটা কাঁচা ভাব থাকলেও সেগুলো ঠিকমতো পেকে যায় এবং রং ধারণ করে। সংরক্ষণের জন্য কাঁচা ও আধাপাকা মরিচ তোলা হলে শুকানোর সময় তা নষ্ট হয়ে যায়। বাঁশের চাটাই বা পাটি বা পাকা ছাদের উপর ৮-১০ দিন সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পাকা মরিচ কড়া রোদে শুকাতে হয়।

পাকা মরিচের শতকরা ২৫-৩০ ভাগ শুকনা মরিচ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১০০ কেজি পাকা মরিচ হতে ৩০-৩৫ কেজি শুকনা মরিচ পাওয়া যায়। মরিচ ঠিকমতো শুকনা হলে হাত দিয়ে চাপ দিলে মচমচ করবে এবং ভেঙে যাবে। পাকা মরিচ ৪-৫ দিন শুকানোর পর মরিচের উপর কাঠের তক্তা বা ভারী কিছু জিনিস দিয়ে চাপ দিলে মরিচগুলো চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এতে মরিচ সংরক্ষণের সুবিধা হয় এবং অল্প স্থানে বেশি মরিচ রাখা যায়। মরিচ শুকানোর পর ঠান্ডা করে পলিব্যাগ বা চটের বস্তায় রাখা যায়। মরিচ শুকানোর সময় বৃষ্টি হলে চুলার তাপেও মরিচ শুকানো যায়। মরিচকে রোদ বা চুলার তাপে যেখানেই শুকানো হোক না কেন বারবার ওলটপালট করে দিতে হয়। তাতে সমানভাবে মরিচের সবদিক শুকাতে পারে। শুকনা মরিচের বোটা ছিঁড়ে মেশিনে ভাঙ্গিয়ে মরিচের গুঁড়া করা হয়।

বড় এলাচ	কালোজিরা	বিলাতি ধনিয়া	মৌরি
লেমন ঘাস	লবঙ্গ	জাফরান	আলু বোখারা

২. **হলুদ :** হলুদ সিদ্ধকরণ : মাটি থেকে হলুদ তোলার পর হলুদের গায়ের মাটি ও শিকড়গুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর একটি পাত্রে হলুদ ও পানি ভর্তি করে ৩০-৪০ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। জ্বাল দেয়ার সময় পাত্রের পানি দুইবার ফুটে উঠলে হলুদ সিদ্ধ হবে। ২/১টি হলুদ ভেঙে ইটের মতো রঙ দেখা গেলে হলুদ সিদ্ধ হয়েছে বুঝতে হবে। তবে হলুদের গায়ের রং কালচে হওয়া পর্যন্ত হলুদ সিদ্ধ করতে হবে। হলুদ সিদ্ধ হলে হলুদগুলো ছেঁকে তুলে নিতে হবে এবং এই জ্বালের গরম পানি পুনরায় হলুদ সিদ্ধের কাজে লাগাতে হবে।

সিদ্ধ করা মোটা হলুদ কেটে ফালি করে পাতলা করতে হবে। সিদ্ধ হলুদ ৩-৪ সপ্তাহ রোদে শুকাতে হবে। প্রথম সপ্তাহে শুকানোর সময় প্রত্যহ ৩-৪ বার উলটপালট করে দিতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে দিনে ২ বার হলুদে ডলা দিতে হয়। এর ফলে হলুদ গোল পেন্সিলের মতো হয়। হলুদ ঠিকমতো না শুকালে গুঁড়াকরা যাবে না। হলুদ ভালোভাবে শুকানোর পর ভেঙে দেখলে পাথরের মতো দেখাবে ও শক্ত জিনিসের সাথে আঘাত করলে টনটন শব্দ হবে। এছাড়া হলুদের রং সুন্দর করার জন্য চটের বস্তায় ভরে বার বার আছাড় দেওয়া হয় বা লাঠি দিয়ে পিটানো হয়। এতে হলুদের রং উজ্জ্বল হয়। অতঃপর হলুদ বস্তায় ভরে উঁচু মাচায় বা গোলাঘরে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

৩. **আদা :** আদাকে দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথা- বাকলসহ ও বাকলবিহীনভাবে আদা সংরক্ষণ। বাকলসহ আদা আবার দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায় যেমন- বালুতে সংরক্ষণ ও শুকিয়ে সংরক্ষণ। বাকলসহ বালুতে সংরক্ষণের জন্য মাটিতে গর্ত করে তাতে আদা ও বালু ১ঃ১ অনুপাতে গর্ত ভর্তি করে বালু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। গর্তে যেন পানি প্রবেশ না করে এজন্য ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। বাকলবিহীন আদা দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথা- শুকানো বা Cured আদা এবং প্রক্রিয়াজাত বা সবুজ আদা (Green ginger)। শুকানো আদা তৈরিতে আদার বাকল ফেলে রোদে শুকানো হয়। খোসা ছাড়াবার পূর্বে আংশিক সিদ্ধ করে নিতে হয়। ইহাকে কালো আদা বলে। তবে আদাকে ব্লিচিং করে নিলে তা সাদা আদায় পরিণত হয়।

৪. **গোলমরিচ :** আমরা বাজারে যে কাল গোলমরিচ মশলা হিসেবে দেখি তা গাছের শুকনো অপক্ক ফল। ফল সংগ্রহ করার পর ৮-১০ দিন রোদে শুকালে ফল কিঞ্চিত কুঁচকে গিয়ে কালো বর্ণ ধারণ করে। আন্তর্জাতিক বাজারে এটাই গোলমরিচ বা ব্ল্যাক পিপার। ১০০ কেজি কাঁচা ফল হতে ৩০-৩৫ কেজি কাল গোলমরিচ ও ২৬-২৭ কেজি সাদা গোলমরিচ পাওয়া যায়। শুকানো গোলমরিচ হাতে চাপ দিলে শক্ত লাগে এবং দাঁতে চাপ দিলে পুটপুট শব্দ করে ফেটে গেলে বুঝতে হবে ঠিকমতো শুকিয়েছে।

৫. **দারুচিনি :** ৩-৪ বছরের গাছ থেকেই দারুচিনির সংগ্রহ করা যায়। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের আঙ্গুলের চেয়ে মোটা ডাল কেটে দু'ফালি করে ছাল ছড়ায়ে আলাদা করা হয়। ছাল বা বাকলই দারুচিনি মসলা। বাকলগুলো জমা করে মোটা কাপড় বা বস্তা দিয়ে স্তূপ করে ঢেকে পচানো হয়। পরে ছুরি দিয়ে

চিত্র : দারুচিনির কুইল

বাহিরের ত্বক চেঁছে ফেলা হয়। তারপর বাকলগুলো ৩-৪ দিন রোদে ভালো করে শুকানো হয়। শুকানোর পর বাকলগুলো শুকিয়ে চোঙ্গার আকার ধারণ করে। একে কুইল বলে। এই অবস্থায় দারুচিনি বস্তাবন্দি করে রপ্তানি করা হয়।

৬. **ধনিয়া :** ধনিয়া পাকলে হাতে নিয়ে ডলা দিলে সহজেই ভেঙে দুই টুকরা হবে। এ অবস্থায় ধনিয়ার গাছ তুলে রোদে ভালোভাবে শুকায়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করতে হয়। মাড়াই করা বীজ আলাদা করে পরিষ্কার করে রোদে ভালোভাবে শুকাতে হয়। ধনিয়ার আর্দ্রতা ৫-৬.৫ ভাগ নেমে আসলে বীজগুলো হাতে নিয়ে চাপ দিলে মচমচ শব্দ করবে। এছাড়া দাঁতের নিচে চিবুলে মচমচ শব্দ এমনকি অনেক সময় মুড়ির ন্যায় গুঁড়া হয়ে যাবে। ঠান্ডা করে চটের বা পলি ব্যাগে ভর্তি করে উঁচু, শুকনা ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখতে হয়।

৭. **রসুন:** পেয়াঁজের চাইতে রসুন সংরক্ষণ করা সহজ। রসুন মাঠ হতে তোলার পর গাছসহ ঝাড়সহ একত্রে ২/১ দিন জমা করে রাখা হয়। পরবর্তীতে রসুনের শিকড় কেটে ৪-৫ দিন ছায়ায় শুকাতে হয়। অনেক সময় শিকড় ও গাছ কেটে ১ দিন রোদে শুকায়ে ধুলাবালি ঝেড়ে আলোবাতাসযুক্ত স্থানে রাখা হয়। শুধু শিকড় কাটা শুকানো রসুনের গাছগুলো মুঠি আকারে বেঁধে রশিতে বা বাঁশের সাথে ঝুলায়ে রাখা যায়। প্রক্রিয়াজাত করেও রসুন রাখা যায়। যেমন- লবণ রসুন, রসুনের পাউডার, রসুনের সস ও রসুনের আচার ইত্যাদি।

৬.৪ বিভিন্ন প্রকার মসলা মিলিং :

১. **হলুদ :** হলুদ সিদ্ধ করা ও শুকানোর পর হলুদ পলিশিং করা হয়। এতে হলুদের ত্বক মসৃণ ও আকর্ষণীয় করা হয়। তারপর হলুদের সাথে 'সরিষা ফুলি' রং মিশায়ে আরও আর্কষনীয় করার পর মিলিং করা হয়। অনেক সময় সরিষার পেস্ট তৈরি করে সংরক্ষণ করে।

- **পেস্ট তৈরি :** সর্বপ্রথম কাঁচা হলুদ সংগ্রহ, পরিষ্কার ও বাছাই করতে হবে। পরে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ধারালো চাকু বা ছুরি দিয়ে হলুদের ছাল বা বাকল তুলে ফেলতে হবে। হলুদের এনজাইমেটিক কার্যকারিতা দূর করার জন্য সসপ্যান বা পাতিলে ১ ঘণ্টা ব্লাঞ্চিং (Blanching) বা সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ হলুদ চপার মেশিন (Chopper Machine) বা শিল-পাটায় অর্ধপেষা করে নিতে হবে। অর্ধপেষা হলুদকে ব্লেন্ডার মেশিনে পানি ও পেষা হলুদ ১ঃ৪ অনুপাতে মিশিয়ে হলুদের পেস্ট তৈরি করতে হবে। হলুদ পেস্টের সাথে ০.৫% সাইট্রিক এসিড যোগ করে pH ৬ হতে ৪ এ নামিয়ে আনতে হবে। Preservative হিসেবে সোডিয়াম বেনজয়েট (১ গ্রাম/কেজি হলুদ পেস্ট) সামান্য হালকা গরম পানির সাথে গুলিয়ে হলুদ পেস্টের সাথে যোগ করতে হবে। এভাবে তৈরি হলুদ পেস্ট (Paste) পলিথিন ব্যাগ বা কাঁচের বোতল বা প্লাস্টিক পাত্রে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় ৪-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

- **পাউডার তৈরি :** উপযুক্ত, পরিপক্ব ও রোগমুক্ত হলুদ সংগ্রহ করে পানিতে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর বাছাই করে সিদ্ধ বা ব্লাঞ্চিং করতে হবে। রোদে শুকানোর পর পলিশ করে আস্ত হলুদ বাজারজাত করা হয়। এছাড়া বাজারে মসলা ভাঙানোর মেশিনে হলুদ গুঁড়া করা যাবে।

- **প্যাকেজিং :** অতঃপর ছেঁকে ময়লা বা অপদ্রব্য দূর করে পরিমাণমতো প্যাকেট করতে হবে। হলুদ গুঁড়া করার সাথে সাথেই বৈয়ামে রাখতে হবে। তা না হলে বাতাসের আর্দ্রতা গ্রহণ করে হলুদ পাউডার নষ্ট হয়ে যাবে।

২. মরিচ : মরিচ শুকানোর পর ঠান্ডা করে পলিব্যাগে বা চটের বস্তায় রাখা হয়। দুইস্তর বিশিষ্ট পলিব্যাগ বা বস্তায় শুকনো মরিচ সংরক্ষণ করলে মরিচের রঙ উজ্জ্বল থাকে, বীজ অঙ্কুরোদগম বেশি হয় এবং বাজারমূল্য বেশি পাওয়া যায়। শুকনো মরিচের বোঁটা ছিঁড়ে ঢেঁকিতে বা মসলা ভাঙানোর মেশিনে মরিচের গুঁড়া করে তা বৈয়ামে সংরক্ষণ করে পারিবারিক কাজে ব্যবহার করা হয়। বৈয়ামে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় রাখতে হয় অন্যথায় ছত্রাক আক্রমণ করে থাকে। এছাড়া প্রিজারভেটিভ (৭৫০ ppm পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট [KMS] ও সাইট্রিক এসিড ০.৫%) দিয়ে মরিচের পেস্ট তৈরি করেও দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

৩. আদা প্রক্রিয়াজাত করার পদ্ধতি : প্রক্রিয়াজাত আদা বা green zinger তৈরির জন্য আদাকে ধারালো ছুরির সাহায্যে খোসা ছিলে ৫০ গ্রাম লবণ, ১ গ্রাম এসিটিক এসিড (গাঢ় ভিনেগার), ১ গ্রাম পটাশিয়াম মেটা বাইসালফেট (KMS) ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে দ্রবণে ভিজানো হয়। ১ কেজি আদার জন্য ১-১.৫ লিটার দ্রবণ প্রয়োজন হয়। খোসা ছাড়া আদাকে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে কাঁচের বৈয়ামে দ্রবণসহ ভরে বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে রাখা আদা এক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। একইভাবে চিউইং জিনজার তৈরি করে বাজারজাত করা হয়।

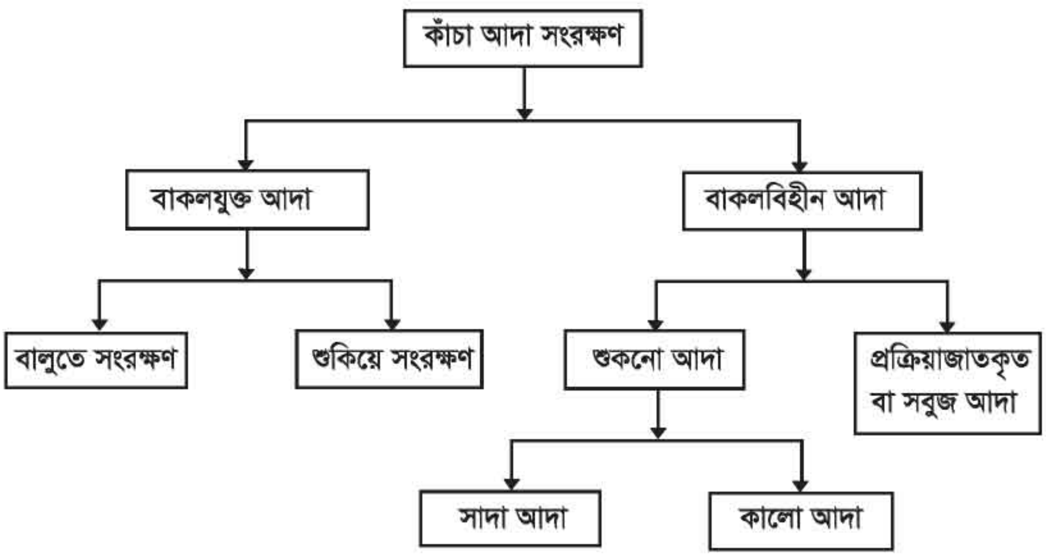

চিত্র : আদা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ছক

২০২২

৪. গোল মরিচ : কালো গোল মরিচকে প্রক্রিয়াজাত বা মিলিং করে নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের গোল মরিচ পাওয়া যায়।

(ক) সাদা গোলমরিচ

(খ) হালকা গোলমরিচ

(গ) সবুজ গোলমরিচ

(ঘ) লাল গোলমরিচ

(ঙ) গোল মরিচের গুঁড়ো

সাদা গোলমরিচ : গোলমরিচের ফল সম্পূর্ণ পেকে গেলে ছড়াসহ তা গাছ থেকে কেটে নেয়া হয়। পাকা ফলগুলোকে চৌবাচ্চায় বা বড় পাত্রে ৪-৬ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এ সময় যেসব বীজ পানির উপর ভেসে ওঠে সেগুলোকে সংগ্রহ করা হয়। এই গোলমরিচকে হালকা গোলমরিচ বা Light Peeper বলে। এগুলোও বাজারে বিক্রি হয়। পানিতে ডুবে থাকা ফলগুলোকে দৈনিক ২-৩ বার নেড়ে দেয়া হয়। ১০-১২ দিন পর ফলগুলো তুলে একটি ত্রিপলের উপর গাদা করে রাখা হয়। ফলের খোসা নরম হওয়ায় ত্রিপলের উপর ফলগুলো হাত দিয়ে ঘষা দিলে খোসা উঠে যায়। এরপর রোদে শুকিয়ে যে গোলমরিচ পাওয়া যায় তাকে সাদা গোলমরিচ বা White Peeper বলে।

ইন্দোনেশিয়ায় শুকানো ফলের খোসা মেশিনে অপসারণ করা হয় বলে গোল মরিচের দানা ভেঙ্গে ছোট ছোট হয়ে যায়। তুলে ফেলা খোসাও গুঁড়ো করে ব্যবহার হয়। এই গুঁড়ো খুব কালো ও সুস্বাদু। ফল শুকিয়ে তা চূর্ণ করে তেল বা স্পিরিট আহরণ করা যায়। গোল মরিচের স্পিরিট কোমল পানীয় (Soft Drink) কোকাকোলা তৈরিতে কাজে লাগে। তেল ও প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার হয়। ইউরোপ ও চীনে গোলমরিচের গুঁড়া রান্না ও সালাদে ব্যবহার করা হয়।

সবুজ ও লাল গোলমরিচ : অনেক সময় কাঁচা ফলের সবুজ রঙ ঠিক রেখে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকানো হয়। একে বলে সবুজ গোলমরিচ বা green pepeer. ফলের সবুজ রঙ ধরে রাখার জন্য সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) গ্যাস দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এরপর তা শুকিয়ে কৌটায় ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। আবার অপরিপক্ব ফলকে অনেক সময় ভিনেগারে চুবিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে লাল পাকা ফল সংরক্ষণ করা হলে তাকে লাল গোলমরিচ বা Red pepper বলে।

৫. ধনিয়া : ধনিয়া মিলিং করার পূর্বে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে ধনিয়ার আর্দ্রতা বেড়ে গেছে কি না? পোকামাকড় ও রোগবালাই মুক্ত হলে তখন মিলিং-এর উপযোগী হয়। গুঁড়ো করার সময় ধনিয়াগুলোকে একবার রোদে ঘণ্টাখানেক শুকিয়ে মসলা ভাঙানো মেশিন দিয়ে গুঁড়ো করে নিতে হবে। গুঁড়ো করার পর সাথে সাথে ছোট ছোট পলিব্যাগে ভরে প্যাকেট করে বাজারজাত করতে হবে। অথবা বড় পাত্রে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. দারুচিনি : দারুচিনি মিলিং-এর জন্য টিনের চালাবিশিষ্ট ঘরের চালার ফুট খানেক নিচে ঝুলন্ত মাচা করে সেখানে বাকল বিছিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করা যায়। রোদে শুকানো উচিত নয়। দারুচিনি গাছের শুকানো বাকল মসলা হিসেবে ব্যবহার হয়। বাকলের পুরুত্ব ০.২-১.০ মি.মি হয়ে থাকে। এই বাকল মোড়ানো

২০২২

অবস্থায় কাঠির মতো করে (Quill) বাজারজাত করা হয়। বাকল থেকে গুঁড়ো বা Powder তৈরি করা হয়। মিলিং এর ধারাবাহিক স্তর নিম্নে দেয়া হলো :

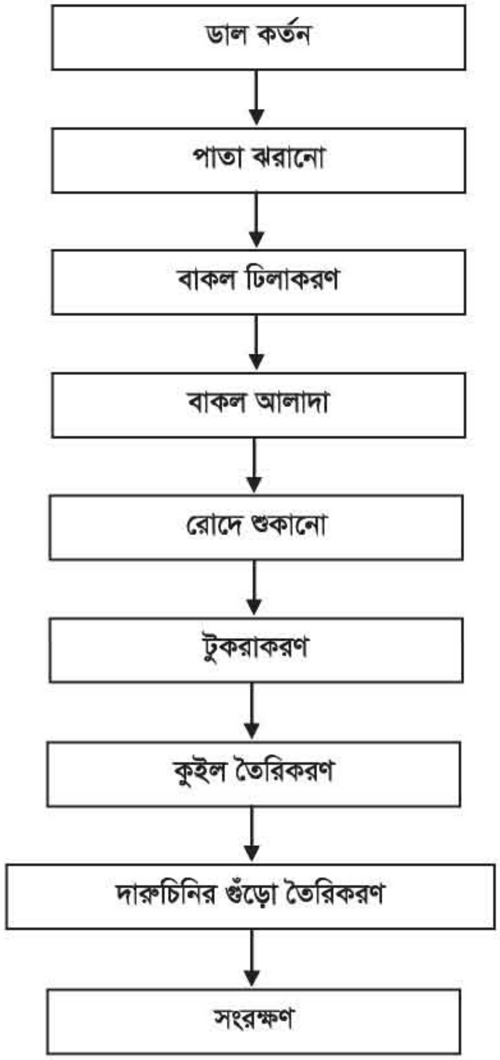

চিত্র : দারুচিনি মিলিং-এর ফ্লোচার্ট

বাজারে সারা বছরই দারুচিনি কিনতে পাওয়া যায় বিধায় দারুচিনি ঘরে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন নেই। তবে ব্যবসায়ীদের অনেক সময় গুদামে দীর্ঘদিন মজুদ বা সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। সংরক্ষণ করতে হলে দারুচিনির ভালো কাঠি রাখতে হবে। গুঁড়ো রাখা যাবে না। গুঁড়োর সাথে অনেক সময় ভেজাল থাকে। এমনকি ভালোমানের দারুচিনির সাথে নিম্নমানের দারুচিনির মিশ্রণ থাকে।

'উঁচুমানের দারুচিনি' হবে পাতলা, মসৃণ ও হালকা বাদামি রঙের, আর 'নিম্নমানের দারুচিনি' হবে গাঢ় বাদামি রঙের পুরু ও খসখসে। সংরক্ষণের সময় এর মিশ্রণযুক্ত দারুচিনি রাখা যাবে না। ঠাণ্ডা জায়গায়

ঘরের শীতল ও শুষ্ক স্থানে বড় কাচের বৈয়াম বা পাত্রে মুখ ভালো করে এঁটে সংরক্ষণ করতে হবে। মুখ ভালো করে না আটকালে দারুচিনির ঘ্রাণ চলে যায়। এভাবে সংরক্ষণ করা হলে কয়েক মাস পর্যন্ত ভালো রাখা যায়। ফ্রিজেও রাখা যায়। রপ্তানির ক্ষেত্রে বাকলগুলো শুকিয়ে চোংগার আকার বা কুইল ধারণ করে। এই অবস্থায় দারুচিনি বস্তাবন্দী করে বাজারজাত করা হয়।

৬.৫ বিভিন্ন প্রকার মশলার ব্যবহার :

মশলা ফসলের মধ্যে কোন কোন মশলার উল্লেখযোগ্য পুষ্টিমান থাকলেও এগুলোকে সাধারণত খাদ্যের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার না করে শুধু খাদ্যের স্বাদ ও রং বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এমতাবস্থায় আমাদের দেশে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান মশলার পুষ্টিমান ও ভেষজ পরিচিতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. **মরিচ :** মরিচ বা লঙ্কা অধিকাংশ ব্যঞ্জনের একটি উপাদান। বাংলাদেশে এটি অন্যতম প্রধান মশলা জাতীয় ফসল। মরিচে কেপসেইসিন (Capsaicin) নামক পদার্থের উপস্থিতির কারণে একে ঝাল করে তোলে। মরিচকে ইংরেজিতে চিলি (Chilli) বা পিপার (Pepper) বলা হয়। ব্যবহারের দিক দিয়ে মরিচ দুই প্রকার। যথা- ঝাল মরিচ ও মিষ্টি মরিচ বা ক্যাপসিকাম (Capsicum)। বাংলাদেশি ঝাল মরিচের মধ্যে ছোট মরিচ, বড় মরিচ, পাটনাই, ধানী মরিচ, ঝাল মরিচ, সাহেব মরিচ, সূর্যমুখী ও গোল মরিচ উল্লেখযোগ্য। মিষ্টি মরিচ সচরাচর আকারে বড়, মোটা ও পুরু মাংসল হয়। আমেরিকায় মিষ্টি মরিচ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ঝাল মরিচের ব্যবহার বেশি হয়। মরিচে প্রচুর ভিটামিন-এ ও সি এবং ক্যালসিয়াম আছে।

২. **পেঁয়াজ :** পেঁয়াজ মশলা হলেও একে সবজি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে পেঁয়াজ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মশলা ফসল। পেঁয়াজে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সি আছে। পেঁয়াজের ভেষজ গুণ রয়েছে। মাথার খুশকি ও চর্মরোগ নিরাময়ে পেঁয়াজের রস ব্যবহার করা যায়। ঠান্ডাজনিত রোগের ঔষধ হিসেবে পেঁয়াজ কাজ করে থাকে। পেঁয়াজ খাবারে স্বাদ ও ঝাঁঝ বাড়ায়। মিষ্টি জাতীয় খাবার ছাড়া প্রায় সব খাবারে পেঁয়াজ ব্যবহার করা হয়।

৩. **রসুন :** পেঁয়াজের সাথে সাথে যে মশলাটির নাম করতে হয় সেটি হলো রসুন। পেঁয়াজের চেয়ে কম ব্যবহৃত হলেও মশলা হিসেবে রসুনের ব্যবহার অপরিহার্য। যে মাছ ও মাংস কিছুটা নষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে রাধুঁনিরা রসুনের ব্যবহার অতি আবশ্যক মনে করে। স্যুপ, আচার, সস, চাটনি ইত্যাদিতে রসুন ব্যবহার হয়। ভেষজ মতে রসুন বলকারক, বাতরোগ, ফুসফুসের রোগ ও হৃদরোগের উপকারী বলে জানা যায়। উচ্চ রক্তচাপে রসুনের ব্যবহার উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। রসুনে রয়েছে এলিলিক সালফাইড যা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এই ফল পেতে হলে রসুন কাঁচা খেতে হয়। রসুন ইনফেকশন প্রতিরোধ করে, কোলেস্টেরল কমায়, প্রোস্টেট ক্যান্সার ও হার্টের অসুখ রোধ করে। রসুনে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি ও সামান্য লৌহ থাকে।

৪. **আদা :** আদা একটি উৎকৃষ্ট অর্থকরী মশলা। উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে আদার গুরুত্ব অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে এর প্রচুর চাহিদা। মাংস রান্নায় এটি অপরিহার্য। ঘ্রাণ ও ঝাঁঝ

আনার জন্য খাবারে আদা ব্যবহার হয়। এছাড়া নানা রকম আচার, চাটনি, কেচাপ, কেক তৈরিতে আদার ব্যবহার হয়। আদা চা একটি উৎকৃষ্ট পানীয়। ভেষজ মতে আদা কফ-নিবারক, হজম শক্তিবর্ধক ও সর্দি কাশিতে ভালো কাজ করে। আদায় ক্যালসিয়াম ও ক্যারোটিন ছাড়াও সামান্য পরিমাণে লৌহ এবং ভিটামিন সি পওয়া যায়।

৫. **হলুদ :** আদার পরই মশলা হিসেবে হলুদের নাম পাশাপাশি বলা হয়। বাংলাদেশের এমন কোনো ব্যঞ্জন নেই, যাতে হলুদ ব্যবহার হয় না। খাবারের রঙ বাড়ানোর জন্য হলুদের ব্যবহার এই উপমহাদেশে বেশি হয়। হলুদ খাবারের রঙকে যেমন বাড়িয়ে তোলে তেমনি বাড়িয়ে তোলে খাবারের স্বাদকে। হলুদের ক্রিম বা হলুদ বাটা সৌন্দর্য চর্চায় ব্যবহৃত হয়। নববধূ ও বরের 'গায়ে হলুদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। ভারতে হলুদ পশম ও রেশম রাঙানোর জন্য ব্যবহার হয়। কথিত আছে মিসরের রানী ক্লিওপেট্রা তার সৌন্দর্য চর্চায় হলুদ ব্যবহার করতেন। আদার মতো হলুদের ও ঔষধি গুণ রয়েছে। হলুদে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, কিছু লৌহ ও ক্যারোটিন রয়েছে।

৬. **ধনিয়া :** ধনিয়া বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত মশলা। এর পাতা ও দানা উভয়েই রান্নায় ব্যবহার হয়। এর ব্যবহার খাবারে সুঘ্রাণ যুক্ত করে। তাই খাবারের বৈচিত্র্য আনার জন্য ধনিয়া ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে নিরামিষ জাতীয় খাবারেই মূলত ধনিয়া ব্যবহার হয়। আর আচারে ধনিয়া সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। উল্লেখযোগ্য মশলা 'পাঁচফোড়ন' এর অন্যতম উপাদান হচ্ছে ধনিয়া। শীতকালে প্রায় সবধরনের রন্ধনে ধনিয়া পাতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য মসলা :

১. **জিরা :** গরম মশলার একটি অন্যতম উপাদান জিরা। জিরা খাবারের রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ বৃদ্ধি করে। জিরা নানা ধরনের খাবারে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে কিছু খাবার আছে যেগুলো জিরা ছাড়া একেবারেই স্বাদহীন। দুই ধরনের জিরা খাদ্যে ব্যবহার হয়। যথা– কিউমিন বা জিরা, যা দেখতে অনেকটা সাদা, দ্বিতীয়টা শা-জিরা বা ক্যারাওয়ে, যা আকৃতিতে জিরা হতে বড়। ভারত ও ইরানে সর্বাধিক পরিমাণে জিরা উৎপন্ন হয়।

২. **গোল মরিচ :** গোল মরিচও গরম মশলার একটি প্রধান উপকরণ। গোল মরিচ গাছ পান গাছের মতো লতানে উদ্ভিদ। খাদ্য রান্নায়, মাংস ও অন্যান্য খাদ্যের প্রিজারভেটিভ হিসাবে এটি ব্যবহার হয়। এছাড়া ক্যানিং, আচার, বেকারি ও পানীয় শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। গোলমরিচের ঝাঁঝ ও ঘ্রাণ খাদ্যকে আর্কষণীয় করে তোলে। অতি প্রাচীন কাল হতে এটি হাড় ভাঙা, মচকানো, ম্যালেরিয়া কম্পন ইত্যাদি রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগাম ও সিলেট অঞ্চলে সীমিত আকারে গোল মরিচের চাষ হচ্ছে।

৩. **দারুচিনি :** এটিও গরম মশলার অন্যতম একটি মশলা। খাবারের ঘ্রাণ বৃদ্ধি করার জন্য এটি ব্যবহার হয়। দারুচিনি গাছের ছাল বা বাকল শুকিয়ে তৈরি হয় বিধায় এটি ব্যতিক্রম মশলা। অনেকে মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য খেয়ে থাকেন। দারুচিনির ব্যবহার সর্বপ্রথম শ্রীলংকায় তারপর তা মিশর ও চীন হয়ে ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দারুচিনির তেল (সিন্নানিক তেল) খাদ্য, ওষুধ ও প্রসাধনী শিল্পে ব্যবহার হয়। গাছটি বাগানের শোভাবর্ধক। দারুচিনি পোলাও, বিরিয়ানি, মাংস ভুনা, জর্দাসহ বিভিন্ন খাদ্যে ব্যবহার করা হয়।

৪. **এলাচ :** গরম মশলার মধ্যে এলাচ দানা অন্যতম। এলাচ খাবারে সুঘ্রাণ এবং স্বাদ আনার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এলাচ মিষ্টি বা ঝাল, মুখরোচক অধিকাংশ খাবার তৈরিতে ব্যবহার হয়। এলাচ দানাদার মসলা, এর উৎপাদন বেশি হয় ভারতে তারপর মালয়েশিয়া হয়ে সারা বিশ্বে এটি ছড়িয়ে পড়চে। এলাচ দুই ধরনের বড় এলাচ ও ছোট এলাচ ও সুগন্ধি বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়।

৫. **তেজপাতা :** মশলার মধ্যে পাতাজাতীয় মসলা হচ্ছে তেজপাতা। এই পাতা শুকনা অবস্থায় খাবারে ঘ্রাণের জন্য ব্যবহার হয়। টক ঝাল মিষ্টি সব খাবারেই তেজপাতা ব্যবহার হয়। তেজপাতা হতে উৎপন্ন সুগন্ধি তেল যা প্রসাধনী ও ওষুধে ব্যবহার হয়। খাবার মশলা হিসেবে তেজপাতার ব্যবহার গ্রীসে শুরু হয়। তারপর রোম হয়ে ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

অনুশীলনী-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) ভারতীয় উপমহাদেশকে একসময় কী বলা হতো?

২) কোন কোন দেশে মশলা বা সুগন্ধি গাছ পাওয়া যেত?

৩) বাংলাদেশে কতগুলো সুগন্ধি গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে?

৪) বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মশলাগুলো কী কী?

৫) বাংলাদেশের কোন মশলার উৎপাদন সবচেয়ে বেশি এবং তা কত?

৬) আমাদের দেশে কোন কোন মশলাগুলো সারাবছর চাষ হয়?

৭) মশলা কত প্রকার ও কী কী?

৮) স্পাইস-এর কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৯) কন্ডিমেন্ট-এর কয়েকটি উদাহরণ দাও।

১০) কিউলিনারি হার্ব কী কাজে লাগে?

১১) ফ্লাভিনয়েডস কাকে বলে?

১২) ধনিয়া পাতা ও পুদিনা পাতায় কী পরিমাণে ভিটামিন আছে?

১৩) কাঁচা মরিচ কীভাবে ৪০ দিন সংরক্ষণ করা যাবে?

১৪) পাকা মরিচ কীভাবে রোদে দিতে হয়?

১৫) ১০০ কেজি পাকা মরিচ হতে কত কেজি শুকনা মরিচ পাওয়া যাবে?

১৬) কী করলে হলুদের রং উজ্জ্বল হয়?

১৭) আদাকে কয়ভাবে সংরক্ষণ করা যায়? তা কী কী?

১৮) কালো আদা ও সাদা আদা বলতে কী বুঝায়?

১৯) ১০০ কেজি গোলমরিচ থেকে কতটুকু কালো ও সাদা গোলমরিচ পাওয়া যায়?

২০) 'কুইল' কাকে বলে?

২১) ধনিয়ার আর্দ্রতা কত হলে সংরক্ষণের উপযোগী হবে?

২২) মিলিং এর পূর্বে হলুদের সাথে কী রং মিশানো হয়?

২৩) প্রক্রিয়াজাত করে রসুন কী কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

২৪) হলুদের এনজাইমেটিক কার্যকারিতা দূর করার জন্য কী করতে হবে?

২৫) হলুদের পেস্টে প্রিজারভেটিভ হিসাবে কী ব্যবহার করা হয়?

২৬) দুই স্তর বিশিষ্ট পলিব্যাগে মরিচ শুকালে কী লাভ হয়?

২৭) প্রক্রিয়াজাতকৃত আদা কত দিন ভালো থাকে?

২৮) চিউইং জিনজার কী?

২৯) কালো জিনজারকে প্রক্রিয়াজাত করে কী কী পাওয়া যায়?

৩০) কোকাকোলা তৈরিতে গোলমরিচ কী কাজে লাগে?

৩১) গোলমরিচকে SO_2 গ্যাস দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে কী করা হয়?

৩২) লাল গোলমরিচ কাকে বলে?

৩৩) উঁচু মানের ও নিম্ন মানের দারুচিনি কীভাবে বুঝা যাবে?

৩৪) দারুচিনি কোন অবস্থায় বাজারজাত করা হয়?

৩৫) বাংলাদেশে কয়েকটি ঝাল মরিচের জাতের নাম লিখ।

৩৬) কোন খাবারে পেঁয়াজ ব্যবহার করা যায় না?

৩৭) রসুন কী কী রোগ নিরাময় করে?

৩৮) ঝাল রান্না ছাড়া আদা আর কী কী কাজে ব্যবহার হয়?

৩৯) কোন রানী তার সৌন্দর্য চর্চায় হলুদ ব্যবহার করতেন?

৪০) জিরা কত প্রকার ও কী কী?

৪১) বাংলাদেশের কোথায় কোথায় গোলমরিচ চাষ হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) আমাদের দেশে মশলার গুরুত্ব কতটুকু রয়েছে?

২) কোন কোন মশলা বেশি উৎপাদন হয় এবং কোনগুলো বিদেশ থেকে আমদানি হয়?

৩) কেন রবি মৌসুমে মশলা ভালো হয়? প্রধান ৬টি মশলার নাম ও চাষ মৌসুম উল্লেখ কর।

৪) প্রধান ৬টি মশলার একটি করে জাত ও বৈশিষ্ট্য লেখ।

৫) মশলা কতপ্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬) মরিচ ও হলুদ শুকানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭) গোল মরিচ ও দারুচিনির শুকানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৮) পেস্ট তৈরি করে কীভাবে হলুদ সংরক্ষণ করা হয়?

৯) আদা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি ছক আকারে লিখ।

১০) গোলমরিচ মিলিং করে কী কী নতুন উপাদান পাওয়া যায়?

১১) দারুচিনি মিলিং-এর ফ্লোচার্ট লেখ।

১২) পেঁয়াজ ও মরিচের ব্যবহার লেখ।

১৩) রসুন ও আদার ব্যবহার লেখ।

১৪) হলুদ ও ধনিয়ার ঔষধি গুণ লিখ।

১৫) গোলমরিচ ও দারুচিনির ব্যবহার লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১) প্রধান প্রধান মশলার উৎপাদন, চাষ মৌসুম ও জাত সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

২) মশলার শ্রেণিবিভাগ ও পুষ্টিমান সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৩) মরিচ, হলুদ, আদা, গোলমরিচ ও দারুচিনির শুষ্ককরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪) হলুদ, মরিচ ও আদার মিলিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৫) গোলমরিচ, দারুচিনি ও ধনিয়ার মিলিং প্রক্রিয়া লেখ।

৬) জিরা, গোলমরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা ও অন্যান্য মশলার মিলিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অধ্যায় ৭

মাশরুমের পরিচিতি, জাত পুষ্টি, ভেষজমূল্য ও সংরক্ষণ

পরিচিতি ও জাত : মাশরুম একটি পুষ্টিকর সবজি। কিন্তু সাধারণ সবজির মতো মাশরুম মাটিতে জন্মায় না। সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য যে রকম সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় মাশরুমের জন্য তার কোনো প্রয়োজন হয় না। কারণ মাশরুম নিম্নশ্রেণির ছত্রাক জাতীয় পরজীবী উদ্ভিদ। জীবন ধারণের জন্য এরা জৈবিক বস্তু (organic matter) থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ কারে। ফলে বিভিন্ন কৃষিজ বর্জ্য অর্থাৎ খড়, কম্পোস্ট, কাঠের গুঁড়া, কাঠ ইত্যাদি নানা জিনিষের ওপর মাশরুম জন্মানো য়ায়। মাশরুম চাষের জন্য কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না। সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না বিধায় ঘরের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রস্তুত মাধ্যমে আর্দ্রতাপূর্ন ও সহনশীল তাপমাত্রায় কৃত্রিমভাবে বেশ কিছু জাতের মাশরুম চাষ করা সম্ভব। প্রকৃতিতে অসংখ্য মাশরুম রয়েছে তন্মধ্যে প্রায় ২০০০ মাশরুম ভক্ষণযোগ্য এবং ২০টি চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

সভ্যতার কেন্দ্র গ্রীস, রোম, এবং চীনে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিবর্ধক ও দীর্ঘ জীবনের জন্য মাশরুমকে প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবে বিবেচনা করা হতো । আর্যরা ভারতে আসার পর ভারতে মাশরুমের প্রচলন শুরু হয়। সে সময় প্রধানত পূজা অর্চনা এবং সোমরস নামক এক ধরনের উত্তেজক পানীয় প্রস্তুতে মাশরুম ব্যবহৃত হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু দেশে মাশরুম অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার হলেও বাংলাদেশে এর প্রচলন তেমন হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে মাশরুম একটি জনপ্রিয় খাবার । পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার বনভূমিতে বিভিন্ন ধরনের মাশরুম প্রাকৃতিকভাবে জন্মায় এবং পাহাড়ি মানুষেরা তা সংগ্রহ করে খায়। গ্রীষ্মের শুরুতে যেখানে পুরানো খড় মাটিতে মিশে রয়েছে কিংবা বনভূমিতে যেখানে মাটিতে প্রচুর পাতা বা কাঠ পড়ে থাকে সে সমস্ত স্থানে খড়ের উপর বা কাঠের গুড়িতে মাশরুম গজায় সাধারনত উই-এর ঢিবির কাছেই মাশরুম জন্মাতে দেখা য়ায়। এই জন্য গ্রীষ্মের শুরুতে পাহাড়িরা উই ঢিবির আশে পাশে মাশরুমের খোজ করে। এক জায়গায় প্রতিবছরই মাশরুম দেখা যায়, কারণ যে জায়গায় মাশরুমের মাইসেলিয়াম থাকে সেখান থেকে পরবর্তী বছর সহায়ক পরিবেশে মাশরুম জন্মায়। বর্তমানে বনভূমি সংকুচিত হওয়ার এবং জুম চাষেরে কারণে প্রাকৃতিকভাবে মাশরুমের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তাছাড়া জনসংখ্যার চাপে মাশরুম ওঠার সাথেই সাথেই তা সংগ্রহ করায় পরিপক্ব মাশরুমের স্পোর বা বীজ ছড়িয়ে যেতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা মাশরুমকে 'ওল' বলে। এটি তাদের কাছে অত্যন্ত দামী সবজি। বাড়িতে নতুন জামাই বা বড় অতিথি এলে মাশরুম থেকে প্রস্তুত খাবার দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাজারে ভালো সাইজের তাজা মাশরুম ৪০০-৬০০ টাকা কেজি মূল্যে বিক্রয় হয়।

মাশরুম ও ব্যাঙের ছাতা : মাশরুম হলো এক ধরনের ভক্ষণযোগ্য মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ। ছত্রাকবিদগণ পৃথিবীতে প্রায় তিন লক্ষ প্রজাতির ছাত্রাক চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এই অসংখ্য ছত্রাকের মধ্য থেকে দীর্ঘদিন যাচাই ও বাছাই করে যে সমস্ত ছত্রাক সম্পূর্ণ খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সেগুলোকেই তারা মাশরুম বলে শনাক্ত করেছেন । মাশরুমের মতো দেখতে বনে জঙ্গলে অনেক ধরনের ছাতা আকৃতির ছত্রাক জন্ম নেয় সেগুলো খাওয়ার অনুপযোগী এবং বিষাক্ত। কিন্তু চাষ করা মাশরুম কখনই বিষাক্ত হয় না।

মাশরুমের গঠন : ছাতার মতো মাশরুমের যে অংশটি আমরা দেখতে পাই একে ছত্রাকের ফ্রুটিং বডি বলে। মাশরুমের ফ্রুটিং বডি বা ফুল কিংবা ভক্ষণযোগ্য অংশকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১) টুপি বা পিলিয়াস (Pilius)

২) জিল (Gill) বা ল্যামেলি (Lamellac)

৩) আবরন বা ভেইল এনুলাস (Veil Annulus) ও

৪) দণ্ড বা স্টাইপ (Stipe)

টুপি বা পিলিয়াস : এটি অনেকটা ছাতার আকৃতি বিশিষ্ট। এটি সাধারণত মাংশাল এবং পুরু হয়। জাত ভেদে টুপি বিভিন্ন আকৃতি, মাপও বর্ণের হয়। এটি মাশরুমের প্রধান খাওয়ার অংশ ।

জিল : মাশরুমের টুপির নিচের অংশকে জিলে বলে। জিল এক ধরনের অসংখ্য সমান্তরাল সুতা দিয়ে তৈরি এবং এর মধ্যে বংশবিস্তারের অতি প্রয়োজনীয় স্পোর বা বীজ থাকে।

আবরণ : মাশরুমের নতুন ফ্রুটিং বডির জিল এক ধরনের কোষ কলা দ্বারা আবৃত থাকে। এই কোষ কলাকে আবরণ বা ভেইল বলে। ধীরে ধীরে ফ্রুটিং বডি বড় হতে থাকলে এটা ছিঁড়ে যায় এবং দণ্ডের চারদিকে আংটির মতো আকার তৈরি হয়।

চিত্র : মাশরুমের ফ্রুটিং বডি

চিত্র : মাশরুমের ফ্রুটিং বডি

দণ্ড বা স্টাইপ : টুপিকে ধরে রাখার জন্য দণ্ড কাজ করে। দণ্ডটি টুপির মাঝে থাকে। দণ্ডটির ভেতরের অংশ ভরাট কিংবা ফাঁপা থাকতে পারে। বিভিন্ন মাশরুমের দণ্ড বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো মাশরুম চিনতে সাহায্য করে। মাশরুমের দণ্ড থেকে টুপি পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশই খাওয়া যায়।

মাশরুমের বিভিন্ন জাত :

প্রকৃতিতে মাশরুমের বহু জাত রয়েছে তন্মধ্যে বাংলাদেশে ৮-১০ জাতের মাশরুম বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়। তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাশরুম চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বাতাসের শতকরা আর্দ্রতা ৬০ ভাগের নিচে নামে না এবং তাপমাত্রার পরিসীমা হচ্ছে ১০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস । আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও কাঁচামালের প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাশরুমের জাতগুলো আমাদের দেশে চাষ করার উপযোগী।

ক্রমিক নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১	ঝিনুক মাশরুম	ওয়েস্টার মাশরুম	Pleurotues Ostreatus
২	দুধ মাশরুম	মিল্কি মাশরুম	Calocybe indica
৩	কান মাশরুম	উড এয়ার মাশরুম	Auricalaria polytricha
৪	বাটন মাশরুম	বাটন মাশরুম	Agaricus bisporus
৫	শিতাকে মাশরুম	শিতাকে মাশরুম	Lantinula edodes
৬	খড় মাশরুম	স্ট্র মাশরুম	Volvariella volvacea
৭	ঋষি মাশরুম	রেইশি মাশরুম	Ganoderma Lucidium
৮	মানকিহেড মাশরুম	Monkey head Mashroom	Volvarella volvaeca

নিম্নে প্রধান প্রধান মাশরুমের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো-

১। ঝিনুক বা ওয়েস্টার মাশরুম : এই মাশরুমটি সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন। এই মাশরুমকে বিশ্বে বিভিন্ন নামে চেনে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- ফ্রুটিং বডির বর্ণ সাদা, তুলনামূলকভাবে একটু হালকা ও দেখতে ঝিনুকের মতো। আমাদের দেশে সব পরিবেশে, সব জায়গাতে সারা বছর চাষ করা যায়। ফলন অত্যন্ত ভালো। এই মাশরুমটি কাঠের গুঁড়া, ধানের খড়, গমের খড়, আখের ছোবড়া, কাগজ, চায়ের পাতি, সুপারির ছালসহ আরও বহুবিধ Substrate-এর উপর মাশরুম চাষ করা যায়। বিশ্বের বাজারে এর পুষ্টিগুণ, ঔষধিগুণ ও স্বাদের জন্য চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ মাশরুম এর প্রজাতির নাম- Pleurotus Ostreatus.

চিত্র ঃ ওয়েষ্টার বা ঝিনুক মাশরুম

২। মিল্কি বা দুধ মাশরুম : মিল্কি মাশরুম বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় মাশরুম। এর পুষ্টিগুণ ও ঔষধিগুণ অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় মাশরুম। এর শেলফ লাইফ বেশি বিধায় বিদেশের রপ্তানির জন্য সবচেয়ে উপযোগী। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স এ সব দেশে এ মাশরুমের প্রচুর চাহিদা আছে।

বৈশিষ্ট্যঃ

১. এটি উচ্চ তাপমাত্রায় চাষ করা যায়।

২. গ্রীষ্মকালীন মাশরুম।

৩. ধানের খড়, গমের ভুসি, কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করে চাষ করা যায়।

৪. সুস্বাদু এবং অল্প খরচে চাষ করা যায়।

৫. ফ্রুটিং বডি দুধের মতো সাদা এবং আকৃতিতে অনেক বড় হয়।

৬. স্টাইপ অনেক মোটা।

৭. শেলফ লাইফ বেশি বিধায় অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

৮. আমাদের দেশে মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৮ মাস চাষ করা যায়।

৯. অনুকূল পরিবেশ : তাপমাত্রা : ২৫-৩০ সেঃ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা : ৭০-৮০%

চিত্র : মিল্কি বা দুধ মাশরুম

৩। **বাটন মাশরুম :** Agaricus Bisporus নামের মাশরুমটি বিশ্বে বাটন মাশরুম হিসেবে সর্বাধিক পরিচিতি এবং বিশ্বের মোট মাশরুম উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ মাশরুমই হচ্ছে বাটন মাশরুম। মূলত : শীতপ্রধান দেশে এর চাষাবাদ ভালো হয় বিধায় যুক্তরাষ্ট, নেদারল্যান্ড, পোলান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাজ্য, চীন ও ভারতে (উত্তরাংশে) এ মাশরুম বেশি উৎপন্ন হয়। এ মাশরুম উৎপাদনের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা ও উচ্চ আর্দ্রতার প্রয়োজন হয় বিধায় আমাদের দেশে শীতকালে প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে চাষ করা যায়। তবে উচ্চ ফলনশীল গুনাগুন বজায় রেখে সারা বছর চাষ করতে হলে নিয়ন্ত্রিত পরিশে (Controll Condition)-এ চাষ করতে হবে।

বৈশিষ্ট্য :

১. এটি ফ্রুটিং বডি বোতাম আকৃতির, মাংসল প্রকৃতির ও সুস্বাদু।

২. বর্ণ ক্রিম থেকে ধূসর।

৩. চাষ পদ্ধতি ব্যয়বহুল ।

৪. বাজার মূল্য বেশি।

৫. শীতকালীন মাশরুম।

চিত্র : বাটন মাশরুম

২০২২

৪। শীতাকে মাশরুম : শীতাকে মাশরুম (Shiitake) বিশ্বের অন্যতম দামি ও চাহিদাসম্পন্ন একটি সবজি মাশরুশ। পুষ্টি ও ঔষধিগুণে ভরা সুস্বাদু এই মাশরুমের উৎপাদন বিশ্বে দিন দিন বেড়েই চলছে। অন্যান্য মাশরুমের চেয়ে স্বাদ ও গন্ধে ভিন্নতা থাকায় বাংলাদেশেও এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এ মাশরুম চীন, জাপানসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে কাঠের গুঁড়িতে (Wood Log) চাষ করা হয়। এতে সময় ও খরচ অনেক বেশি লাগে। কিন্তু আমাদের দেশে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত সহজ প্রযুক্তিতে চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাবস্ট্রেট হিসেবে কাঠের গুঁড়া (Sawdust) ব্যবহৃত হওয়ায় সময় ও খরচ অনেক কম লাগে। সম্ভাবনাময় এই মাশরুম এ দেশে বাণিজ্যিক আকারে চাষ করা এখন সময়ের দাবি।

চিত্র : শীতাকে মাশরুম

৫। খড় বা স্ট্র মাশরুম : চীনে সর্বপ্রথম স্ট্র মাশরুমের চাষ শুরু হয়। এ কারণে স্ট্র মাশরুম সাধারণত চাইনিজ মাশরুম নামে পরিচিত। স্বাদ ও পুষ্টিগুণের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার এই মাশরুম বেশ জনপ্রিয়।Chang and Miles (১৯৯৩) এর মতে বিশ্বে চাষকৃত মাশরুমের মধ্যে এর অবস্থান তৃতীয়। স্ট্র মূলত গ্রীষ্মকালীন মাশরুম। আমাদের দেশের আবহাওয়া স্ট্র মাশরুম চাষের জন্য উপযোগী। ১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশে স্ট্র মাশরুম চাষ শুরু হয়। মূলত বাংলাদেশে মাশরুম চাষের সূচনা হয় স্ট্র মাশরুমের চাষ দিয়ে। বৈজ্ঞানিক নাম : Volverilla volvacea.

চিত্র : খড় বা স্ট্র মাশরুম

স্ট্র মাশরুমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

১. এ মাশরুম দেখতে ধূসর বর্ণের।

২. জীবনচক্র খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়।

৩. অন্যান্য মাশরুমের তুলনায় সুস্বাদু, পুষ্টি উপাদান বেশি ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন।

৪. উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ স্বল্প খরচে চায় করা য়ায়।

৫. দামি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না

৬. স্ট্র মাশরুম চাষের পর সেই উপকরণ ব্যবহার করে পুনরায় ওয়েস্টার ও মিল্কি মাশরুম করা যায়।

৭. অতিরিক্ত গরমে অন্যান্য মাশরুমের যখন উৎপাদন কমে যায় সে সময় স্ট্র ভালো ফলন দেয়। এ কারণে ওয়েস্টার মাশরুমের তুলনায় স্ট্র মাশরুমের জনপ্রিয়তা ও বাজার মূল্য বেশি।

৮. বাংলাদেশে সফলভাবে চাষকৃত মাশরুম হচ্ছে স্ট্র মাশরুম।

ঋষি কাশরুম (Rishi Mushroom) ঃ ঋষি মাশরুম বিশ্বে ওষুধি মাশরুম নামে পরিচিত। বিশেষ করে চীন জাপানও মালয়েশিয়াতে হার্বাল মেডিসিন হিসেবে এই মাশুরুমের ব্যপক চাহিদা রয়েছে। ঋষি মাশরুম দিয়ে ক্যান্সার টিউমার, হৃদরোগের মতো জটিল ও কঠিন রোগের ওষুধ তৈরি করা হয়। তাছাড়া কসমেটিকস শিল্পে পেস্ট, সাবান, লোশন, শ্যাম্পু, মাসেজ অয়েল, এমনকি চা, কফি, চকলেট তৈরিতেও এর ব্যবহার বিশ্বে প্রচুর। আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া এই মাশরুম চাষের উপযোগী। এর সংরক্ষণ ক্ষমতাও বাজার মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় এই মাশরুম এদেশে বাণিজ্যিক আকারে চাষ করা লাভজনক। পরিপক্ব এই মাশরুমের ফ্রুটিং বডি কিডনির মতো। এর উপরের স্তর গাঢ় লাল, চকচকে উজ্জ্বল এবং নিচের অংশ হাল্কা বাদামি ও অসংখ্য লালচে স্পোর ধারণ করে।

চিত্র : ঋষি মাশরুম

কান মাশরুম : এ মাশরুম দেখতে অনেকটা মানুষের কানের মতো তাই এর নাম কান মাশরুম। এটি জেলি মাশরুম হিসেবেও পরিচিত। কাঠের গুছি, কাঠের গুছা ও খড়ের মিশ্রণ ও তুলার বর্জ্যের উপর কান মাশরুম বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়। গ্রামের ক্ষুদ্র চাষিরা ওয়েস্টার মাশরুমের মতোই খড়ের উপর ব্যাগ পদ্ধতিতে এই মাশরুম চাষ করতে পারবে। ভালো ফলনের জন্য তাপমাত্রা ২২-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আর্দ্রতা ৯০-৯৫% থাকতে হয়। এই মাশরুম সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি এবং পরিপক্ব হওয়ার পর অন্তত ২ সপ্তাহে এটি নষ্ট হয় না।

চিত্র : কান মাশরুম

৭.২ মাশরুমের পুষ্টিমাপ :

পুষ্টি বিচারে মাশরুম নিংসন্দেহে সবার সেরা। কারন আমাদের প্রতিনিয়ত খাদ্য তালিকায় যেসব উপাদান অতি প্রয়োজনীয় যেমন -প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল, সেগুলো মাশরুমে উঁচু মাত্রায় আছে। অন্য দিকে যেসব খাদ্য উপাদানের আধিক্য আমাদের মরণ ব্যাধির নিকট নিয়ে যায় যেমন– ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট তা মাশরুমে নেই বললেই চলে।

সারণি : বিভিন্ন মাশরুমের পুষ্টিমূল্য (প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুম)

মাশরুম	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	লৌহ (মি.গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম)	জিংক (মি.গ্রাম)
ওয়েস্টার	২৫.০০	২.৫৬	১২.৭০	২৭.০০	২৯.৮০	২৫.৩০	১৯.৮০
কান	৭.২০	১.৭০	৮৮.৬০	-	১৬.৩০	৬.০৭	১.০০
মিল্কি	২১.৪০	১৩.০০	৪৮.৫০	১২.৯০	৫৬.২৫	২০.৬৫	১২.৮৬
স্ট্র	২০.০০	১০.৮২	১১.৬০	১৫.২০	৪৮.২০	২৩.০০	২৬.২০
ঋষি	২৬.৪	২.৭০	১২.৮০	৫১.৫০	৫৩.৫০	২৭.৫০	১৪.৭০
বাটন	৩৭.৬০	১০.০০	২৩.৬০	২১.২০	১৮.৫০	৪৪.০০	২৪.৬০
শীতাকে	২৭.০০	৭.২০	২১.০০	৩৮.৩০	১৮.০০	২২.০০	২৩.৪০

উৎসঃ জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

মাশরুমের প্রোটিন মূল্য : মাশরুমের প্রোটিন অতি উন্নত, সম্পূর্ণ ও নির্দোষ। একটি সম্পূর্ণ প্লোটিনের পূর্বশর্ত হলো মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় ৯টি অ্যামাইনো এসিডের উপস্থিতি মাশরমে এসব এসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। অন্যান্য প্রাণীজ আমিষ যেমন– মাছ, মাংস, ডিমের আমিষ উন্নতমানের হলেও এর সাথে কেলেস্টরল সমস্যা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে মাশরুমের আমিষ নির্দোষ এবং কোলেস্টরল ভাঙার উপাদান থাকায় কোলেস্টরল জমার ভয় থাকে না। এ কারণে মাশরুমের প্লোটিন মূল্য অধিক।

মাশরুমের ফ্যাট মূল্য : মাশরুমের ফ্যাট অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (Unsaturated) দ্বারা তৈরি যা শরীরের জন্য উপকারী। এর আরগোস্টরল মানুষের ব্রেণ ডেভেলপমেন্ট, ভিটামিন-ডি সিনথেলিন এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কার্যকারিতা বাড়ায়। এছাড়া মাশরুমের ফ্যাটে ৭০-৮০% লিনোলেনিক এসিড আছে যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী (HDL)

সারণি : প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী খাবারের সাথে মাশরুমের প্রোটিনের পরিমাণ

ক্রমিক নং	খাবারের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	ফ্যাট	খনিজ লবণ
১	দুধ	২৮ গ্রাম	৩২ গ্রাম	৪ গ্রাম
২	ডিম	৪২ গ্রাম	৪১ গ্রাম	৩ গ্রাম
৩	মাংস	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩ গ্রাম
৪	মাছ	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম	৪ গ্রাম
৫	ডাল	৩৫ গ্রাম	১৮ গ্রাম	১০ গ্রাম
৬	মাশরুম	৩৫ গ্রাম	৪ গ্রাম	১০ গ্রাম

সারণি ঃ মাশরুমের ৯টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণ (গ্রাম/১০০ গ্রাম)

ক্রমিক নং	অ্যামাইনো এসিডের নাম	বাটন মাশরুম	শিতাকে মাশরুম	ঝিনুক মাশরুম			স্ট্র
				পি. ফ্লোরিডা	পি. অস্ট্রিয়াটাস	পি. সাজর কাজু	
১	লিউসিন	৭.৫	৭.৯	৭.৫	৬.৮	৭.০	৪.৫
২	আইসোলিউসিন	৪.৫	৪.৯	৫.২	৪.২	৪.৪	৩.৪
৩	ভ্যালিন	২.৫	৩.৭	৬.৯	৫.১	৫.৩	৫.৪
৪	ট্রিপ্টোফেন	২.০	-	১.১	১.৩	১..২	১.৫
৫	লাইসিন	৯.১	৩.৯	৯.৯	৪.৫	৫.৭	৭.১
৬	থ্রিয়োনাইন	৫.৫	৫.৯	৬.১	৪.৬	৫.০	৩.৫
৭	ফিনাইল এলানিন	৪.২	৫.৯	৩.৫	৩.৭	৫.০	২.৬
৮	মেথিওনাইন	০.৯	১.৯	৩.০	১.৫	১.৮	১.১
৯	হিস্টিডিন	২.৭	১.৯	২.৮	১.৭	২.২	৩.৮
	মোট	৩৮.৯	৩৬	৪৬	৩৩.৪	৩৭.৬	৩২.৯

মাশরুমের কার্বোহাইড্রেট মূল্য : মাশরুমের শর্করার পরিমাণ কম এবং তা পানিতে দ্রবণীয় ফলে এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী এতে অনেক পলিস্যাকারাইড থাকায় দেহের বিভিন্ন জালা পোড়া নিরাময় করে। মাশরুমে আঁশের পরিমাণ ও বেশি ১০-২৮% ফলে ডায়াবেটিক রোগীদের ইনসুলিনের চাহিদা কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া মাশরুমে উপকারী বিটা গ্লুকোনস রয়েছে যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উজ্জীবিত করে।

ভিটামিন ও মিনারেলস : ভিটামিন ও মিনারেলসের উৎস হিসেবে মাশরুমের অবস্থান খুবই উপরে। মাশরুমে থায়ামিন (বি১) রিবোফ্লাভিন (বি২) এবং ভিটামিন বি১২ পাওয়া যায়। মাশরুমের পটাশিয়াম দেহের জলীয় অংশের স্থিতাবস্থা এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করো। মাশরুমের সেলিনিয়াম দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তারের জন্য আবশ্যক।

৭.৩ মাশরুমের ভেষজ মূল্য :

গবেষণায় জানা যায় যে মাশরুম বা মাশরুম আহরিত নির্যাস (extract) দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নয়ন করা ছাড়াও হৃদরোগ ও ক্যান্সার রোগের ঝুকি কমায়। সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, সেলিনিয়ামসহ মাশরুমের নানাবিধ উপাদন স্তন ক্যান্সার ও টিউমারবিরোধী ভূমিকা পালন করে। মাশরুমে বিভিন্ন ওষধি উপাদান যেমন– টারপিনয়েডস, স্টিরয়েডস, ফেনলস, নিউক্লিওটাইডস, গ্লাইকোপ্রোটিনস এবং বিভিন্ন ধরনের পলিস্যাকারাইড ইতাদি এ কাজগুলো করে ।

১। **টিউমার প্রতিরোধী মাশরুম :** পলিস্যাকারাইড নানা ধরনের প্রোটিন এবং অন্যান্য উপাদান সমৃদ্ধ থাকায় মাশরুম টিউমারের বিরুদ্ধে এবং লিউকোমিয়া বা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

২। **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মাশরুম :** মাশরুমে অবস্থিত বিভিন্ন উপাদান দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। মাশরুমের গ্লুকেন ও প্রোটিন ও গ্লাইকেন এ কাজে সহায়তা করে।

৩। **এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে মাশরুম :** মাশরুমে নানা ধরনের এন্টি-অক্সিডেন্ট উপাদানে সমৃদ্ধ যা থেকে বিভিন্ন রোগবালাই যেমন- ডায়াবেটিস, সিরোসিস ও কান্সারসহ বার্ধক্যজনিত নানা ধরনের জটিলতা থেকে সুরক্ষা করে।

৪। **ইনফ্লামেশন বিরোধী কাজ :** ভিন্ন ভিন্ন মাশরুম ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ইনফ্লামেশন বিরোধী কাজ করে। কিছু কিছু ঝিনুক মাশরুম ইডিমা রোগ নিরাময় সহ ইনফ্লামেশন দূর করে ।

৫। **রক্তের কোলেস্টেরল দমন করে :** মাশরুমের আঁশ ও আরগেস্টরল রক্তের কোলেস্টেরল কমায়। কিছু কিছু মাশরুম রক্তের LDL কমায় এবং উপকারী HDL বৃদ্ধি করে।

৬। **লিভার সুরক্ষা করে :** ঋষি ও ওয়েস্টার মাশরুম লিভার সুরক্ষায় যথেষ্ট কার্যকর। লিভার সুরক্ষার আরেকটি উপায় হল রক্ত ও লিভারে অবস্থিত কোলেস্টরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়া।

৭। **মাশরুম জীবাণু বিরোধী কাজকরে :** গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মাশরুমের জীবাণু ও ছত্রাক বিরোধী ভূমিকা আছে। দেখা গেছে ওয়েস্টার মাশরুমের নির্যাস গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নিগেটিভ জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর।

৮। **রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে :** মাশরুম রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের বিরদ্ধে কাজ করে। এ কাজে ওয়েস্টার মাশরুমের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

৯। **ভাইরাসবিরোধী ভূমিকা :** কিছু কিছু মাশরুম নানা জাতের ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর । শিতাকে মাশরুম ও ওয়েস্টর মাশরুম HIV–এর বিরুদ্ধে কার্যকর।

৭.৪ মাশরুমের সংরক্ষণ

মাশরুম সংরক্ষণ : প্যাকেটকৃত তাজা মাশরুম গরমের দিনে ১ থেকে ২ দিন এবং শীতের দিনে ২ থেকে ৩ দিন সাধরণভাবে রেখে খাওয়া যায়। রেফ্রিজারেটরের মধ্যে নরমাল চেম্বারে (১০ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায়) সিলিং অবস্থায় ৭/৮ দিন রেখে খাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে প্যাকেটটি রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে একবারেই পুরো প্যাকেটের মাশরুম খেয়ে ফেলতে হবে। তাই প্যাকেট করার সময় পারিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট ছোট প্যাকেট করা উচিত। মাশরুম রোদে অথবা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে শুকিয়ে এয়ার টাইট প্যাকেটে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

মাশরুম সংগ্রহের সময় : যথাসময়ে মাশরুম সংগ্রহ করতে পারলে মাশরুমের সংরক্ষণকাল বেড়ে যায় এবং চাষি লাভবান হয় ।

ক) **ওয়েস্টার :** মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু মাশরুম পিলিয়াসের শিরাগুলো ঢিলা হয়নি অথবা কিনারা পাতলা হয়ে ফেটে যায়নি এমতাবস্থায় মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

খ) **মিল্কি হোয়াইট :** এ মাশরুমের সংরক্ষণকাল সবচেয়ে বেশি। সাধারণ রুম তাপমাত্রায় একে ৪-৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়। এই মাশরুম সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হলো মাশরুমের আকার প্রায় ৪-৫ ইঞ্চি হলে এবং মাশরুম যথেষ্ট রসালো থাকবে। এ সময় সংগ্রহ করলে প্যাকেটে মাশরুমের পরিমাণ বেশি পাওয়া যাবে এবং মাশরুমের বাজারমূল্য বেড়ে যাবে ।

২০২২ গ) **স্ট্র মাশরুম :** সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এর সংরক্ষণকাল ২৪ ঘণ্টারও কম। মাশরুমের ক্যাপ ফোটে যায়নি অর্থাৎ বাটন/এগ অবস্থায় সংগ্রহ করা উপযুক্ত সময়।

মাশরুম সংগ্রহ কৌশল :

১. প্যাকেটের মাশরুম পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে আলতো মোচড় দিয়ে তুলে নিতে হবে।

২. সংগৃতীত মাশরুম গোড়া কেটে পরিচ্ছন্ন করে গ্রেডিং করতে হবে ।

৩. গ্রেড অনুযায়ী মাশরুমগুলোকে ০.২-০.২৫ মি.মি. পুরুত্বের পিপি ব্যাগে ভরে সিলিং করে বাজারজাত করতে হবে ।

মাশরুম কেন সংরক্ষণ করা উচিত :

তাজা মাশরুমে পানির পরিমাণ বেশি থাকায় এর সংরক্ষণ কাল (Shelf Life) খুবই কম। মাশরুম তুলে আনার পরপরই এর রং এবং গঠনের দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। তাই সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করলে রং ও গঠন ঠিক রেখে বেশিদিন ব্যবহার করা যায়। মাশরুম ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হলে কিছু বিষয় সব সময় মেনে চলতে হবে যেমন-

ক) মাশরুম সঠিক সময়ে অর্থাৎ পরিপক্ব অবস্থায় তুলতে হবে।

খ) যথা নিয়মে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) সংরক্ষণ অবশ্যই ঠাণ্ডা বায়ুরোধী অবস্থায় করতে হবে।

তাজা মাশরুম :

১. তাজা মাশরুম তোলার ১২ ঘণ্টা পূর্বে সরাসরি গায়ে পানি স্প্রে না করলে সেই মাশরুম তুলে, কেটে গ্রেডিং করে পিপি ব্যাগের মধ্যে সিলিং করে ঘরে ঠাণ্ডা জায়গায় ২ থেকে ৩ দিন রেখে খাওয়া যায়।

২. রেফ্রিজারেটরে মধ্যে নরমাল চেম্বারে (১০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায়) সিলিং অবস্থায় ৭/৮ দিন রেখে খাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে প্যাকেটটি রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে একবারেই পুরো প্যাকেটের মাশরুম খেয়ে ফেলতে হবে। তাই প্যাকেট কারার সময় পারিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট ছোট প্যাকেট করা উচিত।

৩. বাসাবাড়িতে দীর্ঘ দিন রেখে খ্ওয়ার জন্য ২% ফুটন্ত লবণ পানিতে ২ থেকে ৩ মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে টিফিন বক্সে অথবা ঢাকনাযুক্ত কৌটায় ডিপ ফ্রিজের মধ্যে ৫ থেকে ৬ মাস রাখা যাবে।

৪. এছাড়া মাশরুম ব্লানচিং করে লবণ দ্রবণে ৫-৬ মাস রেখে খাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্লানচিং করা পদ্ধতি হচ্ছে ২% ফুটন্ত লবণ পানিতে ২ থেকে ৫ মিনিট মাশরুম সিদ্ধ করে বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে ২% লবণ (সোডিয়াম/পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট) ও ১% সাইট্রিক এসিড মিশ্রিত লবণ দ্রবণে বায়ুরোধী করে জীবাণুমুক্ত করার পর ঠাণ্ডা করে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

শুকনা মাশরুম :

মাশরুম রোদে, ডিহাইড্রেশন পদ্ধতিতে অথবা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে শুকিয়ে এয়ার টাইট প্যাকেটে ৫-৬ মাস রেখে সংরক্ষণ করা যায় । শুকনা মাশরুম ব্লেন্ডার মেশিনে পাউডার করে এয়ার টাইট প্যাকেটে রেখে একই ভাবে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

মাশরূম শুকানোর পদ্ধতি : গ্রামীণ পর্যায়ে মাশরুম শুকিয়ে পলিথিন ব্যাগে প্যাকেট করে ৫-৬ মাস অনায়াসে সংরক্ষণ করা যায়। তাজা মাশরুমে ৭০-৯৫% আর্দ্রতা রাখতে হয়। সোলার ড্রায়ারে মাশরুম শুকানো যেতে পারে। মাশরুম শুকানো পদ্ধতি নিম্নরূপ-

১. প্রথমে মাশরুমের ডাঁটার নিচের অংশ কেটে পরিষ্কার করতে হয় ।

২. পানি ফুটিয়ে তাতে ২ ভাগ লবণ দিতে হয় ।

৩. তারপর লবণ পানিতে ৩ মিনিট মাশরুম ডুবিয়ে রাখতে হয় ।

৪. তারপর মাশরুমগুলো তুলে একটি ট্রেতে রেকে ঠান্ডা করা হয় ।

৫. ট্রেতে মাশরুম ছড়িয়ে সাজিয়ে রাখা হয় যাতে একটি মাশরুম অন্যটির উপর না পড়ে ।

৬. ২-৩ দিন পরপর রোদে শুকাতে হয় ।

৭. মাশরুম শুকনো পাতার মতো মচমচে হয়ে যাবে ।

৮. এরপর পলিব্যাগে ভরে মুখ সিল করতে হবে ।

৯. শুকনো মাশরুম ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হবে ।

সাধারণত ১০০ গ্রাম তাজা মাশরুম থেকে ১০ গ্রাম শুকনো মাশরূম পাওয়া যায়। শুকানো ছাড়া মাশরুম সংরক্ষণের একটি সহজ পদ্ধতি হলো ১৮-২০% লবণের দ্রবণে ১% সাইট্রিক এসিড দিয়ে রাখা যায় । এভাবে মাশরুম দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। শুকানো মাশরুম খাবার আগে প্যাকেট থেকে বের করে হালকা গরম পাণিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে মাশরুমগুলোকে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে পূর্বের ন্যায় তাজা হয়ে যাবে।

অনুশীলনী-০৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সাধারণ সবজির মতো মাশরুম মাটিতে জন্মায় না কেন?

২. সাধারণত কী কী জিনিসের উপর মাশরুম জন্মায়?

৩. ভারতে কখন মাশরুম প্রচলন হয়?

৪. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে মাশরুম জন্মে?

৫. কোন মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে মাশরুম জন্মায়?

৬. বনভূমির একই জায়গায় প্রতি বছর কেন মাশরুম জন্মায়?

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীরা মাশরুমকে কী বলে?

৮. মাশরুমের ফ্রুটিং বডির অংশ কয়টি?

৯. মাশরুম বংশ বিস্তারের বীজ কোথায় থাকে?

১০. বাংলাদেশে মাশরুমের কয়টি জাত বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়?

১১. কোন মাশরুমের সেলফ লাইফ বেশি বিধায় রপ্তানি করা যায়?

১২. কোন মাশরুম পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৪০ ভাগ হয়?

১৩. কোন মাশরুম কাঠের গুঁড়িতে চাষ করা হয়?

১৪. বাংলাদেশে মাশরুম চাষের সূচনা হয় কোন মাশরুম দিয়ে?

১৫. কোন মাশরুম ওষধি মাশরুম হিসেবে পরিচিত?

১৬. কোন মাশরুমের উপরের স্তর গাঢ় লাল হয়?

১৭. মাশরুমে কয়টি এমাইনো এসিড পাওয়া যায়?

১৮. মাশরুমের আরগোস্টেরল কী কাজে লাগে?

১৯. মাশরুমের আঁশের পরিমাণ কম হওয়ায় কোন রোগীদের জন্য বেশি উপকারী?

২০. মাশরুমের সেলিনিয়াম কী কাজ করে?

২১. লিভার সুরক্ষায় কোন মাশরুম বেশি কার্যকর?

২২. তাজা মাশরুম ফ্রিজের নরমাল চেম্বারে কতদিন রাখা যায়?

২৩. শুকনা মাশরুম কতদিন রাখা যায়?

২৪. মিল্কি হোয়াইট মাশরুম কখন সংগ্রহ করতে হয়?

২৫. মাশরুম ব্লাঞ্চিং করে ডিপ ফ্রিজে কতদিন রাখা যায়?

২৬. মাশরুম ব্লাঞ্চিং করে লবণ পানির মধ্যে কতদিন রাখা যায়?

২৭. মাশরুম শুকিয়ে কতদিন রাখা যায়?

২৮. ১০০ গ্রাম তাজা মাশরুম থেকে কতটুকু শুকনা মাশরুম পাওয়া যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মাশরুমের পরিচিতি দাও।

২. পার্বত্য অঞ্চলে মাশরুমের জনপ্রিয়তা বর্ণনা কর।

৩. মাশরুমের ফ্রুটিং বডির চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

৪. বাংলাদেশে চাষকৃত ৮টি মাশরুমের নাম লিখ। ২০২২

৫. ঝিনুক বা ওয়েস্টার মাশরুমের বর্ণনা দাও।

৬. মিল্কি মাশরুমের বৈশিষ্ট্য লেখ।

৭. বাটন মাশরুমের বর্ণনা দাও।

৮. স্ট্র মাশরুমের পরিচিতি বর্ণনা কর।

৯. মাশরুমের প্রোটিন ও ফ্যাট মূল্য বর্ণনা কর।

১০. মাশরুমের ৯টি অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিডের নাম লেখ।

১১. মাশরুমে কী কী ঔষধি উপাদান পাওয়া যায় তাদের নাম লেখ।

১২. ওয়েস্টার ও মিল্কি মাশরুম কীভাবে সংরক্ষণ করে?

১৩. মাশরুম কেন সংরক্ষণ করা উচিত?

১৪. তাজা মাশরুম সংরক্ষণে ২টি পদ্ধতি লেখ।

১৫. মাশরুম শুকানোর পদ্ধতি লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাশরুমের পরিচিতি, গঠন চিত্রাঙ্কনসহ বর্ণনা কর।

২. ঝিনুক, দুধ, খড় ও ঋষি মাশরুমের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৩. মাশরুমের পুষ্টি উল্লেখ করে এর প্রোটিন, ফ্যাট, শর্করা ও মিনারেলস সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৪. মাশরুমের ভেষজ মূল্যের বিবরণ দাও।

৫. মাশরুম সংরক্ষণের সময়, কৌশল, তাজা মাশরুম সংরক্ষণ ও মাশরুম শুকানো পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অধ্যায় -০৮

মাশরুম থেকে উৎপাদিত খাদ্য

মাশরুম অত্যন্ত সুস্বাদু সবজি। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মুখরোচক এই মাশরুমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খাদ্য তালিকায় মাশরুমকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যবহৃত হতো অসাধারণ লোভনীয় স্বাদের মাশরুম। বিশ্বব্যাপী ভোজন রসিকেরা মাশরুমকে স্বর্গীয় খাবারের সাথে তুলনা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের কাছে ইহা অপরিচিত সবজি। সঙ্গত কারণেই এর রান্নার প্রক্রিয়াটি অনেকের কাছেই অজানা। ভালোভাবে রান্না হলে এটি আমাদের অপরিচিতি মুখেও স্বাদ লাগবে।

মাশরুম এমন একটি সবজি যা বিচিত্রভাবে ব্যবহার করে অত্যন্ত রুচিকর ও রকমারি খাবার তৈরি করা সম্ভব। তাছাড়া মাশরুম দিয়ে চাইনিজ ও পাঁচতারা হোটেলে বিভিন্ন প্রকার মুখরোচক খাবার তৈরি করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশীয় পদ্ধতিতে মাশরুম দিয়ে অনেক রকম খাবার তৈরি করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচা সম্ভব।

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস মূলত শর্করা জাতীয় খাদ্য নির্ভর। ফলে অধিকাংশ মানুষের আমিষের ঘাটতি রয়ে যায়। মাশরুম যেহেতু উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ সবজি কাজেই আমাদের খাদ্য তালিকায় মাশরুম সহযোগে তৈরি খাদ্য রাখলে একদিকে যেমন আমিষের ঘাটতি পূরণ হবে অন্যদিকে সবাই সুস্থ থাকবে। এই বিবেচনায় নিম্নে কয়েকটি মাশরুম রেসিপি দেওয়া হলো-

১. মাশরুম ফ্রাই	৮. মাশরুম আচার
২. মাশরুম সবজি	৯. মাশরুম দিয়ে মাংস (গরু, খাসি ও মুরগি)
৩. মাশরুম নুডলস	১০. মাশরুম চিংড়ি
৪. মাশরুম চিকেন বিরিয়ানি	১১. মাশরুম চটপটি
৫. মাশরুম চিকেন স্যুপ	১২. মাশরুম সস
৬. মাশরুম ওমলেট	১৩. মাশরুম পিজা
৭. মাশরুম স্যান্ডউইচ	১৪. মাশরুম রোল ইত্যাদি

মাশরুম শুধু কাঁচা অবস্থায় রান্না করে খাওয়া যায় না, শুকনা মাশরুম ও বিভিন্নভাবে খাওয়া যায়। নিম্নে শুকনা মাশরুমের রন্ধনপ্রণালি দেয়া হলো।

রন্ধনপ্রণালি

শুকনা মাশরুমকে রান্নার উপযোগী করা : কাঁচা মাশরুম হলে ধুয়ে নিয়ে সরাসরি রান্নায় ব্যবহার করা যায় কিন্তু শুকনা মাশরুমকে রান্না করার আগে কাঁচা মাশরুমের মতো নরম করে নেয়া দরকার । তাই নিচের প্রণালি অবলম্বন করতে পারেন।

১. মাশরুমের পরিমাণ অনুসারে পানি এমভাবে নিতে হবে যেন মাশরুমগুলো খুব সহজেই ভিজতে পারে।
২. পানিতে সামান্য লবণ দিয়ে ফোটান। (এজন্য ১ লিটার পানিতে ১ চা চামচ লবণ দিলেই যথেষ্ট হবে)
৩. ফুটন্ত পানি চুলা থেকে নামিয়ে শুকনা মাশরুমগুলো ছেড়ে দিয়ে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। দেখবেন শুকনা মাশরুম নরম হয়ে কাঁচা মাশরুমের মতো হয়ে গেছে। এবার পানি ঝরিয়ে নিন।

৮.১ মাশরুম ফ্রাই :

মাশরুম ফ্রাই-এর অপর নাম মামাচিং। নাস্তা হিসেবে এই ফ্রাই চা এর সাথে পরিবেশন করা হয়। ইফতারির সময় বেসনের সাথে সবজির পরিবর্তে মাশরুমের পাকোড়া তৈরি করা হলে তা যথেষ্ট সুস্বাদু হয়। এই ফ্রাই তৈরি করতে মাশরুম ১০-১২টি, ডিম ১টি, ছোলার বেসন ১০০ গ্রাম, লবণ, গোল মরিচ গুঁড়া, সয়াবিন তেল পরিমাণমতো লাগবে। প্রথমে মাশরুম ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ছাড়িয়ে নিতে হয়। তারপর, ডিম, বেসন, লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ঘন করে মিশ্রণ তৈরি করতে হয়। মাশরুমগুলো মিশ্রণে ভালোভাবে ডুবিয়ে নিতে হয়। পাত্রে তেল গরম করে একত্রে কয়েকটি মাশরুম ভেজে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়। এই ফ্রাইটি গরম অবস্থায় খেতে খুবই ভালো লাগে এবং কাউকে প্রথম খাওয়াতে হলে এইভাবে ফ্রাই করে খাওয়ানো উচিত।

চিত্র : মাশরুম ফ্রাই

চিত্র : মাশরুম স্যুপ

৮.২ মাশরুম স্যুপ ও মাশরুম চিকেন স্যুপ :

মাশরুম স্যুপ : আমরা ধীরে ধীরে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। স্যুপ রান্নার জন্য উপরকরণ নিম্নরূপ :

তাজা মাশরুম	২০০ গ্রাম
ডিম	২টি
কর্ন ফ্লাওয়ার	১/৪ কাপ
লবণ	১ চা চামচ
সিরকা	১ চা চামচ
সয়াসস	১ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি	২ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ কুচি	৪ টি
টেস্টিং সল্ট	১/৪ চা চামচ
গোল মরিচ গুঁড়া	১/৪ চা চামচ

প্রস্তুতপ্রণালি :

১। প্রথমে মাশরুম কুচি করে নিতে হবে।

২। সসপ্যান বা পাত্রে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ কুচি ও মাশরুম কুচি এবং লবণ দিয়ে নাড়তে হবে।

৩। সব উপকরণ নরম হয়ে গেলে তাতে সয়াসস দিতে হবে।

৪। এরপর পাত্রে ৮ কাপ পানি দিয়ে ভালভাবে ফুটাতে হবে।

৫। ১ কাপ ঠাণ্ডা পানিতে কর্ন ফ্লাওয়ার মিশিয়ে স্যুপের মধ্যে ঢেলে চামচ দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে।

৬। তারপর ডিমের সাদা অংশ কাঁটা চামচ দিয়ে ফেটে স্যুপের মধ্যে এমনভাবে মেশাতে হবে যেন স্যুপে চিকন চিকন রেখা ফুটে উঠে।

৭। সর্বশেষ টেস্টিং সল্ট মিশিয়ে নামাতে হবে।

৮। পুষ্টিগুণ ভরা এ মাশরুম স্যুপ খেতে খুবই সুস্বাদু এবং এতে ৮ জন খেতে পারবে।

মাশরুম চিকেন স্যুপ ঃ আমাদের দেশে বর্তমানে চীনা রেস্তোরাঁয় স্যুপ খাওয়া অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর মধ্যে চিকেন মাশরুম স্যুপ হলে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। চিকেন মাশরুম স্যুপ তৈরির জন্য মাশরুম ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টি, মুরগির স্টক ৪ কাপ, বাটার অয়েল ২০ গ্রাম, আদা ২৫ গ্রাম, পানি ৩ কাপ, লবণ, টেস্টিং সল্ট পরিমাণমতো লাগবে।

মুরগির স্টক তৈরির জন্য ৩০০-৪০০ গ্রাম ওজনের একটি মুরগি আড়াই লিটার পানিতে পরিমাণমতো লবণ ও আদা দিয়ে ৩০-৪৫ মিনিট সিদ্ধ করা হয়। মাংসগুলো নরম হয়ে আলাদা হয়ে গেলে ছাঁকনি দিয়ে ছেকে মুরগির হাঁড়গুলো আলাদা করা হয় এবং বাকি মাংস স্টক পানির সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়। মাশরুম ও পেঁয়াজ চাকা করে কেটে বাটার অয়েল দিয়ে হালকাভাবে ভেজে নেওয়া হয়। এবার উক্ত ভাজা মাশরুম, মুরগির হাড় ও মাংস সিদ্ধ স্টক পানিতে ৫-১০ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হয়। প্রয়োজনমতো লবণ ও একটি কাপে অল্প পানিতে কর্ন ফ্লাওয়ার গুলিয়ে মিশিয়ে দেয়া হয়। ২-৩ মিনিট সিদ্ধ করার পর টেস্টিং সল্ট দিয়ে নামিয়ে সসসহ পরিবেশন করা হয়।

এছাড়া পাতলা ডালের সাথে মাশরুম দিয়ে শুধু মাশরুম স্যুপ এবং হালিম তৈরির সময় মাশরুম দিয়ে মাশরুমের হালিমও তৈরি করা যায়।

৮.৪ মাশরুম স্যান্ডউইচ ও বার্গার :

মাশরুম স্যান্ডউইচ : বর্তমান সময়ে শহরে এলাকায় স্যান্ডউইচ খুবই পরিচিত। দ্রুত তৈরি এবং খেতে সুস্বাদু হওয়ার জন্য স্যান্ডউইচ সব বয়সের মানুষের কাছে সমাদৃত। স্যান্ডউইচে সাধারণত মাংস, মাছ কিংবা ডিম দেয়া হয়। মাছ মাংস, ডিমের পরিবর্তে মাসরুম ব্যবহার করা হলে স্যান্ডউইচ সুস্বাদু ও উন্নত পুষ্টিমান সম্পন্ন হবে। যারা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন তারা এই স্যান্ডউইচ খেতে পারেন । সেক্ষেত্রে বাটারের পরিবর্তে কোলেস্টরল মুক্ত কর্ন অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। এটি তৈরিতে মাশরুম ৫০ গ্রাম, বাটার ৫০ গ্রাম, পাউরুটি ১টি ও পরিমাণমতো পেঁয়াজ, লবণ ও সালাদ ব্যবহার করা হয়। প্রথমে মাশরুমগুলো স্লাইস করে

১১০১

কেটে নিতে হয় । তারপর ফ্রাই-প্যানে বাটার বা কর্ন অয়েল বা ভেজিটেবল অয়েলের মধ্যে পেঁয়াজ, লবণ দিয়ে মাশরুমগুলো হালকা করে ভেজে নিতে হয় । তারপর দুই পিস পাউরুটির ভিতরে মাশরুগুলো সুন্দর করে ছড়িয়ে দিতে হয় । এরপর মেয়োনেজ, টমেটো, পেঁয়াজ দিয়ে পরিবেশন করা হয় ।

চিত্র : মাশরুম স্যান্ডউইচ

চিত্র : মাশরুম বার্গার

মাশরুম বার্গার : বার্গার তৈরিতে নিম্ন লিখিত উপকরণগুলো লাগবে।

উপকরণ (দুটি বার্গারের জন্য)	পরিমাণ
১। মাশরুম (তাজা/ ফ্রেস)	২০০ গ্রাম
২। ডিম	১টি
৩। পাউরুটি	২ স্লাইস
৪। পেঁয়াজ কুটি	১/২ কাপ
৫। কাঁচা মরিচ কুচি	২টি
৬। ধনোপাতা কুচি	১ টেবিল চামচ
৭। লবণ, গোল মরিচ গুঁড়া, জিরার গুঁড়া	পরিমাণমতো
৮। বনরুটি	২টি
৯। তেল	ভাঁজার জন্য
১০। লেটুসপাতা	সাজানোর জন্য

প্রস্তুত প্রণালি :

১। তাজা মাশরুমগুলো ধুয়ে কুচি করে নিতে হবে। চুলায় পাত্র বসিয়ে দুই কাপ পানি গরম করতে হবে। গরম পানিতে মাশরুম ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। মাশরুম সিদ্ধ হলে ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

২। একটি পাত্রে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, লবণ, গোল মরিচ গুঁড়া ও জিরার গুঁড়া এক সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার সিদ্ধ মাশরুম কুচি, পাউরুটি কুচি ও ডিম দিয়ে ভালো করে পেষ্ট তৈরি করে নিতে হবে। পেস্টটি এমন হবে যাতে এটি দিয়ে চপ/ কাবাব তৈরি করা যায়। মিশ্রণ নরম হলে প্রয়োজনে টোস্ট বিস্কিটের গুঁড়া মেশানো যেতে পারে। এবার বনরুটির সমান সাইজের কাবাব তৈরি করে তেলে ভাজতে হবে।

৩। বনরুটির মাঝে কেটে দুইভাগ করে নিতে হবে। মাঝে কাবাব ও লেটুসপাতা বা টমেটো দিয়ে বাচ্চার স্কুলের টিফিন বক্সে মাজাদার মাশরুম বার্গার ভরে সজিয়ে দেয়া যাবে। উপরোক্ত উপকরণ দিয়ে দুইটি বার্গার তৈরি করা যাবে।

৮.৫ মাশরুমের চিকেন বিরিয়ানি :

মাশরুম চিকেন বিরিয়ানি : এই বিরিয়ানী রান্নার জন্য মাশরুম ২৫০ গ্রাম, মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম, পোলাউর চাল ৫০০ গ্রাম, সয়াবিন তেল ১৫০ গ্রাম, আদা, জিরা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ করে, হলুদ বাটা আধা টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২০০ গ্রাম, গরম মশলা ১০ গ্রাম ও লবণ পরিমাণমতো নিতে হয়।

প্রথমে মুরগির মাংস পরিষ্কার করে ধুয়ে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিতে হয়। চুলায় কড়াই বা পাতিল বসিয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিতে হয়। পেঁয়াজ লাল হয়ে উঠলে আদা, রসুন ও জিরা বাটা মিশিয়ে নাড়তে হয়। অন্য একটি পাত্রে মাশরুম হালকা তেলে ভেজে মুরগির মাংসের মধ্যে মিশিয়ে নিতে হয়। মাশরুম দেওয়ার পর অতিরিক্ত পানি কমিয়ে নিয়ে উঠিয়ে রাখতে হয়। চাল ধুয়ে ভালোভাবে অন্য পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ দিয়ে নাড়াতে হয় যতক্ষণ না চাল লাল বর্ণের হয়। উঠিয়ে রাখা পানি পরিমাণমতো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পানি ফুটে গিয়ে চাল সিদ্ধ হলে মাশরুমসহ মাংস মিশিয়ে দিয়ে আবার ঢেকে রাখা হয়। তারপর পানি কমে গেলে চাল সিদ্ধ হলে নমিয়ে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করা হয়।

মাশরুম নুডলস : এই নুডলস তৈরিতে মাশরুম ২৫০ গ্রাম, নড্যুলস ১০০ গ্রাম, ডিম ২টা, তেল ৫০ গ্রাম, কাঁচা মরিচ ৪-৫টা, লবণ পরিমাণমতো নিতে হয়। প্রথমে মাশরুম হাতে ছিড়ে হালকা গরম পানিতে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর নুডলস সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিতে হয় । চুলার কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়াতে হয়। তারপর তাতে ডিম ভেঙে নিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে তারপর লবণ ও মরিচ দিয়ে নড্যুলস ও মাশরুম দিতে হয়। এরপর ভালোভাবে নেড়েচেড়ে গরম পরিবেশন করতে হয় ।

এছাড়া ও মাশরুম দিয়ে অন্যান্য খাবার যেমন- মাংস (গরু, খাসি ও মুরগি) দিয়ে মাশরুম, মাশরুম চিংড়ি, মাশরুম চটপটি, মাশরুম সস, মাশরুম পিজা, রোল প্রভৃতি খাদ্য তৈরি ও খাওয়া যায় । উন্নত বিশ্বে দৈনন্দিন খাবারে ও অতিথি আপ্যায়নে মাশরুম অপরিহার্য। যেমন উৎসবে বা বিশেষ আয়োজনে খাবার অলংকরণে মাশরুমের জুড়ি নেই। শুকনো ও পাউডার মাশরুম বিভিন্ন তরকারিতে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়াও পাউডার মাশরুম চা, কপি ,দুধ এবং পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়া যায় ।

অনুশীলনী-০৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মাশরুম কোন খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ সবজি?

২. শুকনা মাশরুমকে গরম পানিতে ফুটানোর সময় কতটুকু লবণ দিতে হবে?

৩. ফুটন্ত পানি চুলা থেকে নামিয়ে শুকনা মাশরুম দিয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? ২০২২

৪. মাশরুম ফ্রাই-এর অপর নাম কী?

৫. কাউকে প্রথম মাশরুম খাওয়াতে হলে কোন খাবারটি খাওয়ানো উচিত?

৬. মাশরুম ফ্রাই-এর উপকরণগুলো কী কী?

৭. স্যুপ তৈরিতে সর্বশেষ কী মিশাতে হয়?

৮. মুরগির স্টক বলতে কী বুঝায়?

৯. স্যান্ডউইচে বাটারের পরিবর্তে কী দেয়া যায়?

১০. বার্গারের পেস্ট নরম হলে কী মেশানো যেতে পারে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মাশরুম খাদ্যের গুরুত্ব লেখ।

২. মাশরুম দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের নাম লিখ।

৩. শুকনা মাশরুম রাখার প্রণালি লিখ।

৪. মাশরুম ফ্রাই তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. মাশরুম স্যুপ তৈরির প্রণালি লিখ।

৬. মাশরুম স্যান্ডউইচ কীভাবে তৈরি করে লিখ।

৭. মাশরুম বার্গার বা মাশরুম চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. মাশরুম ফ্রাই, মাশরুম স্যুপ ও মাশরুম চিকেন স্যুপ তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. মাশরুম স্যান্ডউইচ, মাশরুম বার্গার বা মাশরুম চিকেন বিরয়ানি তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২০২২

অধ্যায় -৯

তালের পুষ্টি ও তাল থেকে খাদ্য

বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র মাঠে প্রান্তরে তালগাছ দেখা যায়। তাল পামেসি পরিবারভুক্ত গাছ। তাল, নারিকেল, খেজুর, সুপারি এরিকা, এগুলো সব পামেসি পরিবারের গাছ। বর্তমান আমাদের দেশে এই গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। খেজুর গাছের মতো তাল গাছ যত্ন ছাড়াই জন্মে। খেজুরের তুলনায় তালের বীজ অনেক বড়। চারা গজাতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। গাছ গজানোর ১২-১৩ বছর পর ফল ধরে বলে এটি অনেকে লাগাতে চায় না। তবুও অনেক শৌখিন ব্যক্তিকে জমির আইলে পুকুর পাড়ে, অফিসে চার দিকে রাস্তার দুইধারে তাল গাছ লাগাতে দেখা যায়।

তালের পরিচিতি: গাছ ৬০-৭০ ফুট লম্বা, কাণ্ড গোলাকার, সরল ও দীর্ঘ, পাতা পাখার ন্যায় ও বড়। সাধারণত জানুয়ারি-মার্চ মাসে তালের ফুল ধরে এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে তাল পাকে। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ তাল গাছের ফুলের ছড়াতে টেপিং (Tapping) করে রস সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট হাঁড়ি বেশ কয়েকটি এক সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রস সংগ্রহ করা যায়। তবে স্ত্রী গাছ ফল ধরে সেজন্য স্ত্রী গাছে টেপিং করা হয় না ।

চিত্র : তাল গাছ

তালের ব্যবহার : পাকা তালের রস, গুড় বা চিনি, নারিকেল কোরা এবং দুধ সহযোগে রান্না করে উত্তম মিষ্টান্ন তৈরি করা যায়। তালের পিঠা সুঘ্রাণযুক্ত ও উপাদেয়। কচি তালের শাঁস শর্করাসমৃদ্ধ একটি আকর্ষণীয় খাদ্যবস্তু। অঙ্কুরিত তালের ভিতরের শ্বাস খেতে সুস্বাদু। এটি থেকে উৎকৃষ্ট মোরব্বা তৈরি করা যায়। তালের রস একটি সরস পানীয়। এর রস থেকে গুড় তৈরি করা যায়। তালের গুড় অতি মূল্যবান। তালের গুড় খেজুরের গুড়ের মতো উন্নত না হলেও দানা বাঁধা চিনি যা বাজারে **'তাল মিছরি'** নামে পরিচিত। বাজারে তাল মিছরি যথেষ্ট দাম রয়েছে। আয়ুর্বেদী মতে তাল মিছরি শিশুদের সর্দি কাশি নিরাময়ে অতীব উপকারী।

তালের পুষ্টিমান : কাঁচা তালের শাঁস, পাকা তালের ফল, রস, গুড় এমনকি অঙ্কুরিত তালের আঁটির শাঁস সবই সুস্বাদু ও প্রিয় খাবার। তালের পুষ্টিমান নিম্নে দেওয়া হলো-

চিত্র : পাকা তাল

চিত্র : পাকা শাঁস

চিত্র : তালের মিছরি

সারণি : তালের পুষ্টিমান (আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্রমিক নং	উপাদান	পাকা তাল	কচি তালের শাঁস
১	আমিষ (গ্রাম)	০৭	০.৬
২	শ্বেতসার (গ্রাম)	২০.৭	৬.৫
৩	চর্বি (গ্রাম)	০.২	০.১
৪	খনিজ লবণ (গ্রাম)	০.৭	০.২
৫	ভিটামিন-বি১ (মি.গ্রাম)	-	০.০১
৬	ভিটামিন-বি২ (মি.গ্রাম)	-	০.০১
৭	ভিটামিন-সি (মি.গ্রাম)	-	৪
৮	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম)	৮	৪৩
৯	লৌহ (মি.গ্রাম)	-	০.৫
১০	খাদ্য শক্তি (কি.ক্যালরি)	৭৮	২৯

তালের বিভিন্ন খাদ্য : ভাদ্র মাসে তাল পাকে। আমাদের দেশে গ্রামেগঞ্জে এ সময়ে গৃহিণীরা পাকা তাল দিয়ে বিভিন্ন মজাদার খাবার তৈরি করে থাকে। তাল থেকে সে সকল খাবার তৈরি করা যায় তা হলো–

১. তালের গোলা
২. তালের বড়া পিঠা
৩. তালের খেজুর পিঠা
৪. তালের মাল পোয়া
৫. তালের জিলাপি
৬. তালের ভাপা পিঠা
৭. তালের কেক
৮. তালের পুলি ও নকশি পিঠা
৯. তালের ক্ষীর
১০. তালের চুষী পিঠা
১১. তালের রোল
১২. তালের রসমালাই
১৩. তালের জ্যাম ও জেলি
১৪. কচি তালের প্রিজার্ভ ও ক্যান্ডি ।
১৫. তাল দুধ

তালের গোলা তৈরি : প্রথমে পাকা তাল সংগ্রহ করতে হবে। পাকা তালের ফল থেকে সুন্দর ঘ্রাণ বের হবে, চকচকে ও চামড়া নরম হবে। পাকা তাল গাছ থেকে আপনা-আপনি নিচে পড়ে। তাল যদি একটু শক্ত থাকে তাহলে দুইদিন ঘরে রাখলেই নরম হয়ে যায়। পাকা তালের চামড়া হাত দিয়ে টেনে ছিলে ফেলা যায়। ভিতরের নরম আঁটি যদি একটু শক্ত হয় তাহলে হাত দিয়ে কোয়া তিনটি ঢিলা করে নিয়ে কিছুক্ষণ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়।

তারপর তলায় ডেকচি রেখে বেতের চালুনির উপর তালের আঁটি ঘষে রস বা গোলা বের করে নেওয়া হয়। গোলার তিতা দূর করার জন্য পাতলা কাপড়ে সম্পূর্ণ গোলা নিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে সমস্ত কষ নিচে ঝরে গিয়ে গোলা মিষ্টি হয়ে যায়। ঝুলিয়ে না রেখে, চালুনির উপর পুঁটলিটা আনুমানিক ৪-৫ ঘণ্টা বসিয়ে রাখলেও কষ ঝরে যায়। এরপর মিষ্টি গোলা দিয়ে বড়া, ক্ষীর, মালপোয়া তৈরি করা যায় ।

তালের বড়া : প্রথমে পাকা তালের রস পানি দিয়ে চিপে সংগ্রহ করে ছেঁকে নিতে হয় । তারপর চুলায় দিয়ে তালের রস জ্বাল দিতে হয়। রস একটু ঘন হয়ে এলে নামাতে হয়। অতঃপর ঘন রসের সাথে পরিমাণমতো চালের গুঁড়া, গুড় বা চিনি ও প্রয়োজনমতো মসলা দিয়ে ভালো করে মিশাতে হয় । এতে তালের গোলা রুটির খামিরের মতো না হয়ে পাতলা হবে। চুলায় তেল গরম করে চামচ তিয়ে গোলা নিয়ে ডুবো তেলে তালের বড়া পিঠা ভেজে নিয়ে গরম গরম খাওয়া যায় ।

৯.৩ তালের জ্যাম ও জেলি :

তালের জ্যাম : তাল থেকে উন্নত মানের জ্যাম তৈরি করা যায়। পাকা তালের আঁটির ওজনের তিন ভাগের একভাগ পানি যোগ করে চটকিয়ে তালের গোলা বা মণ্ড তৈরি করতে হয়। তালের জ্যাম তৈরির জন্য এক কেজি গোলার সাথে ১ কেজি চিনি, ১১.৫ গ্রাম পেকটিন ১২.৫ গ্রাম সাইট্রিক এসিড এবং ১ গ্রাম সোডিয়াম বেনজোয়েট প্রয়োজন হয়। গোলার সাথে চিনি যোগ করে জ্বাল দেয়া হয়। রান্নার মাঝামাঝি পর্যায়ে পেকটিন যোগ করা হয়। এবং কাঙ্খিত গাঢ়ত্বে না আসা পর্যন্ত জ্বাল দিতে হয় । মিশ্রণ পাক হয়ে এলে শিটিং পরীক্ষা করতে হয়। এক চামচ মিশ্রণ নিয়ে ঠাণ্ডা করে মিশ্রণ পড়তে দেওয়া হয়। যদি এটা একাধারে শিটের আকারে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জ্যাম তৈরি হয়ে গেছে। শিটিং পরীক্ষায় জ্যাম প্রস্তুত হওয়ার কাছাকাছি বুঝা গেলে সাইট্রিক এসিড পাউডার অল্প অল্প করে যোগ করে সামান্য একটু জ্বাল দেওয়া হয়। তারপর অল্প পরিমাণ পানিতে সোডিয়াম বেনজোয়েট যোগ করে দেওয়া হয়।

তালের জেলি : জেলি জ্যামের মতোই এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত অর্ধকঠিন খাদ্য। তবে এখানে তালের পরিবর্তে তালের রস ব্যবহার করা হয়। কমপক্ষে ৪৫% ফলের রস লাগে। এটি জ্যামের মতো দেখতে তবে অনেকটা স্বচ্ছ। জেলী তৈরির ক্ষেত্রে তাল ফল পাকা ও নিখুঁত হতে হবে, চিনি ময়লাবিহীন হতে হবে, পেকটিনের ক্ষমতা সন্তোষজনক হতে হবে, প্রিজারভেটিভ হিসেবে কে এম এস বা সোডিয়াম বেনজোয়েট দিতে হবে। মিশ্রণটি জ্বাল দিয়ে জেলি হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে নামাতে হবে।

চিত্র : তালের জেলি

৯.৪ তালের জিলাপি :

উপকরণ :

১. ঘন তালের গোলা ২ কাপ
২. দুধ ২ লিটার
৩. ছানা ১ কাপ
৪. ময়দা ৩ টেবিল চামচ
৫. চিনি ২ টেবিল চামচ
৬. ঘি ২ টেবিল চামচ
৭. এলাচ গুঁড়া সামান্য
৮. বেকিং পাউডার সামান্য
৯. সিরার জন্য চিনি ৫ কাপ
১০. পানি ৬ কাপ
১১. গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ

চিত্র : তালের জিলাপি

প্রস্তুত প্রণালি :

১. চিনি ও পানি একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে গাঁদ কাটিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে রাখতে হবে।
২. তরল দুধ জ্বাল দিয়ে নেড়েচেড়ে ঘন করে নিতে হবে।
৩. ময়দা, ঘি ও বেকিং পাউডার ২ টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে রাখতে হবে।
৪. ছানা হাতের তালু দিয়ে মসৃণ করে ডলে এবং পূর্বে রাখা তালের গোলা, এলাচ গুঁড়া ও বাদাম দেওয়া ময়দা সব একসঙ্গে মাখিয়ে জিলাপির শেপ করে নিতে হবে।
৫. তেল দুই কাপ ও ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে গরম চুলায় কম আঁচে জিলাপির লাল রং করে ভেজে সিরায় ছাড়তে হবে।
৬. সব জিলাপি সিরায় দেয়ার পর চুলায় ২০-২৫ মিনিট ফুটিয়ে তারপর মাখিয়ে ৫-৬ ঘণ্টা সিরায় ডুবিয়ে রাখতে হবে।
৭. সিরা থেকে উঠিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

৯.৫ তালের পিঠা ও কেক :

তালের ভাপা পিঠা : এই পিঠা তৈরি করতে তালের গোলা ৬ কাপ, গুড় ২ কাপ চালের গুঁড়ো ৮ কাপ, এলাচ গুঁড়ো আধা চা চামচ, নারিকেল কোরা ২ কাপ নিতে হয় ।

প্রথমে পাকা তাল থেকে তালের গোলা তৈরি করে গুড় ও চালের গুঁড়ো একসঙ্গে মাখিয়ে ৬-৭ ঘণ্টা ফারমেন্টশন বা গাঁজানোর জন্য রাখতে হয়। এরপর এই গোলার সাথে বাকী উপকরণ মেশাতে হয়। এরপর

ভাঁপা পিঠা তৈরির মতো গরম পানির হাঁড়ির মুখে ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা দিয়ে ঢাকনা মুখ ও হাঁড়ির কিনারা আটা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। এরপর অন্য একটি কাপড় ঢাকনার মুখের উপর বিছিয়ে তাতে তালের গোলা ঢাকতে হয়। অপর একটি ঢাকনা দিয়ে পিঠা ঢেকে দিতে হয়। ১৫-২০ মিনিট বাষ্পের তাপে সিদ্ধ হয়ে হলুদ রঙের ভাপা পিঠা তৈরি হয়

তালের পুলি পিঠা : পুলি পিঠার পুরের জন্য ঘন তালের গোলা ১ কাপ, পাটালি গুড় ২ কাপ, নারকেল কোরা ৩ কাপ, সাদা তিল অধাকাপ, গুঁড়া দুধ আধাকাপ, দারুচিনি ৪ টুকরার প্রয়োজন হয়। প্রথমে গুঁড়ো দুধ বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। ঘন হয়ে এলে গুঁড়ো দুধ দিয়ে নাড়াচাড়া করে চটচটে হলে নামাতে হয়। পুলি তৈরির জন্য তালের গোলা দুই কাপ চিনি আধা কাপ, ও সামান্য লবণ দিয়ে চুলায় জ্বাল তিতে হয়। ভালোভাবে ফুটতে থাকলে চালের গুঁড়া তিন কাপ ও ময়দা আধা কাপ দিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়। চালের গুঁড়া সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। ঠান্ডা হলে ২ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে ভাল করে ডলে খামির তৈরি করে ২০-২৫টি গোল বাটির মতো শেপ করে তার ভিতর পুর ভরে অর্ধচন্দ্র শেপ করে মুখবন্ধ করে কয়েকটি পুলি তৈরি করা হয়। এরপর পুলি ডুবোতেলে ভেজে পরিবেশন করা যায়।

তালের কেক : এই কেক তৈরির জন্য তালের গোলা চার কাপ, চালের গুড়াঁ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, খেজুরের গুড় দুই কাপ, চিনি দুই টেবিল চামচ বা স্বাদমতো, লবণ সমান্য, ময়দা এক কাপ, নারিকেল কোরা এক কাপ, ঘি বা তেল আধা কাপ, এলাচ গুঁড়া সিকি চা চামচ, কিসিমিস ২০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ২০ গ্রাম, বাদাম ও পেস্তা কুচি কেকের ড্রেসিং এর জন্য ২০ গ্রাম, ডিম ২টি নিতে হবে। প্রথমে তালের গোলা তৈরি করে ৬-৭ ঘন্টা গরম স্থানে ঢেকে রাখতে হয়। চালের গুঁড়া একটু ভেজে ঠাণ্ডা করে বেকিং পাউডার ও গুঁড়া দুধ মিশিয়ে চেলে নিতে হয়। ডিম, চিনি ও ঘি একসঙ্গে ফেটিয়ে পরে তালের গোলা, গুড়া, লবণ ইত্যাদি অল্প অল্প করে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশ্রণ করে রাখা হয়। কলাপাতা বিছানো একটি পাত্রে এবার মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হয়। ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে ৫০-৫৫ মিনিট বেক করতে হয়। ভেতরের মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে পাত্রটি বের করে মাঝখানে কাঠি দিয়ে কলাপাতা বিছিয়ে কিছু জ্বলন্ত কাঠ কয়লার আগুন দিয়ে ১৫-২০ মিনিট ধরে হালকা আঁচে চুলার উপর রাখতে হয়। মিষ্টি সুন্দর ঘ্রাণ বের হলে বুঝতে হবে সুস্বাদু তালের কেক হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হলে স্লাইস করে পরিবেশন করা হয়। এই কেক মাইক্রোওভেনে ও তৈরি করা যায়। ওভেনে কলা পাতার পরিবর্তে অয়েল পেপার ব্যবহার করতে হবে।

চিত্র : তালের কেক

তালের মালপোয়া : মালপোয়ার জন্য তালের ঘন গোলা তিন কাপ, ময়দা ২ কাপ, গুঁড়ো দুধ আধা কাপ, বেকিং পাউডার আধা চা চামচ, চিনি আধা কাপ লাগবে। প্রথমে , গুঁড়ো দুধ ও বেকিং পাইডার একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। তারপর ঘন হলে ময়দা দিতে হয়। ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখতে হয়। গরম ডুবো তেলে ছোট ছোট মালপোয়া তৈরি করে ভেজে নিতে হয়। চিনির সিরার জন্য ৪ কাপ চিনি, ৩ কাপ পানি, ২ টুকরা

দারুচিনি, ২টি ছোট এলাচ একসঙ্গে চুলায় জ্বাল দিয়ে সিরা করে নিতে হয়। তারপর ভাজা মালপোয়াগুলো চিনির সিরায় ১৫-২০ মিনিট রেখে অল্প সিরাসহ উঠিয়ে রাখতে হয়।

তালের রোল : প্রথমে রোলের পুর করার জন্য ২ লিটার দুধ, ২ কাপ নারিকেল কোরা, ২ কাপ ঘন তালের গোলা ও ২ কাপ গুড় নিতে হয়। দুধ জ্বাল দিয়ে আধা লিটার হলে তাতে তালের গোলা, গুড়, নারিকেল মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন করে ক্ষীরের মতো করে নামাতে হয়।

রুটি তৈরির জন্য তালের গোলা ১ কাপ, দুই কাপ ময়দা, পরিমাণমতো চিনি, লবণ ও তেল একসঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে মেখে খামির তৈরি করতে হয়। খামির ১ ঘন্টা ঢেকে রাখার পর পাতলা করে রুটি বেলে দুই চামচ পুর দিয়ে রোল করতে হয়। ডুবো তেলে রোলগুলো পর্যায়ক্রমে ভেজে খাওয়া যায়।

অনুশীলনী-০৯

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. পামেসি পরিবারের তাল ছাড়া আর কোন কোন গাছ অন্তর্ভুক্ত?

২. তালের চারা জন্মানোর কতদিন পর ফল ধরে?

৩. তাল গাছ কতটুকু লম্বা হয়?

৪. তাল গাছে কখন ফুল ধরে ও ফল পাকে?

৫. টেপিং বলতে কী বুঝায়?

৬. তালের শাঁস থেকে কী তৈরি করা যায়?

৭. তাল মিছরি কী?

৮. তাল মিছরি কী রোগ নিরাময় করে?

৯. তালের গোলা কতক্ষণ চালুনির উপর রাখলে কষ চলে যায়?

১০. তালের জ্যাম তৈরির কোন সময় পেকটিন যোগ করতে হয়?

১১. জেলিতে শতকরা কত ভাগ ফলের রস থাকে?

১২. জেলিতে প্রিজারভেটিব হিসেবে কী দিতে হয়?

১৩. চিনির সিরায় জিলাপি দিয়ে কত ঘন্টা জ্বাল দিতে হয়?

১৪. পুলি পিঠার আকার কী ধরনের হয়?

১৫. তালের কেক তৈরির গোলা কত ঘন্টা গরম স্থানে রাখতে হয়?

১৬. কেকের সকল মিশ্রণ একটি পাত্রে নিয়ে কতক্ষণ বেক করতে হয়?

১৭. তালের মালপোয়া চিনির সিরায় কত মিনিট রাখতে হয়?

২০২২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. তাল গাছের পরিচিতি দাও।

২. তালের ব্যবহার বর্ণনা কর।

৩. তাল মিছরি কী কাজে লাগে?

৪. তালের তৈরি বিভিন্ন খাদ্যের নাম লেখ।

৫. তালের গোলা কীভাবে তৈরি করে?

৬. তালের বড়া তৈরির বর্ণনা দাও।

৭. তালের মালপোয়া কীভাবে তৈরি হয়?

৮. তালের রোল তৈরির বর্ণনা দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. তালের পরিচিতি, ব্যবহার ও পুষ্টি বর্ণনা কর।

২. তালের জ্যাম ও জেলি তৈরি বর্ণনা কর।

৩. তালের জিলাপি তৈরির বর্ণনা কর।

৪. তালের ভাপা পিঠা ও কেক তৈরির প্রণালি লেখ।

অধ্যায়-১০

নারিকেলের পুষ্টিমান ও খাদ্যদ্রব্য

ভূমিকা : নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। ব্যবহার বৈচিত্র্যে এটি একটি অতুলনীয় উদ্ভিদ। তাছাড়া নারিকেল একটি সুস্বাদু ও শোভাবর্ধনকারী গাছ। বাড়ির সামনে নারিকেল গাছের সারি লাগানো থাকলে আসলেই খুব সুন্দর দেখায়। নারিকেল গাছের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের কাজে লাগে। জানা গেছে, এ গাছটির তিন শতাধিক রকমের ব্যবহার রয়েছে। খাদ্য পানীয় থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম, পশুখাদ্য, বাসন-কোসন ইত্যাদি জীবন যাত্রার যাবতীয় উপকরণ নারিকেল গাছ থেকে পাওয়া যায়।

নারিকেলের ব্যবহার : নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, মাদুর প্রভৃতি তৈরী করা হয়। নারিকেলের মালা দিয়ে অ্যাকটিভেটেড কাঠ কয়লা, বাটি, বাক্স, গয়না, বোতাম ও ঘর সাজাবার দ্রব্যাদি তৈরি হয়। পাতা মাদুর তৈরি ও ঘর আচ্ছাদনের কাজে ব্যবহার হয়। পাখা, ঝুড়ি, ঝাঁটা প্রভৃতিও নারিকেল পাতা থেকে তৈরী হয়। নারিকেলের পুষ্পমঞ্জরী কচি অবস্থায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাটলে তা থেকে মিষ্টি রস বের হয়। রস থেকে গুড় ও তাড়ি তৈরি করা যায়। কচি ফল অর্থাৎ ডাবের পানি অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয়। নারিকেল কোরা ও নারিকেলের দুধ দিয়ে বিভিন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন তৈরি করা যায়। এছাড়া রঞ্জক ও ঔষধ তৈরির কাজে নারিকেল ব্যবহার হয়। এর তেল ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন- শ্রীলংকা। প্রদীপ জ্বালাতে এবং গ্লিসারিন ও কেশতেল তৈরিতে ও এটি ব্যবহার হয়। নারিকেল গাছের বহুবিধ ব্যবহারের কারণে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে একে স্বর্গীয় গাছ বা কল্পতরু বলা হয়।

চিত্র : নারিকেলের কাঁদি (ভিয়েতনামী জাত)

নারিকেল বীজের গঠন :

নারিকেল ফল বা বীজের চারটি অংশ থাকে যথা- (ক) ফলত্বক, (খ) বীজত্বক, (গ) এন্ডোস্পার্ম বা কার্নেল, (ঘ) ভ্রূণ।

ক) ফলত্বক : নারিকেলের ফলত্বক আবার তিনটি অংশে বিভক্ত যেমন–ত্বক এটি নারিকেলের একেবারে বাহিরের গায়ের পাতলা বাদামি স্তর। ছোবড়া-ত্বকের নিচের স্তর হচ্ছে ছোবড়া। ছোবড়ার পরের স্তর হচ্ছে নারিকেলের মালা বা খোল। ত্বক, ছোবড়া ও খোল এই তিন স্তর মিলে ফলত্বক গঠিত।

খ) বীজত্বক : এটি একটি পাতলা বাদামি আবরণ। শাঁস ও খোলের মাঝে থাকে এবং শাঁসকে খোলের সাথে আটকে রাখে।

গ) **এন্ডোস্পার্ম বা কার্নেল :** নারিকেলের ভিতরের পুরু শাঁস ও পানিকে একত্রে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম বলে। ডাবের শস্য বা এন্ডোস্পার্ম অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। কিন্তু এই কোষগুলোর মাঝে কোন কোষপ্রাচীর থাকে না। তাই অসংখ্য নিউক্লিয়াস ও সাইট্রোপ্লাজমের তরল দিয়ে ডাবের সস্য বা পানি তৈরি হয়।

চিত্র : নারিকেল বীজের বিভিন্ন অংশ।

ঘ) **ভ্রূণ :** এটি অতি ক্ষুদ্র। খোলের বোঁটার দিকে তিনটি চোখের মতো দাগ দেখা যায় এর যেকোনো একটি চোখের নিচে ভ্রূণ অবস্থান করে। অঙ্কুরোদগমের সময় ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে শাঁসের ভিতরের গহ্বর পূর্ণ করে ফোপরা তৈরি করে।

১০.১ নারিকেলের (ডাব, ঝুনা, শাঁস, পানি) খাদ্য মূল্য :

ঝুণা নারিকেল, ডাব নারিকেলের পানি, কোপ্রা ও খইলের পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রাম খাবার অংশে) নিম্নের সারণিতে তালিকা দেখানো হলো-

ক্র নং	উপাদান	নারিকেল (ডাব)	নারিকেল (ঝুনা)	নারিকেল (পানি)	নারিকেল (কোপ্রা)	নারিকেল (খইল)
১	আমিষ (গ্রাম)	৪.৯১	৪.৫০	০.১০	৭.৬০	১৯.১০
২	শর্করা (গ্রাম)	৪.৭৬	১৩.০০	৪.০০	১৬.১০	৪৩.৮০
৩	লিপিড (গ্রাম)	০.৪৫	৩৫.৫৭	০	০	০
৪	পানি (গ্রাম)	০	৪১.৬০	০.১০	৬৭.৫০	৯.১২
৫	চর্বি (গ্রাম)	৭৫.৯২	৩৬.৩০	৯৫.৫০	৬.৮০	১০.০
৬	খনিজ দ্রব্য (গ্রাম)	০.৯৮	১.০০	০.৪০	২.০০	৪.৩০
৭	আঁশ (সিদ্ধের পূর্বে) গ্রাম	০	০	০	০	০
৮	আঁশ (সিদ্ধের পরে) গ্রাম	২.৫০	৩.৬০	০	৩.৮০	১১৮০
৯	ভিটামিন-এ (আই,ইউ)	০	০	০	০	০
১০	ভিটামিন-বি১২ (মি.গ্রাম)	০.১১	০.১৫	০	০	০
১১	ভিটামিন-বি২ (মি.গ্রাম)	০.০২	০.০২	০	০	০
১২	ভিটামিন-সি (মি.গ্রাম)	৪.৯৭	১.০০	০	০	০
১৩	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম)	১৪.৬০	০.০১	০.০২	০	০
১৪	লৌহ (মি.গ্রাম)	০	১.৭০	০.৫	০	০
১৫	ক্যালরি	১২৩.৯২	৪৪৮.৯০	১৭.৪০	৬৭৫.৭০	৩৬০.৭০

উৎস : নারিকেলের উৎপাদন ও ব্যবহার - কৃষিবিদ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ।

১০.২ ডাবের পুষ্টিমান :

ডাবের পুষ্টিমান : ঝুকা বা ঝুনা নারিকেলের মোট ওজনের ৩৫% খোসা, ১২% মালা বা খোলে ২৮% শাঁস ও ২৫% পানি। পরাগায়নের ৪ মাস বয়স পর্যন্ত ডাবে কোনো শাঁস হয় না। এ সময়েই ডাব খাওয়ার উপযুক্ত সময়। ডাবের পানি একটি উৎকৃষ্ট পানীয়। কচি ডাবের পানিতে চিনির পরিমাণ কম থাকে। ধীরে ধীরে শাঁস গঠন শুরু হলে চিনির পরিমাণ বাড়তে থাকে। ৭-৮ মাস বয়সের সময় পানিতে চিনি থাকায় তখন তা মিষ্টি লাগে। ডাবের পানিতে খাদ্য উপাদান তেমন না থাকলেও খনিজ লবণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ডায়রিয়া, কলেরা বা আমাশয়ের কারণে শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দিলে কচি ডাবের পানি পানে তা পূরণ হয় এবং শরীরে খনিজ লবণের সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। সাময়িক ক্লান্তি দূরীকরণে কচি ডাবের পানি ও শাঁস দুটোই সমান উপকারি। কচি ডাবের নরম মালায় পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়োডিন থাকে।

পাকা নারিকেলের শাঁস ও ডাবের পানিতে পুষ্টির প্রধান কয়েকটি উপাদানের পরিমাণ দেওয়া হলো। (১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী খাদ্যে)

ক্রমিক নং	উপাদান	শাঁস	ডাবের পানি
১	পানি	৪৪	৯৫.২
২	আমিষ	৪.৩	০.১
৩	শ্বতসার	১০.০	৪.০
৪	আঁশ	২.৫	০
৫	স্নেহ	৩৮.০	০.১
৬	খনিজ পদার্থ	১.০	০.৪

শাঁসে ও পানিতে ভিটামিনের পরিমাণ খুব কম, তবে পানিতে প্রতি ১০০ মি.লি. তে ৩০ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.১ মিলি গ্রাম লৌহ, ৩৭ মিলি গ্রাম ফসফরাস ও যথেষ্ট পরিমাণে অন্যান্য খনিজ লবণ আছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট নারিকেলের শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ ডাব হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে জানা যায়।

১০.৩ নারিকেল থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য :

নারিকেলের গাছের ব্যবহার বহুবিধ। এর প্রতিটি অংশ মানুষের কাজে লাগে। খাদ্য, পানীয় ও নির্মাণসামগ্রী এবং শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী হিসেবে নারিকেল বিখ্যাত। কাজেই নারিকেল যেমন খাদ্য তেমনই আঁশের ফসল ও তেলবীজও বটে। নারিকেল গাছ ও ফলের উৎপন্ন দ্রব্যাদি মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন-

ক) খাদ্য দ্রব্য

১) নারিকেল শাঁস বা কার্নেল।
২) নারিকেলের আমিষ ও ভোজ্য তেল।
৩) নারিকেলের শুকনো শাঁস।
৪) নারিকেলের ময়দা বা খৈল।
৫) বল ও কাপ কোপরা।
৬) শুকানো কোরা নারিকেল।
৭) নারিকেলের পানি।
৮) তাড়ি ও তাড়িজাত দ্রব্য।

খ) বাণিজ্যিক ও শিল্পজাত দ্রব্য :

১) কোপরা।

২) তৈল।

৩) নারিকেল খৈল।

৪) ছোবড়া বা Coir

৫) ছোবড়ার গুঁড়া

গ) নির্মাণসামগ্রী :

১) পাতা

২) নারিকেলের মালা

৩) কাঠ কয়লা (Shell Charcol)

৪) মালার গুঁড়া

৫) নারিকেল গাছের কাঠ

খাদ্যদ্রব্য : নারিকেল উৎপাদনকারী দেশসমূহে নারিকেল একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে সুপরিচিত। নারিকেলের খাদ্য দ্রব্যগুলো নিম্নরূপ-

১. **শাঁস বা কার্নেল :** সুপরিপক্ব হওয়ার আগে নারিকেলের নরম শাঁস অনেকের কাছে বেশ প্রিয়। তবে শাঁস হিসেবে সাধারণত পরিপক্ব নারিকেলের শাঁসকেই ব্যবহার করা হয়। কাঁচা শাঁস থেকে বিভিন্ন ধরনের পিঠা পায়েস, নাড়ু-লাড্ডু তৈরি করার রীতি এদেশে বহুল প্রচলিত কাঁচা শাঁস থেকে যে দুধ পাওয়া যায় তা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও সরাসরি পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. **নারিকেলের দুধ :** টাটকা শাঁস নারিকেল কুরানি দিয়ে কুরে তার সাথে হালকা গরম পানি মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ডিং করে যে সাদা রস বের হয় তা ছেঁকে যে পানীয় পাওয়া যায় তাহাই নারিকেলের দুধ। ফিলিপাইনে নারিকেলের দুধ থেকে সিরাপ প্রস্তুত করা হয় এবং কনফেকশনারিতে ব্যবহার হয়। দুধের মধ্যে গড়ে ৫০% পানি, ৪০% স্নেহ, ২.৫% আমিষ, ৩% শ্বেতসার, ১০% কঠিন পদার্থ ও ১-২% খনিজ লবণ থাকে।

চিত্র : নারিকেল থেকে দুধ আহরণ

৩. আমিষ : নারিকেল শাঁসের ৪-৪.৬% আমিষ থাকে। নারিকেল শাঁস থেকে ভোজ্য আমিষ, তৈল, ময়দা তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন ও চালু পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে সম্ভব হয়েছে।

৪. ডাবের পানি : কচি ডাবের পানি দেহকে সতেজ রাখার জন্য অনেকেই খেয়ে থাকেন। বিভিন্ন রকম পেটের পীড়ায় গ্লুকোজ, স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি খুবই উপকারী। পাতলা পায়খানা বা বমির ফলে দেহে যে পরিমাণ পানির অভাব ঘটে তা পূরণে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরি। ঘরে তৈরি স্যালাইনের চেয়ে ডাবের পানি স্যালাইন হিসেবে অধিক কার্যকরী।

৫. তাড়ি বা Toddy : অফুটা ফুলের ছড়া বা পুষ্প মঞ্জরীর মোচা ধারালো ছুরি দ্বারা কেটে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিষ্টি রস সংগ্রহ করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ রস গাজানোর পর যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাকে তাড়ি বলে। একটি সতেজ গাছ থেকে প্রতিদিন ২-২.৫ লিটার রস হিসেবে বছরে ২০০-৪০০ লিটার রস পাওয়া যায়। প্রতিটি ছড়া থেকে ১.৫-২ মাস রস সংগ্রহ করা যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম রসে ১২-১৫ গ্রাম চিনি পাওয়া যায়। রসকে গাঁজিয়ে ও পরিশ্রুত করার পর অ্যালকোহল তৈরি হয়। প্রায় ৭ গ্যালন রস থেকে ১ গ্যালন এলকোহল পাওয়া যায়। রস টাটকা অবস্থায় পান করা ছাড়াও গুঁড়, চিনি, সিরকা ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

বাণিজ্যিক পণ্য :

১. **কোপ্রা (Copra) :** নারিকেলের আস্ত বা খণ্ডিত শুকানো শাঁসকে কোপ্রা বলে। আন্তর্জাতিক বাজারে কোপ্রা আকারেই সর্বাধিক নারিকেল বেচাকেনা করা হয়।

কোপ্রা দুই ধরনের, যথা– বল কোপ্রা ও কাপ কোপ্রা। আস্ত নারিকেলে বিশেষ ধরনের গুদামে রেখে ৮-১২ মাস শুকালে শাঁস শুকিয়ে সংকুচিত হয়ে খোল থেকে আলাদা হয়ে যায়। একেই বল কোপ্রা বলে। কিন্তু খোলসহ শাঁস দিখন্ডিত করে রোদে বা চুল্লিতে শুকিয়ে **কাপ কোপ্রা** তৈরি করা যায়। কোপ্রাতে ৫-৭% পানি, ২০-২৫% আমিষ থাকে।

চিত্রঃ বল ও কাপ কোপ্রা।

প্রধানত : তেল উৎপাদনের জন্য কোপ্রা ব্যবহার হয়। তবে কুরিয়ে খাদ্যের উপাদান হিসেবেও ব্যবহার হয়। সাধারণত ১০০০টি মাঝারি আকারের নারিকেল থেকে ২০০-৩০০ কেজি কোপ্রা পাওয়া যায়।

২. **নারিকেল তেল :** কোপ্রাকে গুঁড়া করে ঘানি, হাইড্রোলিক প্রেস অথবা এক্সপেলার মেশিনের সাহায্যে তেল আলাদা করা হয়। কোন কোন সময় দ্রাবক (Hexane, Benzene) নিষ্কাশনের সাহায্যেও তেল আলাদা করা হয়ে থাকে। ঘানি ব্যবহার করলে খৈলে ১২-১৭% তেল থেকে যায়। এক্সপেলারের বেলায় কম বেশি ৬% তেল থাকে কিন্তু দ্রাবক ব্যবহার করলে তেলের প্রায় সবটাই বের হয়ে আসে। নারিকেল তেল একটি উৎকৃষ্ট ভোজ্যতেল হিসেবে রান্নায় ব্যবহার করা যায়। তবে আমাদের দেশে রান্নার চেয়ে চুলে মাখার কাজেই তেল বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সাবান, প্রসাধনী, লুব্রিকেন্ট প্রভৃতি তৈরিতে এ তেল ব্যবহৃত হতো।

৩. **শুকনা কুরা নারিকেল :** শাঁস কুরে শুকিয়ে এটা তৈরি করা হয়। কোপ্রার ন্যায় এটাও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। শ্রীলংকা ও ফিলিপাইন প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। ইহাতে ২-২.৫% পানি থাকে এ দ্রব্য সরাসরি বিস্কুট ও বেকারি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। কুরানোর সময় বিভিন্ন সাইজে কুরিয়ে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে প্যাকিং করা হয়।

চিত্র : কোরানো নারিকেল।

৪. **নারিকেলে খৈল :** কোপ্রা থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে খৈল থাকে তা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের খৈল গরু ও ছাগলের উত্তম খাদ্য। এছাড়াও এ খৈল জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৫. **ছোবড়া বা আঁশ :** নারিকেলের ছোবড়ায় আঁশ থাকে। এই আঁশের কদর কোনো অংশে কম নয়। সাধারণ পানিতে ৮-১০ মাস ছোবড়া পচানোর পর ছোবড়া থেকে আঁশ আলাদা হয়ে যায়। এরপর ধৌত করে এবং মুগুর পিটিয়ে আঁশ বের করা হয়।

পরিপক্ক ফলের আঁশ অপেক্ষা অপরিপক্ক ফলের আঁশ গুণে উৎকৃষ্ট। আঁশ দিয়ে রশি, পাপোষ, গালিচা, ব্রাশ, গদি, জাজিম ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এদেশে নারিকেলের আঁশের রশি, কাতা (Coir) অত্যন্ত পরিচিত। এক হাজার নারিকেলের ছোবড়া থেকে ৭৫-১০০ কেজি আঁশ পাওয়া যায়।

৬. **নির্মাণ সামগ্রী :** গাছের কাণ্ড, গৃহনির্মাণ সামগ্রী ও নৌকা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের মালা থেকে হুক্কা, গয়না, চামচ, পেয়ালা তৈরি হয়। পাতা দ্বারা মাদুর তৈরি, ঘর ছাউনি, ঝুড়ি বানানো যায়। পাতার মধ্য শিরা বা শলা দ্বারা ঝাঁটা তৈরি করা হয়। অকেজো কাণ্ড, পাতা, মালা, ফুলের ছড়া জ্বালানির কাজে ব্যবহার হয়।

৭. **কাঠ কয়লা :** নারিকেলের খোল বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে কয়লা তৈরি করা হয় তা গবেষণাগারে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। এই কাঠ কয়লা ময়লা শোষণ করে। এজন্য তেল ও গবেষণাগারে ইহা ব্যবহার হয়।

অনুশীলনী-১০

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) নারিকেলের মালা দিয়ে কী কী জিনিস বানানো যায়?

২) কোন দেশে নারিকেলের তেলকে ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

৩) কেন নারিকেল গাছকে কল্পতরু বলা হয়?

৪) নারিকেল বীজ কয়টি অংশে বিভক্ত ও কী কী?

৫) কোন কোন অংশ নিয়ে নারিকেলের ফলত্বক গঠিত?

৬) কোন অংশকে নারিকেলের কার্নেল বলে?

৭) অঙ্কুরোদগমের সময় নারিকেলের ভ্রূণ মূল বৃদ্ধি পেয়ে কী তৈরি করে?

৮) নারিকেলে কতভাগ ডাবের পানি থাকে?

৯) কখন ডাবের পানি মিষ্টি হয়?

১০) ডাবের পানি দ্বারা শরীরের কোন কোন রোগ নিরাময় হয়?

১১) বাংলাদেশে উৎপাদিত নারিকেলের কত ভাগ ডাব হিসেবে খাওয়া হয়?

১২) নারিকেল থেকে কী কী খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়?

১৩) ফিলিপাইনে নারিকেলের দুধ থেকে কী তৈরি করে?

১৪) ডাবের পানি কোন ঔষধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

১৫) নারিকেলের প্রতি ছড়া থেকে বছরে কত লিটার রস পাওয়া যায়?

১৬) কোপ্রা মানে কী?

১৭) কোপ্রা কয় ধরনের ও কী কী?

১৮) ১০০০টি নারিকেল থেকে কত কেজি কোপ্রা পাওয়া যায়?

১৯) নারিকেলের তেল কীভাবে আহরণ করে?

২০) ঘানি দ্বারা তেল নেওয়ার পর খৈলে কতভাগ তেল থাকে?

২১) প্রধান নারিকেল রপ্তানিকারক দেশ কোনগুলো?

২২) নারিকেলের আঁশ থেকে কী কী দ্রব্য পাওয়া যায়?

২৩) ১০০০টি নারিকেলের ছোবড়া থেকে কত কেজি আঁশ পাওয়া যায়?

২৪) নারিকেলের কাঠকয়লা কী কী কাজে লাগে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) নারিকেল গাছের পরিচিতি ও ব্যবহার লেখ।

২) নারিকেল চিত্র এঁকে নারিকেল বীজের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে দেখাও।

৩) নারিকেল বীজের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।

৪) ডাবের পুষ্টিমাণ বর্ণনা কর।

৫) নারিকেল থেকে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য ও নির্মাণ সামগ্রীর নাম লেখ।

৬) নারিকেলের কার্নেল ও দুধ থেকে কী কী খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়?

৭) কোপ্রা কী? এর পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

৮) নারিকেল তেল আহরণ ও ব্যবহার বর্ণনা কর।

৯) নারিকেলের ছোবড়া কী কাজে লাগে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১) নারিকেলের ব্যবহার, গঠন ও পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

২) নারিকেল থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যগুলোর বর্ণনা কর।

৩) নারিকেলের বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্যের বর্ণনা দাও।

অধ্যায়-১১

নারিকেল সহযোগে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য

ভূমিকা : নারিকেল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে নারিকেল কোরা বা নারিকেলের দুধ যোগ করে খাদ্যকে আকর্ষণীয়, সুস্বাদু ও গুণেমানে উন্নত করা যায়। আমাদের দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল যথা নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর. লক্ষ্মীপুর, ভোলা, সন্ধীপ, কক্সবাজার ও সাতক্ষীরা ইত্যাদি অঞ্চলে খাবারের সাথে নারিকেল যোগ করা ঐতিহ্যের ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন দেশীয় অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণে নারিকেলের সন্দেশ, পিঠা, পায়েস, ক্ষীর ও অন্যান্য মিষ্টান্ন ব্যাপক হারে ব্যবহার হয়ে থাকে। কনফেকশনারি দ্রব্যাদি তৈরিতে নারিকেলের প্রয়োজন হয়। নিম্নে নারিকেল সহযোগে কিছু খাবারের নাম দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	মিষ্টি খাবার	ঝাল খাবার
১	নারিকেলের চিড়া	নারিকেল ভাত
২	নারিকেল পুলি	নারিকেল দুধে মুরগি
৩	নারিকেল পুলি ক্ষীর	নারিকেল চিংড়ি
৪	নারিকেল পুরি	নারিকেল পোলাও
৫	নারিকেল হালুয়া, বরফি	নারিকেল সবজি
৬	নারিকেল পুডিং	নারিকেল কুমড়া
৭	নারিকেল নাড়ু	শসা নারিকেল
৮	নারিকেল শন	নারিকেল ইলিশ
৯	নারিকেল প্যান কেক	নারিকেল কচু
১০	নারিকেল মিঠাই	নারিকেল দিয়ে মুগ ডাল
১১	কোকোনাট জেলি	

১১.১ নারিকেল সবজি খাবার

এ খাবার তৈরিতে নিম্নলিখিত সবজিগুলো লাগবে যেমন– চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, ডাঁটা, চিচিঙ্গা, বরবটি, আলু ও মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

১. কয়েকটি সবজি মিলে - ১ কেজি
২. ছোট নারিকেল - ১টি
৩. পেঁয়াজ - ৫/৬টি
৪. তেল - ৫০ গ্রাম
৫. তেজপাতা - ২/৩টি
৬. টকদই - অর্ধেক কাপ
৭. চিনি - অর্ধেক চা চামচ
৮. লবণ - পরিমাণমতো
৯. হলুদ, মরিচ, জিরা - পরিমাণমতো

রান্না করার নিয়ম : প্রয়োজনমতো সবজি কুটে টুকরো টুকরো করে নিতে হবে। চুলায় আন্দাজমতো পানি বসাতে হবে। পানি ফুটে উঠলে লবণ ও হলুদ পরিমাণমতো দিতে হবে। সবজিগুলো ঐ পানিতে সিদ্ধ করে নিতে হবে। নারিকেল ভেঙে দুইটি অংশের একটি নারিকেলের কোরার সাথে মরিচ, পেঁয়াজ ও জিরা দিয়ে বেটে রাখতে হবে। বাকি নারিকেল কুরিয়ে আলাদা রাখতে হবে। সবজিগুলো সিদ্ধ হলে তাতে বাটা মসলা, টকদই, তেল ও তেজপাতা দিয়ে ভাল করে নেড়ে দিতে হবে। নামাবার আগে বাকি নারিকেল কোরা দিয়ে ঢেকে নামাতে হবে। গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

১১.১ নারিকেল মুরগির গ্রিল

গ্রিল : ইলেক্ট্রিক মেশিন বা ওভেনে সরাসরি জোরালো উত্তাপে রান্না করাকে গ্রিল বলে। ধোঁয়াবিহীন কাঠকয়লার আঁচেও গ্রিল করা যায়। গ্যাসের চুলার মাধ্যমেও এই গ্রিল করা যায়। কচি মাংস ছোট ছোট টুকরা করে এই গ্রিলে রান্না করা হয়।

গ্রিল করার উপকরণ :

১)	মুরগি	-	১টি (২৫০ গ্রাম)
২)	কিকিমন সস	-	১ চা চামচ
৩)	নারিকেলের দুধ	-	১.৫ চা চামচ
৪)	অস্টার সস	-	০.৫ চা চামচ
৫)	আদা পেস্ট	-	০.৫ চা চামচ
৬)	রসুন পেস্ট	-	০.৫ চা চামচ
৭)	চিনি	-	১ চা চামচ
৮)	চাইনিজ সস	-	০.৫ চা চামচ
৯)	সাদা গোলমরিচ	-	০.২৫ চা চামচ
১০)	বাটার	-	০.২৫ চা চামচ
১১)	সরিষার তেল	-	পরিমাণমতো

চিত্র : গ্রিল রান্নার মেশিন

রান্নার প্রণালি : মুরগিকে টুকরা টুকরা করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এবার উপরোক্ত উপকরণ গুলো দিয়ে (সরিষার তেল বাদে) মুরগির টুকরাগুলো ভালোভাবে মেখে ৩০ মিনিট ম্যারিনেট করতে হবে। ম্যারিনেট অর্থ মসলা দিয়ে মেখে ডুবিয়ে রাখা। এরপর এক এক পিস মুরগির মাংস রডের সাথে গেঁথে গ্রীল মেশিনে অল্প আঁচে ৩০ মিনিট ভেজে তুলতে হবে। এভাবেই গ্রিল তৈরি হবে।

১১.৩ ও ১১.৪ নারিকেলের চিড়া ও শন :

নারিকেলের চিড়া : ২-৩ সেন্টিমিটার করে লম্বা লম্বা নারিকেলের শাঁস ছুরি দিয়ে তুলে নিতে হবে। তারপর তা ধুয়ে চিকন চিকন করে ছুরি বা স্লাইসার বা কাটার দিয়ে কেটে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে

ডুবো তেলে নারিকেলের ছোট ছোট পাতলা টুকরো গুলো তারের জালিতে করে বাদামি করে ভেজে নিতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায়। ঠাণ্ডা হলে পলিব্যাগে ভরে প্যাক করে নারিকেলের চিড়া বাজারজাত করতে হবে।

চিত্র : নারিকেলের চিড়া

নারিকেল শন : প্রথমে নারিকেল সমান দুই ভাগে ভেঙ্গে পানি বের করে একটি পাত্রে রাখতে হয়। তারপর ছুরি বা কাটার দিয়ে নারিকেলের লম্বা ও বেশ সরু ও চিকন করে কোরাতে হবে। পরিমাণমতো কোরানো নারিকেল কড়াইতে নিয়ে চিনি, ফুড কালার ও নারিকেলের পানি একত্রে মিশাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, রং যেন হালকা ও উজ্জ্বল হয়। চুলায় কড়াই জ্বাল দিলে যখন চিনি আঠানো হয়ে আসে তখন চুলা থেকে নামাতে হবে। দুই হাতে কাটা চামচ দিয়ে কড়াই থেকে নারিকেল তুলে ট্রেতে থোকায় থোকায় সাজাতে হবে। তারপর নারিকেলের শন রোদে শুকিয়ে পলিব্যাগে প্যাক করে বাজারজাত করা হবে।

১১.৫ নারিকেলের নাড়ু, বরফি ও সন্দেশ :

নারিকেলের নাড়ু : নাড়ু তৈরির জন্য বড় নারিকেল একটি, আখের গুড় বা গুঁড়া করা পাটালি গুড় ২৫০ গ্রাম, ৪টি ছোট এলাচে খোসাসুদ্ধ গুঁড়ো করে নিতে হবে। নারিকেল কুরায়ে গুড় দিয়ে মেখে কড়াইতে জ্বালে বসাতে হবে। জ্বাল দেওয়ার একটু পরই নারিকেল থেকে দুধ বের হলে মিশ্রণগুলো চটচট করবে। মিনিট দশেক রান্না হবার পর নারিকেল থেকে সুঘ্রাণ বেরোবে। তখন নামিয়ে এলাচ গুঁড়া দিয়ে গরম থাকতে থাকতে হাত দিয়ে গোল করে নাড়ু পাকাতে হবে। বেশি ঝরঝরে হয়ে গেলে নাড়ু পাকানো যাবে না। তখন আরেকটু গুঁড় দিয়ে এক মিনিট জ্বাল দিতে হবে। একটি নারিকেল থেকে ৫০/৬০টি নাড়ু তৈরি করা যায়।

চিত্র : নারিকেলের নাড়ু

চিত্র : নারিকেলের সন্দেশ

নারিকেলের সন্দেশ : নারিকেল মিহি করে বাটা ২ কাপ, মাওয়া গুঁড়া ১ কাপ, পাটালি গুড় ১ কাপ, গুড়া চিনি ১ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, এলাচ গুঁড়া আধা চা চামচ দিয়ে এই সন্দেশ তৈরি করা হয়। প্রথমে মাওয়া গুঁড়া ও গুঁড়া দুধ এক সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে হয়। গুঁড়া করা চিনি, গুড়, নারিকেল বাটা ও এলাচ দিয়ে মাখিয়ে ১ ঘন্টা ঢেকে রাখতে হয়। তারপর মাঝারি আঁচে চুলায় দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে হয়। দলা বেঁধে আঠালো হয়ে এলে মিশ্রিত মাওয়া গুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নামাতে হয়। বড় ডিশে ঘি মাখিয়ে সন্দেশ ঢেলে দিয়ে আধা ইঞ্চি পুরু ও সমান করে পেস্তাবাদাম ও কিশমিশ বিছিয়ে রাখতে হয়। অল্প গরম থাকা অবস্থায় সন্দেশ চারকোনা করে কাটতে হয়।

নারিকেল বরফি : নারিকেল কুরিয়ে মিহি করে বেটে দুই কাপ মেপে নিতে হবে। নারিকেল বাটার সাথে ২ কাপ চিনি, ১ টেবিল চামচ ঘি, ২ টেবিল চামচ চালের গুঁড়া, ময়দা বা সুজি, পরিমাণমতো এলাচ গুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে চুলায় মৃদু আঁচে বসাতে হয়। অনেকক্ষণ মৃদু আঁচে রেখে ঘনঘন নাড়তে হয়। আঠালো হয়ে এলে যখন হাঁড়ির তলা ছেড়ে আসবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে রুটি বেলার পিঁড়িতে ঢালতে হয়। আধা ইঞ্চি পুরু করে বেলে সমান করে গরম থাকা অবস্থায় বরফি কেটে নিতে হয়। ৪/৫ ঘন্টা পর ঠাণ্ডা হলে বরফি জমে।

১১.৬ নারিকেল দুধ ও কচুর তরকারি :

প্রয়োজনীয় উপকরণ : নারিকেলি জাতের কচু ১টি (২৫০ গ্রাম), নারিকেল দুধ ১ কাপ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, জিরা, কাঁচা মরিচ, ধনিয়া ও সয়াবিন তেল পরিমাণমতো।

রান্নার প্রণালি : প্রথমে কচু ছিলে তা ছোট ছোট টুকরা করতে হবে। তারপর কড়াইতে পানি চাপিয়ে কচুর টুকরাগুলো চাপিয়ে দিতে হবে। ৫ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর পানি ফুটে উঠলে ঐ পানি ছেঁকে ফেলে দিতে হবে। তবে অন্য কচু হলে ৩/৪ বার জ্বাল দিয়ে পানি ফেলে দিতে হয়। কড়াইতে তেল গরম করে সকল মসলা দিয়ে নাড়তে হবে। মসলা কসানো হলে কচু ও নারিকেলের দুধ দিতে হবে। হালকা আঁচে রেখে দিয়ে ১৫-২০ মিনিট পর পানি কমে গেলে সুগন্ধ বের হবে। এরপর পরিবেশন করা যাবে।

১১.৭ নারিকেলের পুডিং তৈরি :

নারিকেলের পুডিং : আধখানা নারিকেল কোরা, ২০০ গ্রাম চিনি, সুজি ৫০০ গ্রাম, ডিম ২টি, ২ টেবিল চামচ মাখন বা বাদাম তেল পুডিং তৈরিতে প্রয়োজন হয়। মাখন ও সুজি একত্রে মিশিয়ে ভালো করে ফেটাতে হয়। ডিমের হলুদ অংশ আলাদা ফেটিয়ে নিয়ে মিশাতে হয়। ডিমের সাদা অংশ একটু পানি দিয়ে খুব ফেনা করে মেশাতে হয়। তারপর ঐ মিশ্রণের সাথে মিশাতে হয়। একই সাথে কিছু সুগন্ধি এসেন্স নিয়ে একটি চ্যাপ্টা পাত্রে মাখন বা তেল মাখিয়ে মিশ্রণ ঢেলে দিতে হয়। উপরে কিশমিশ, বাদাম সাজিয়ে দিয়ে মাঝারি আঁচে আধা ঘন্টা বেক করলে পুডিং তৈরি হয়।

১১.৮ নারিকেল চিংড়ি ও নারিকেল ইলিশ :

নারিকেল দুধে ইলিশ : এই রান্নার জন্য ৪০০ গ্রাম ইলিশ মাছ, ১টি কাগজি লেবু, ২টি নারিকেল, ২টি বড় ও ১০টি ছোট পেঁয়াজ, ১ টুকরা আদা, ১টি শুকনা মরিচ, ১২৫ গ্রাম ঘি, ২টি কাঁচা মরিচ, ২টি ছোট এলাচ, ১ টুকরা দারুচিনি ও ২টি লবঙ্গ নিতে হবে।

প্রথমে ইলিশ মাছ টুকরা টুকরা করে কেটে নিতে হবে। লেবুর রস বের করে নিতে হবে। নারিকেল কুরে ২৫০ মি.লি. গরম পানিতে দিয়ে দুধ বের করে নিতে হবে। ১০টি পেয়াঁজ কুচি কুচি করে কাটতে হবে। ২টি বড় পেঁয়াজ, আদা, শুকনা মরিচ, মিহি করে বেটে নিতে হবে। ডেকচিতে ঘি গরম করে কাঁচা মরিচ, কুচানো পেঁয়াজ ও গরম মসলা দিয়ে লালচে করে ভেজে নিয়ে লবণ দিতে হবে। তারপর বাটা মসলা দিয়ে ৫ মিনিট নেড়ে অল্প অল্প নারিকেল দুধের ছিট দিয়ে কষাতে হবে। মসলা লাল হয়ে এলে বাকি নারিকেল দুধ ও মাছের টুকরা দিতে হয়। সিদ্ধ হয়ে গেলে লেবুর রস দিয়ে নামাতে হবে।

নারিকেল চিংড়ি : নারিকেল চিংড়ি রান্নার জন্য বাগদা বা কিছু বড় কুচো চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, অর্ধেক নারিকেলের কুরানো অংশ, মরিচের বাটা ৩ টেবিল চামচ, রসুন ১টি বড়, তেঁতুল গোলা ২৫ মি.লি. লিটার, কাঁচা মরিচ ১০ গ্রাম, তেল ৩০ মিলি লিটার, লবণ, হলুদ ও কারি পাতা পরিমাণমতো। প্রথমে চিংড়ি ধুয়ে নিতে হবে। রসুন ছিলে ছেঁচে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম হলে রসুন ফোঁড়ন দিয়ে হালকা রঙ ধরলে নারিকেল কোরা দিতে হবে। তেল কষে ভাজা গন্ধ বের হলে হলুদ মাখিয়ে চিংড়ি ছেড়ে দিতে হবে। পরিমাণ মতো লবণ দিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে কম আঁচে রেখে দিতে হবে। মিনিট পাঁচেক পর কাঁচা মরিচ দিতে হবে। রস কমে এলে পরিবেশন করা যাবে।

১১.৯ নারিকেলের ক্যান্ডি বা চকলেট :

ক্যান্ডি বা চকলেট ২ ধরনের। যথা-

১) শক্ত ক্যান্ডি (Hard Candy) - চকলেট

২) নরম ক্যান্ডি (Soft Candy) - ফ্রুট ক্যান্ডি

ফ্রুট ক্যান্ডি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও কন্দাল (Tuber) সবজি থেকে তৈরি ১ ধরনের শুষ্ক মিষ্টি খাদ্য।

শক্ত ক্যান্ডি বা চকলেট হচ্ছে ফল বা সবজিকে টুকরো টুকরো করে ঘন চিনির দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে তারপর সোলার ড্রায়ার বা যান্ত্রিক ড্রায়ারে শুকানো হয়। যদি উৎপাদন প্রক্রিয়া সঠিক থাকে এবং বায়ুরোধী করে সিল করা হয় তবে এই ক্যান্ডি বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজন হলে প্রিজারভেটিভ, রং ও সুগন্ধি ব্যবহার করা যায়।

নারিকেলের ক্যান্ডি তৈরির উপকরণ :

১. ভাতের মল্ট	৫. সাইট্রিক এসিড
২. গ্লুটেন	৬. বাদাম
৩. নারিকেলের কোরা	৭. র‍্যাপিং কাগজ
৪. চিনি	৮. পলিব্যাগ

নারিকেল ক্যান্ডি প্রস্তুতকরণ :

১) প্রথমে গ্লুটেন যুক্ত ভাতের মল্ট তৈরি করে নিতে হবে।

২) এরপর নারিকেলের শাঁস বা কোরা পিষে দুধ বের করে নিতে হবে।

৩) ক্যান্ডি তৈরির জন্য ৫০ ভাগ নারিকেলের দুধ, ২৫ ভাগ চিনি ও ২৫ ভাগ ভাতের মল্ট মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে চুলায় তাপ দিয়ে দ্রবীভূত করতে হবে।

৪) মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামাবার পূর্বে সাইট্রিক এসিড দিয়ে মিশ্রিত করে পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।

৫) এখন মিশ্রণটির সাথে পরিমাণমতো বাদাম যোগ করে সমস্বত্ব মিশ্রণ তৈরির জন্য পুনরায় জ্বাল দিতে হবে।

চিত্র : নারিকেলের ক্যান্ডি

৬) এই মিশ্রণটি নামিয়ে ঠাণ্ডা করে ক্যান্ডি তৈরির মোল্ড বা খাঁজে রেখে উপরিভাগ মসৃণ তৈরি করতে হবে।

৭) ছুরি দিয়ে ২/২ সেন্টিমিটার আকারে কেটে র‍্যাপিং কাগজে মুড়ে পলিপ্রপাইলিন ব্যাগে স্বাভাবিক তাপে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮) এভাবে প্রস্তুতকৃত ক্যান্ডি ৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

অনুশীলনী-১১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আমাদের দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে কোন কোন এলাকা অবস্থিত?

২. নারিকেল সহযোগে কয়েকটি মিষ্টি খাবারের নাম লেখ।

৩. গ্রিল বলতে কী বুঝায়?

৪. ওভেন ছাড়া আর কীভাবে গ্রিল রান্না করা যায়?

৫. গ্রিল রান্নায় কী কী সস দিতে হয়?

৬. ম্যারিনেট অর্থ কী?

৭. কী দিয়ে নারিকেলের চিড়া কাটতে হয়?

৮. নারিকেলের শন তৈরির সময় কী খেয়াল করা উচিত?

৯. মিশ্রণ শুকানোর কারণে নাড়ু পাকানো না গেলে কী করতে হয়?

১০. উপকরণের দিক দিয়ে নারিকেলের সন্দেশ ও বরফির মধ্যে পার্থক্য কী?

১১. ক্যান্ডি কত প্রকার ও কী কী?

১২. শক্ত ক্যান্ডি বা চকলেট বলতে কী বুঝায়?

১৩. ক্যান্ডি তৈরির মিশ্রণে নারিকেল দুধ, চিনি ও ভাতের মল্ট মিশ্রণের অনুপাত কত?

১৪. ক্যান্ডিতে বাদাম দিয়ে কী করতে হয়?

১৫. ক্যান্ডি কাটার দিয়ে কোন আকৃতিতে কেটে প্যাকেটজাত করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নারিকেলের ঝাল ও মিষ্টি খাবারের নাম লিখ।

২. নারিকেল মুরগির গ্রিল তৈরিতে কী কী উপকরণ লাগে?

৩. নারিকেলের চিড়া তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. নারিকেলের নাড়ু তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. নারিকেলের বরফি ও সন্দেশ তৈরির উপকরণগুলো কী কী?

৬. নারিকেলের পুডিং কীভাবে তৈরি করে বর্ণনা কর।

৭. নারিকেল দুধে ইলিশ কীভাবে রান্না করে?

৮. নারিকেলের ক্যান্ডি তৈরির উপকরণগুলো কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. নারিকেল মুরগির গ্রিল ও নারিকেল সবজি খাবার তৈরির উপকরণ ও প্রণালি বর্ণনা কর।

২. নারিকেলের চিড়া, শন, নাড়ু, বরফি ও সন্দেশ তৈরির উপকরণ ও প্রণালি বর্ণনা কর।

৩. নারিকেল ইলিশ, নারিকেল চিংড়ি ও নারিকেল কচু রান্না পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. নারিকেল পুডিং ও নারিকেল ক্যান্ডির উপকরণ ও তৈরি প্রণালি বর্ণনা কর।

ব্যবহারিক (২য় পত্র)

১. মাশরুমের বিভিন্ন অংশ ও জাতের পরিচিতি লাভ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মাশরুম একপ্রকার নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদ। এটি ছত্রাকের অন্তর্ভুক্ত। এতে সবুজ কণা নেই বিধায় উদ্ভিদের মতো এরা নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। সে কারণে এরা খাদ্যের জন্য প্রাণিজ বা উদ্ভিদজ বস্তুর উপর নির্ভরশীল। ছত্রাকের উঁচু ও নিচু স্তর রয়েছে। মাশরুম উঁচু স্তরের ছত্রাক। আমরা যে মাশরুম খাই তা মাশরুমের ফ্রুটিং বডি বা ফুল। এই ফুলই হচ্ছে মাশরুমের খাবার অংশ। এটিই আমরা রান্না করে খেয়ে থাকি। এটি চারটি অংশে বিভক্ত।

যথা- ক) পিলিয়াস

খ) জিল বা ল্যামেলি

গ) আবরণ বা ভিল এনুলাস।

ঘ) স্ট্রাইপ বা ডাঁটা ।

উপকরণ : কিছু তাজা মাশরুম, নিডল, চিমটা, বড় ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস, পেন্সিল, কাগজ ও রাবার।

মাশরুমের বিভিন্ন অংশ জাত সম্পর্কে পরিচিত লাভ করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

১. কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির ও বয়সের মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

২. মাশরুমের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে।

৩. টুপির মতো ছড়ানো অংশকে পিলিয়াস বলে।

৪. টুপি বা ছাতার নিচের অংশকে ভিল বলে। এখানে মাশরুমের বংশ বিস্তারের বীজ বা স্পোর থাকে।

৫. মাশরুমের ভিল বা আবরণ চিহ্নিত করতে হবে।

৬. মাশরুমের দণ্ড বা ডাঁটা চিহ্নিত করতে হবে।

৭. বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য আতশি কাঁচ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮. মাশরুমের বিভিন্ন অংশের ছবি বড় সাইজের ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে হবে।

৯. বিভিন্ন জাতের মাশরুম যেমন– ঝিনুক মাশরুম, দুধ মাশরুম, খড় মাশরুম, রেইসি মাশরুম, বাটন মাশরুম, শিতাকে মাশরুম ও কান মাশরুম ইত্যাদি চিহ্নিত করতে পারবে।

ওয়েস্টার

বাটন

ঋষি

মিল্কি হোয়াইট

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার মাশরুমের ছবি।

সতর্কতা :

১. মাশরুম তাজা হতে হবে।

২. পরীক্ষণের সময় ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিতে হবে।

২. মাশরুম শুকানো পদ্ধতি অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মাশরুম তাজা অবস্থায় খাওয়া ভালো, তবে উৎপাদন বেশি হলে ফ্রিজে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত অনায়াসে রাখা যায়। রোদে শুকিয়ে নিয়ে মাশরুম দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। শুকানো মাশরুম প্যাকেজিং ও পরিবহন সুবিধা হয়। তাজা মাশরুমে ৭০-৯৫% পানি থাকে শুকানো মাশরুমে পানির পরিমাণ ১০-১২% এর মধ্যে নেমে আসে। সোলার ড্রায়ার ব্যবহার করে মাশরুম সহজেই শুকানো যায়।

উপকরণ : তাজা মাশরুম, ট্রে, লবণ, পলিব্যাগ, সোলার ড্রায়ার, ছুরি, পাত্র, চুলা ইত্যাদি। মাশরুম শুকানোর পদ্ধতি জানতে হলে নিম্নের ধাপগুলোর অনুসরণ করতে হবে।

১. প্রথমে মাশরুমের বেড বা স্পন থেকে পুষ্ট মাশরুমগুলো ধারালো ছুরি দিয়ে সাবধানে কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

২. একটি পত্রে পানি নিয়ে চুলার জ্বাল দিয়ে পানি ফুটিয়ে লবণ দিয়ে ২% দ্রবণ তৈরি করতে হবে।

৩. লবণ মিশ্রিত গরম পানিতে মাশরুমগুলো ৩ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৪. এরপর সব মাশরুমগুলো তুলে ট্রেতে রেখে ঠাণ্ডা করতে হবে।

৫. ট্রেতে মাশরুম এমনভাবে সাজিয়ে রাখুন যাতে একটি মাশরুম অন্যটির উপর না থাকে।

৬. ৩-৪ দিন মাশরুমগুলো রোদে শুকাতে হবে।

৭. মাশরুম শুকালে শুকনো পাতার মতো মচমচে হয়ে যাবে। এরূপ শুকানো মাশরুম ১ বছর পর্যন্ত ভালো থাকে।

৮. এবার পলিথিন ব্যাগে ভরে মুখ সিল করে দিতে হবে।

৯. শুকানো মাশরুম ঠাণ্ডা জায়গায় আলোবিহীন স্থানে মোটা কাপড়ে ঢেকে রাখতে হবে।

১০. সাধারণত প্রায় ২ কেজি কাঁচা মাশরুম শুকিয়ে ১ কেজি শুকনা মাশরুম পাওয়া যায়।

১১. মাশরুম খাওয়ার পূর্বে হালকা গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখলে তা পূর্বের তাজা মাশরুমের মতো অবস্থায় আসবে।

মাশরুম শুকানোর ফ্লো-চার্ট

মাশরুম শুকানোর পদ্ধতি অনুশীলন করা

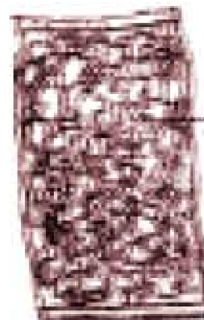

চিত্র : মাশরুম শুষ্কীকরণ

সতর্কতা :

০১. পলিব্যাগ বায়ুরোধী থেকে হবে।

০২. মাশরুম ভালোভাবে না শুকালে তা বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না।

৩. মাশরুম ফ্রাই ও স্যুপ তৈরি অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মাশরুম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাশরুমের বিকল্প নেই। মাশরুম খাওয়ার মাধ্যমে দেশ থেকে আমিষের ঘাটতি দূর করা, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এক হিসাব মতে জানা যায় যে, গো মাংসের জন্য গবাদি পশু চাষ এবং পুকুরে মাছ চাষের তুলনায় অনেক কম খরচে ও কম শ্রমে মাশরুম চাষের দ্বারা বিপুল পরিমাণে আমিষ উৎপাদন সম্ভব।

মাশরুম ফ্রাই :

উপকরণ

১	তাজা মাশরুম	১০০ গ্রাম (শুকনো ২৫ গ্রাম)
২	ডিম	১ টি
৩	ময়দা বা বেসন	২ টেবিল চামচ
৪	লবণ, গোলমরিচ গুঁড়া, আদা বাটা ও সয়াবিন তেল	পরিমাণমতো
৫	চালের গুঁড়া বা সুজি	$\frac{১}{৪}$

স্যুপ

ফ্রাই

মাশরুম ফ্রাই তৈরি করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. মাশরুম ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ছাড়িয়ে নিতে হবে।

২. একটি পাত্রে ডিম ভেঙে নিতে হবে।

৩. তারপর তাতে বেসন, চালের গুঁড়া, আদা বাটা, লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া পরিমাণমতো দিতে হবে।

৪. এরপর এতে পানি দিয়ে ঘন করে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে।

৫. মিশ্রণে মারুমের টুকরোগুলো ঢেলে দিতে হবে।

৬. কড়াইতে তেল গরম হলে ঘন মিশ্রণে মিশানো মাশরুমের টুকরোগুলো ডুবো তেলে অল্প আঁচে বাদামি করে ভেজে তুলতে হবে।

৭. গরম অবস্থায় সসসহ পরিবেশন করতে হবে।

সর্তকতা :

১. মাশরুম হালকা আঁচে ভাজতে হবে।

২. মাশরুম ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

মাশরুম স্যুপ

প্রসঙ্গিক তথ্য : এটি পুষ্টিকর আমিষসমৃদ্ধ স্যুপ। এটি সস্তা ও সহজে তৈরি করা যায়। পরিবারের শিশু ও বয়স্কদের জন্য এই স্যুপ উপাদেয়।

১	মুগডাল	১২৫ গ্রাম
২	মশুর ডাল	২৫০ গ্রাম
৩	ছোলার ডাল	১২৫ গ্রাম
৪	তাজা মাশরুম	৫০০ গ্রাম (শুকনা হলে ৫০ গ্রাম)
৬	পেঁয়াজ কুঁচি, আদা, রসুন, জিরার গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, তেজপাতা, লবণ ও পানি	পরিমাণমতো

মাশরুম স্যুপ তৈরি করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. মাশরুম ধুয়ে পানি ছাড়িয়ে কেটে টুকরো করে নিতে হবে।

২. ডালগুলো ধুয়ে পানি ছাড়িয়ে নিতে হবে।

৩. মুগ ডাল সামান্য ধুয়ে নিতে হবে।

৪. চুলায় পাতিল বসিয়ে মুগ, মসুর ও ছোলার ডালে পানি মিশিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করতে হবে।

৫. সিদ্ধ করার সময় ডালের সাথে আদা, রসুন, পেঁয়াজ কুচি ও লবণ ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।

৬. ডাল ঘন না করে পানি দিয়ে পাতলা করতে হবে।

৭. মাশরুমের টুকরোগুলো পেঁয়াজ কুচি ও তেজপাতার সাথে ১-২ মিনিট গরম তেলে হালকাভাবে ভেজে নিতে হবে।

৮. ভাজা মাশরুমগুলো সিদ্ধ করে সিদ্ধ ডালের সাথে মিশিয়ে হবে।

৯. স্যুপ নামানোর পূর্বে সামান্য জিরার গুঁড়া ও গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে গরম অবস্থায় পরিবেশন করতে হবে।

১০. মাশরুমের স্যুপ তৈরিতে ডালের পরিবর্তে সবজি যেমন- ফুলকপি, গাজর, লেটুস পাতা দেওয়া যেতে পারে।

সর্তকতা :

১. ভালোভাবে সিদ্ধ করতে হবে।

২. রান্নার সময় তাপ নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪. মশলা গুঁড়াকরণ ও প্যাকেটজাতকরণ অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : বর্তমান ব্যস্ত জীবনে শুধু শহরে নয়, গ্রামের নারীরাও রান্নার কাজে ব্যবহার করছে গুঁড়া মসলা। সুতরাং দিন দিন বেড়ে চলছে গুঁড়া মসলার চাহিদা। ফলে একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে ব্যবসা। মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদে নানা আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। সেদিক দিয়ে একটি সম্ভাবনাময় ব্যবসার নাম গুঁড়া মসলার ব্যবসা। নানা ধরনের গুঁড়া মসলা বাজারে প্রচলিত আছে। তবে সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন গুঁড়া মসলা হলো হলুদ, মরিচ ও ধনিয়া।

উপকরণ : মসলা ভাঙানোর মেশিন, দাঁড়িপাল্লা, চটের ব্যাগ, পলিব্যাগ ও চামচ, প্লাস্টিকের বোল ইত্যাদি।

মসলা গুড়াঁ করা ও প্যাকেট করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. পরিপক্ব, রোগ ও পোকামুক্ত, উন্নত জাতের ও মানের মসলা যেমন- হলুদ, মরিচ, ধনিয়া সংগ্রহ করতে হবে।

২. হলুদের মধ্যে 'হীরণচোখা' হলুদ গুণগত মান ভালো। মরিচের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল লাল বর্ণের মরিচ ভালো, ধনিয়ার ক্ষেত্রে ধূসর রঙের বড় বড় দানা হতে হবে।

৩. মসলাগুলোর উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট এবং আস্ত অর্থাৎ ভাঙা হবে না এবং সুন্দর গন্ধ দেখে নির্বাচন করতে হবে।

৪. মসলাগুলো সংগ্রহের পরে এগুলো থেকে ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে।

৫. মরিচের বোঁটা ফেলে দিতে হবে। হলুদ ভেঙে দেখতে হবে শুকনা হয়েছে কিনা বা এর গুণগত মান কেমন।

৬. মসলা ভাঙানোর পূর্বে ভালো করে উজ্জ্বল রোদে ২-৩ ঘণ্টা করে দুই দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

৭. মসলা বস্তা বা ব্যাগে ভরে মিলিং মেশিনে বা কলে নিয়ে যেতে হবে। গম ভাঙানোর কলে মসলা উত্তমরূপে ভাঙানো যাবে।

৮. গুঁড়া করা মসলা ঘরে এনে ঠাণ্ডা করতে হবে।

৯. মসলা মেপে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পলিব্যাগে ভরে সিল করে দিতে হবে। (যেমন- ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ইত্যাদি)

১০. তারপর প্যাকেটে লেবেল দিয়ে বাজারজাত করা যাবে।

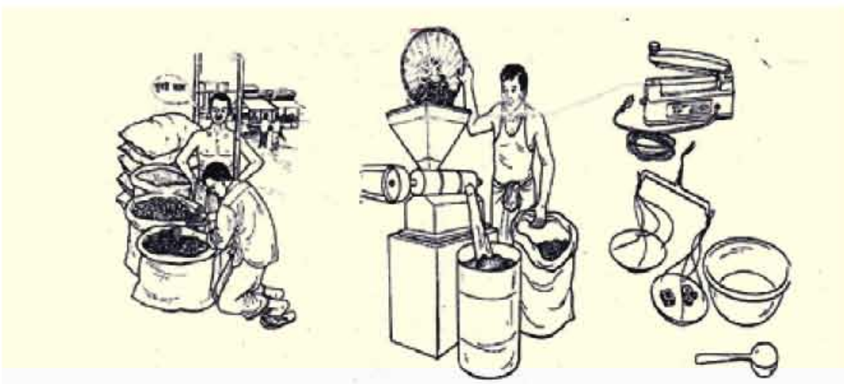

চিত্র : মসলা ক্রয় চিত্র : মসলা ভাঙ্গানো চিত্র : মসলা বিক্রয়

সর্তকতা :

১. মসলা ভাঙানোর পূর্বে রোদে না দিলে মসলার সংরক্ষণ গুণ খারাপ হবে।

২. ভাঙানোর পূর্বে ময়লা ও আবর্জনা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে।

৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্যাকেটে বাজারজাত করতে হবে।

৪. লেবেল সতর্কতার সাথে লাগাতে হবে।

৫. প্যাকেটের মুখ ভালোভাবে সিল করতে হবে।

৬. কোনো প্রকার ভেজাল মসলার সংযোজন করা যাবে না।

৫. রসুনের আচার তৈরি অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : বাংলাদেশে রসুনের আচারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এদেশের রসুনের উৎপাদন সন্তোষজনক। রসুন মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন- হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ও রক্তচাপ ইত্যাদি কাজে সহায়তা করে। অনেকেই কাঁচা রসুন খেতে অভ্যস্ত নয় কিন্তু আচার হিসেবে সহজেই খাওয়া যায়। তাছাড়া এই আচার ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। রসুনের অ্যালিসিন মানুষের শরীরের কোলেস্টেরল কমায়। এছাড়া জৈব বালাইনাশক হিসেবে রসুনের রস দিয়ে বীজ মাখিয়ে বুনলে বীজ বাহিত রোগ দমন হয়।

উপকরণ :

১	রসুনের কোয়া	৪ কেজি
২	সরিষার তেল	১.৫ কেজি
৩	চিনি	২৫০ গ্রাম
৪	লবণ	৫০ গ্রাম
৫	রসুন বাটা	৫০ গ্রাম
৬	আদা বাটা	১০০ গ্রাম
৭	জয়ত্রী গুঁড়া	২০ গ্রাম
৮	মরিচের গুঁড়া	৭৫ গ্রাম
৯	বাটা	২০ গ্রাম
১০	সরিষা দানা	১০০ গ্রাম
১১	কালো জিরা	পরিমাণমতো
১২	জিরা গুঁড়া	৭৫ গ্রাম
১৩	পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট (কেএমএস)	৫ গ্রাম
১৪	অ্যাসিটিক এসিড	৫ গ্রাম

চিত্র : আস্ত রসুন ও রসুনের কোয়া

রসুনের আচার তৈরি করতে হলে নিম্নের ধাপ অনুসরণ করতে হবে :

১. বড় কোয়া বিশিষ্ট ক্রটিমুক্ত রসুন সংগ্রহ করতে হবে।

২. আস্ত রসুন ভেঙে কোয়াগুলো বের করতে হবে।

৩. পানিতে নরম হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হবে এবং পানি ঝরিয়ে তুলো নিতে হবে।

৪. সরিষার তেল সম্পূর্ণ ফুটিয়ে নিতে হবে।

৫. আদা ও রসুন বাটা তেলে যোগ করে নেড়ে অর্ধভাজা করে তার সাথে রসুনের কোয়া যোগ করে নেড়ে মিশাতে হবে ও তাপ দিতে হবে।

৬. তারপর তেল ফোটা শুরু হলে কালিজিরা ও জিরার গুঁড়া বাদে অন্যান্য সব মশলা লবণ ও চিনি যোগ করে অনবরত নাড়তে হবে।

৭. যখন আচারের গন্ধ বের হবে জিরার গুঁড়া ও কালোজিরা যোগ করে নেড়ে ৫-১০ মিনিট পরে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

৮. তারপর অ্যাসিটিক এসিড বা পটাশিয়াম বাই মেটাসালফেট (কেএমএস) দ্রবণ যোগ করে নেড়ে মিশাতে হবে।

৯. আচার থেকে তেল আলাদা করে জীবাণুমুক্ত বোতলের গলা পর্যন্ত ভরে বাকি তেল সেখানে ভরে দিতে হবে।

১০. ছিপি ও লেবেল লাগিয়ে বায়ুরোধী করে বাজারজাত করা যাবে।

সতর্কতা :

১. মসলা যেন পুড়ে না যায়।

২. মাঝে মাঝে রোদে দিলে ছত্রাকের আক্রমণ হবে না।

৬. তালের জ্যাম তৈরি :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : জনসংখ্যা বাড়ছে, বসতবাড়ি তৈরিও রাস্তা ঘাট উন্নয়নের কারণে এর প্রভাব পড়ছে কৃষি জমির উপর। গাছপালা কাটার সাথে সাথে পরিবেশবান্ধব তালগাছও কাটা যাচ্ছে। তাই মৌসুম এলে তালের চাহিদা ও আকর্ষণ বেড়ে যায়। ফলের জ্যাম ও জেলি হচ্ছে প্রক্রিয়াজাত আকর্ষণীয়, কমনীয় ও রুচিকর খাদ্য। এ সকল খাদ্য পাউরুটি, বিস্কুট, রুটি ও কেক দিয়ে খেতে বেশ তৃপ্তকর ও মজাদার। অনেকেই তাদের নাস্তার টেবিলে ফ্রুট জ্যামকে একটি আবশ্যক উপাদান করে দিয়েছে। সময়ের সাথে তাল রেখে এসব খাদ্যের প্রতি মানুষ প্রতিনিয়তই অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। সেক্ষেত্রে তালের জ্যাম কিছুটা নতুন সংযোজন।

উপকরণ :

তালের গোলা	১ লিটার
চিনি	১ কেজি
পেকটিন	১১.৫ গ্রাম
সাইট্রিক এসিড	১২.৫ গ্রাম
সোডিয়াম বেনজয়েট	১ গ্রাম
কড়াই ও চালুনি	
চামচ ও পাতলা সুতি কাপড়	
রিফ্রাক্টোমিটার	
কাচের বোতল	

তালের জ্যাম তৈরি করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. প্রথমে গাছপাকা, পরিপুষ্ট, তাল সংগ্রহ করতে হবে।

২. তাল শক্ত হলে ২-৩ দিন রেখে নরম করে নিতে হবে।

৩. তালের খোসা হাত দিয়ে টেনে তুলে নিতে হবে।

৪. তালের কোয়া শক্ত হলে একটু পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে।

৫. একটি বড় পাত্রে তাল নিয়ে হাত দিয়ে কচলে তালের শাঁস হতে রস আলাদা করতে হবে।

৬. সবগুলো কোয়া কচলানো শেষ হলে চালুনি দিয়ে চেলে আঁশগুলো আলাদা করতে হবে।

৭. এখন তালের গোলা একটি পাতলা কাপড়ে ভরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

৮. ৪/৫ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখলে সমস্ত তিতা কষ ঝরে গিয়ে গোলা মিষ্টি হয়ে যাবে।

৯. গোলার সাথে চিনি যোগ করে জ্বাল দিতে হবে। ২০২২

১০. এরপর রান্নার মাঝামাঝি পর্যায়ে পেকটিন যোগ করতে হবে। এরপর দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের (Total Soluble Solids) পরিমাণ কমপক্ষে ৬৫% না হওয়া পর্যন্ত চুলায় জ্বাল দিতে হবে।

১১. দ্রবণে টিএসএস রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা নির্ণয় করা যায়। রিফ্রাক্টোমিটার না থাকলে শিটিং পরীক্ষা করতে হবে।

১২. শিটিং পরীক্ষা হলো- মিশ্রণের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে মিশ্রণ নিয়ে ঠাণ্ডা করে চামচ বেয়ে পড়তে দিতে হবে।

১৩. যদি মিশ্রণটি একাধারে না পড়ে শিটের আকারে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জ্যাম তৈরি হয়েছে। জ্যাম তৈরি হলে সাইট্রিক এসিডের দ্রবণ ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে।

১৪. মিশ্রণ ঘন হয়ে এলেই অল্প পরিমাণ পানিতে সোডিয়াম বেনজয়েট গুলিয়ে মিশ্রণে যোগ করে চুলা হতে নামাতে হবে।

১৫. জ্যাম জীবাণুমুক্ত বোতলে ঢেলে ছিপি এঁটে দিতে হবে।

১৬. ঠাণ্ডা হওয়ার পর মোম গলিয়ে দিতে হবে।

তালের জ্যামের ফ্লো-চার্ট

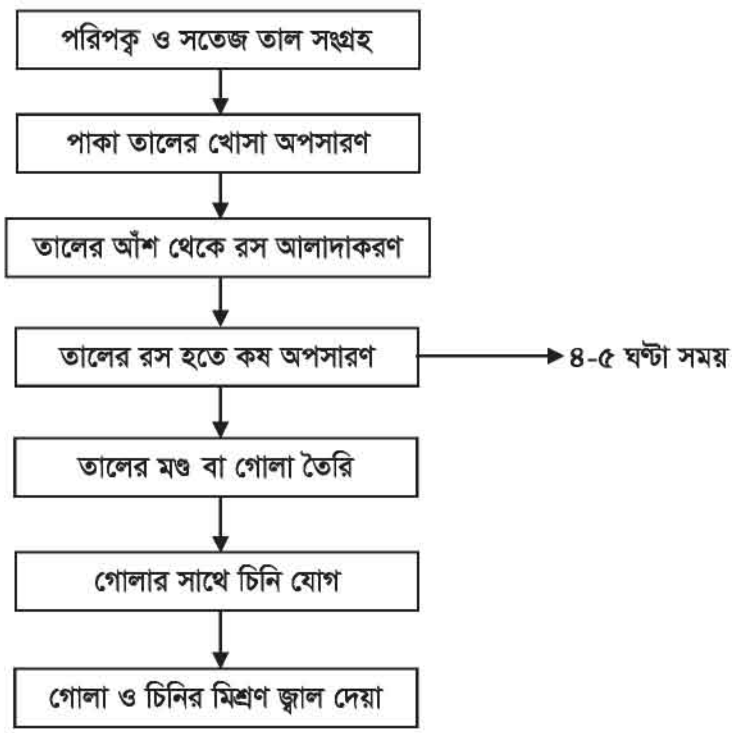

২০২২

টিএসএস পরীক্ষা বা শিটিং পরীক্ষা → রিফ্রাক্টোমিটারের মান-৬৫°

↓

মিশ্রণের সাথে সাইট্রিক এসিড যোগ

↓

সংরক্ষক হিসেবে সোডিয়াম বেনজয়েট যোগ

↓

জীবাণুমুক্ত বোতলে জ্যাম ভর্তি

↓

লেবেলিং ও বাজারজাতকরণ

↓

সংরক্ষণ

সতর্কতা ঃ

১. রিফ্রাক্টোমিটার না থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা শিটিং পরীক্ষা করতে হবে।

২. তালের গোলা হতে তিতা কষ অবশ্যই বের করে নিতে হবে।

৭. নারিকেলের দুধ তৈরির অনুশীলন ঃ

প্রাসঙ্গিক তথ্য ঃ খাদ্যকে আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু করতে নারিকেলের জুড়ি নেই। পরিপক্ক নারিকেলের পানি অপেক্ষা শাঁস অধিকতর সুস্বাদু। নারিকেলের শাঁস থেকে তেল, সন্দেশ, কেক, চকলেট, ক্যান্ডি, পিঠা, চিড়া প্রভৃতি তৈরি করা হয়। কাঁচা শাঁস হতে বিভিন্ন ধরনের পিঠা, পায়েস, নাড়ু, লাড্ডু তৈরি করার রীতি এদেশে বহুল প্রচলিত । কাঁচা শাঁস নিড়ে যে দুধ পাওয়া যায় তা বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সামগ্রী তৈরি এবং সরাসরি পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের দুধ বিভিন্ন খাবারের রান্নায় ব্যবহার হয়। একটি বড় নারিকেল হতে এক কাপ ঘন দুধ বের করা যায়।

চিত্র ঃ নারিকেলের দুধ নিষ্কাশন

উপকরণ ঃ ঝুনা নারিকেল, কুরানি, ব্লেন্ডার, প্লেট, সসপ্যান, ছাঁকনি বা ছাঁকার কাপড়, জগ, গ্লাস, দা ইত্যাদি।

নারিকেলের দুধ তৈরি করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. উন্নতমানের বড় আকারের একটি ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করতে হবে।

২. দা বা বঁটি দিয়ে নারিকেলের ছোবড়া ভালো করে তুলে ফেলতে হবে।

৩. দা দিয়ে নারিকেল ভেঙ্গে ভিতরের পানি সংগ্রহ করতে হবে।

৪. নারিকেল দ্বিখণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড নারিকেল কুরানি দিয়ে কুরিয়ে একটি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. অপর খণ্ডটি পূর্বের মতো কুরাতে হবে।

৬. একটি সসপ্যানে পানি হালকা কুসুম গরম করে সমস্ত কুরানো নারিকেল ঢেলে দিতে হবে।

৭. তারপর ভালো করে কুরানো নারিকেল হাত দিয়ে কচলে অথবা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ডিং করতে হবে এবং পূর্বের সংগ্রহকৃত নারিকেল পানিতে মিশাতে হবে।

৮. কিছুক্ষণ পর ছাঁকনি বা ছাঁকার কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ মিশ্রণটিকে ছেঁকে নিতে হবে।

৯. জগে সম্পূর্ণ নারিকেলের ছাঁকা দুধ নিয়ে তার সাথে পরিমাণমতো চিনি, এসেন্স ও কালার দিয়ে সুস্বাদু পানীয় তৈরি করা যেতে পারে।

১০. অথবা নারিকেলের পরিস্রুত সাদা দুধ দিয়ে বিভিন্ন খাদ্য রান্না করে খাদ্যকে আকর্ষণীয় ও উপাদেয় করা যায়।

১১. ছাঁকার পর যে অংশটুকু থেকে যাবে তা দিয়ে বিভিন্ন পিঠা, বিস্কুট বা কেক তৈরি করা যাবে।

নারিকেল দুধের ফ্লো-চার্ট

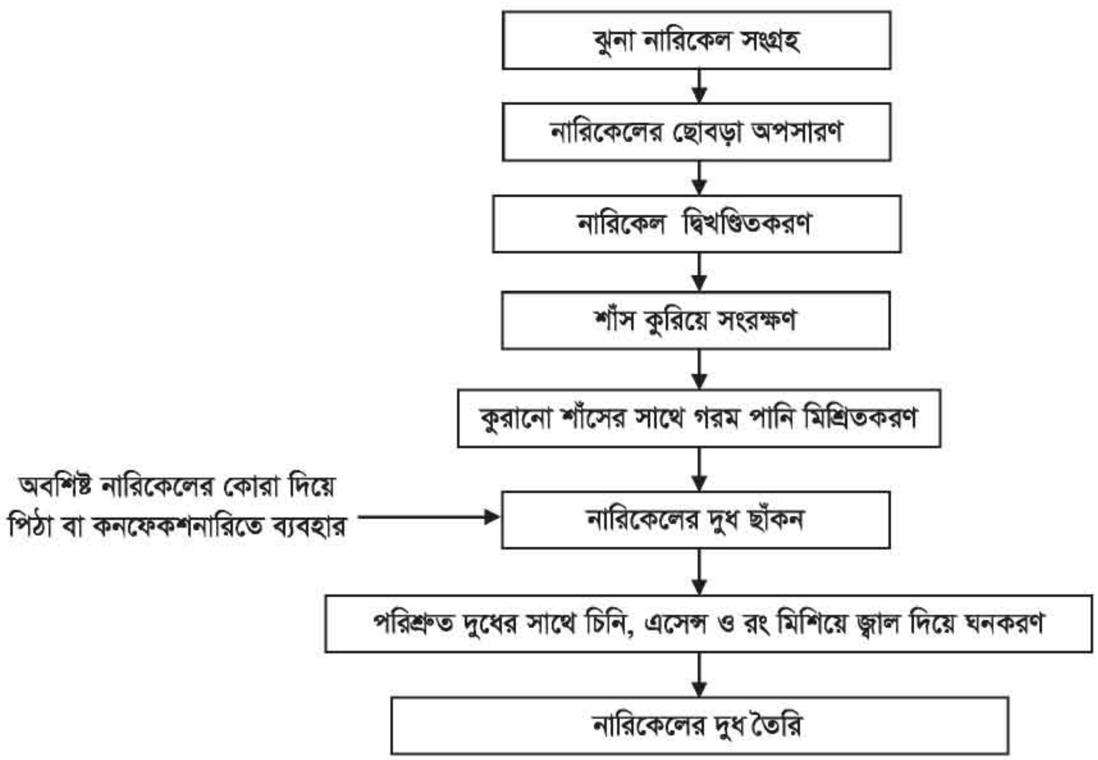

২০২২

সর্তকতা :

১. নারিকেলের দুধ বের করার জন্য পানি কুসুম গরম হতে হবে।

২. শাঁস পুরু ও পরিপক্ব হলে দুধ বেশি ও ঘন হবে।

৮. নারিকেলের দুধ হতে তেল সংগ্রহ অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : নারিকেল একটি উৎকৃষ্ট ফল জাতীয় খাদ্য। শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সব জায়গায়ই এ গাছ জন্মে। নারিকেল গাছের প্রতিটি অংশই মানুষের এত বেশি কাজে লাগে যে কারণে একে স্বর্গীয় বৃক্ষ বা কল্পতরু বলে। নারিকেলের শাঁস অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাবার, যা থেকে নারিকেলের দুধ পাওয়া যায়। এই দুধ দিয়ে বিভিন্ন খাদ্যকে আরো মুখরোচক ও উপাদেয় করে তোলা যায়।

নারিকেলের দুধ হতে আমরা যে তেল পাই তা আমরা ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও সাবান, প্রসাধনী ও লুব্রিকেন্ট প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তবে আমরা রান্নার ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার না করে শুধুমাত্র চুলে মাথার কাজে ব্যবহার করি। অথচ অন্যান্য দেশগুলো যেমন– মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে নারিকেল তেল ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার হয়। দুঃখের বিষয় আমরা সয়াবিন তেল খাই যা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়।

উপকরণ :

১. ঝুনা নারিকেল
২. কুরানি
৩. সসপ্যান
৪. ছাঁকনি
৫. চুলা
৬. দা
৭. ব্লেন্ডার
৮. কড়াই
৯. ফ্রিজার
১০. চামচ

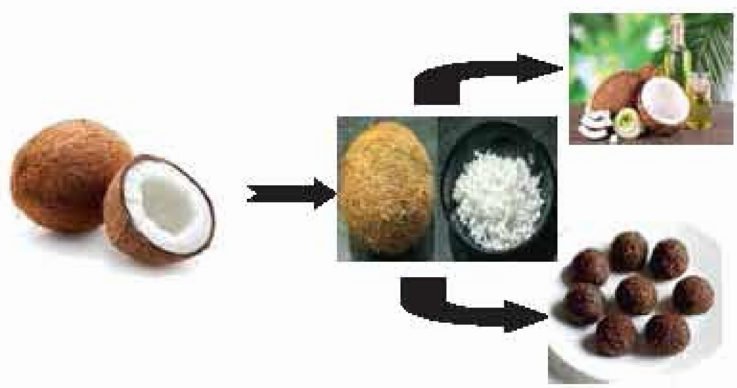

চিত্র : নারিকেল থেকে কোরা, তেল ও নাড়ু তৈরি।

নারিকেল দুধ হতে তেল আহরণের জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. পরিপক্ব একটি ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করতে হবে।

২. নারিকেলটির ছোবড়া সাবধানে অপসারণ করতে হবে।

৩. দা-এর সাহায্যে নারিকেলটি সাবধানে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে।

৪. কুরানি দিয়ে ধীরে ধীরে নারিকেলের কাঁচা শাঁস কুরিয়ে নিতে হবে।

৫. ব্লেন্ডারে সমান্য গরম পানি নিয়ে তাতে সমস্ত নারিকেলের কোরা মিশাতে হবে।

৬. ব্লেন্ডার মেশিন অন করে ২/৩ মিনিট চালাতে হবে।
৭. ছাকনি দিয়ে মিশ্রণ ছেঁকে কোরানো অংশ ও দুধ আলাদা করতে হবে।
৮. অবশিষ্ট কোরানো অংশে কয়েকবার পানি দিয়ে সম্পূর্ণ দুধ চিপে বের করতে হবে।
৯. কড়াইতে দুধ নিয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে অর্ধেক ঘন করতে হবে।
১০. চুলা হতে নামিয়ে সম্পূর্ণ দুধ ঠাণ্ডা করে ফ্রিজারের নিচের অংশে সারাদিন রেখে দিতে হবে।
১১. পরদিন দেখা যাবে যে, পাত্রে নারিকেলের তেল উপরে জমাট বেঁধে আছে।
১২. সাবধানে উপর থেকে তেল বের করে অন্য পাত্রে সংগ্রহ করতে হবে।
১৩. একটু গরম করে ছেঁকে নিলেই সুঘ্রাণযুক্ত নারিকেল তেল পাওয়া যাবে।
১৪. আধা লিটার তেলের জন্য ৫-৬টি মাঝারি আকারের নারিকেলের দুধ নিতে হবে।
১৫. তেল আহরণের পর অবশিষ্ট তলানি স্তর পাওয়া যাবে যা সুঘ্রাণযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য।

৯. নারিকেলের চিড়া ও নাড়ু তৈরির অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : বিভিন্ন রকম মিষ্টান্নে বৈচিত্র্য আনতে, ঐতিহ্যবাহী অতিথি আপ্যায়নে ও পিঠা তৈরিতে নারিকেলের অবদান অপরিহার্য। কনফেকশনারি ও বেকারি জাতীয় শিল্পে নারিকেল ছাড়া চলে না। নারিকেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমিষ, শ্বেতসার, লৌহ, ক্যালসিয়াম ও সামান্য পরিমাণে ভিটামিন বি২ ও সি বিদ্যমান।

নারিকেলের চিড়ার উপকরণ : ঝুনা নারিকেল, দা বা বঁটি, ছুরি বা স্লাইসার, কড়াই, তেল, চুলা, তারের জালি ইত্যাদি।

নারিকেলের চিড়া তৈরিতে নিম্নের ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হয়ঃ

১. একটি পরিপুষ্ট ও বড় নারিকেল সংগ্রহ করতে হবে।
২. দা-এর সাহায্যে নারিকেলের ছোবড়া তুলে ফেলতে হবে।
৩. দা-এর সাহায্যে নারিকেলটি দুই টুকরা করতে হবে।
৪. ছুরি বা স্লাইসারের সাহায্যে ২-৩ সে.মি. লম্বা লম্বা টুকরা করে নারিকেলের শাঁস মালা হতে তুলতে হবে।
৫. স্লাইসারের সাহায্যে লম্বা টুকরাগুলোকে পাতরা পাতলা করে স্লাইস করতে হবে।
৬. স্লাইসগুলো ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।
৭. কড়াইতে তেল গরম করতে হবে।
৮. স্লাইসগুলো পানি ঝরিয়ে তারের জালিতে নিতে হবে।
৯. গরম ডুবো তেলে ভেজে তুলতে হবে।
১০. ঠাণ্ডা হবার পর ছোট ছোট পলিব্যাগে বায়ুরোধী করে সিল করতে হবে।

সতর্কতা :

১. স্লাইসগুলো এমনভাবে করতে হবে যেন ভাজার পর চিড়ার মতো দেখায়।
২. বেশি ভাজা হলে পুড়ে যাবে।

নারিকেলের নাড়ুর উপকরণ : নারিকেল, দা বা বঁটি, কুরানি, চিনি বা পাটালি গুঁড়, এলাচ, কড়াই ইত্যাদি।

নারিকেলের নাড়ু তৈরিতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. চিড়া তৈরির মতো নারিকেল ভেঙ্গে নিতে হবে।

২. কুরানি দিয়ে নারিকেল কুরাতে হবে।

৩. এরপর গুড় মেখে নিতে হবে।

৪. কড়াই চুলায় বসিয়ে কুরা নারিকেল জ্বাল দিতে হবে।

৫. এরপর নারিকেল হতে তেল বের হয়ে গুড় গলে যাবে।

৬. মিনিট দশেক জ্বাল দেবার পর নারিকেলের সুগন্ধ বের হলে কড়াই নামিয়ে নিতে হবে।

৭. নামাবার পূর্বে এলাচ গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হবে।

৮. গরম থাকতে থাকতে নাড়ু পাকাতে হবে।

৯. বেশি শুকিয়ে গেলে আবার একটু গুঁড় দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।

১০. নাড়ু চিনি দিয়েও করা যায়।

সর্তকতা :

১. কড়াইয়ের জ্বাল শেষের দিকে কম আঁচে রাখতে হবে।

২. পাটালী গুঁড় দিয়ে করলে নাড়ুর রং সুন্দর হবে।

১০. ভুট্টা রুটি তৈরি ও চাপাতি তৈরির অনুশীলন ঃ

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ভুট্টার পুষ্টিমান চাল ও গমের সমপর্যায়ের। তবে কোনো কোনো উপাদান চাল ও গমের চেয়েও বেশি। ভুট্টার নানাবিধ খাবারের মধ্যে ভুট্টার খৈ (পপকর্ন) ও কর্ণ ফ্লেক্স সারা বিশ্বের লোকের নিকট সমাদৃত। ভারত ও পাকিস্তানে ভুট্টার আটার রুটি ও চাপাতি খুব প্রচলিত। গমের ময়দার সাথে ভুট্টার ময়দার মিশ্রণ হলে তা পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হয় এবং গমের চাহিদা লাঘব হয়। চাপাতি তৈরির জন্য ভুট্টা ও গমের ময়দা, লবণ, পানি মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করতে হবে। মন্ড নরম হওয়ার জন্য খামির কিছুক্ষণ রেখে দিতে হয়।

উপকরণ ঃ

১.	ভুট্টার ময়দা	৭৫০ গ্রাম	৬. বেলন	১টি
২.	গমের আটা	২৫০ গ্রাম	৭. গামলা	১টি
৩.	লবণ	৫ গ্রাম	৮. পাত্র	১টি
৪.	পানি	পরিমাণমতো	৯. চালনি	১টি
৫.	পিঁড়ি	১টি	১০. চুলা	১টি
১১.	নিক্তি ইত্যাদি।			

ভুট্টার রুটি ও চাপাতি তৈরির করার জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. ভুট্টা ও গমের ময়দা আনুপাতিক হারে মেপে নিতে হবে। এই আনুপাত ৪:১, ২:১ বা ১:১ ভাবে ভুট্টা ও গমের ময়দা হতে পারে।

২. ময়দা চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে।

৩. ভুট্টা ও গমের ময়দা, লবণ ও পানি আস্তে আস্তে একত্রে মিশিয়ে মণ্ড বা খামির তৈরি করতে হবে।

২০২২

৪. ময়দার সাথে একেবারে সমস্ত পানি না মিশিয়ে অল্প অল্প করে মিশাতে হবে। কেননা একসাথে পানি মেশালে খামির নরম হয়ে যেতে পারে। তাবে খামির ডলার সময় শক্ত লাগলে কিছু অতিরিক্ত পানি মিশাতে হবে।

৫. খামির তৈরি হলে কিছু সময় রেখে দিতে হবে।

৬. খামির হাত দিয়ে লম্বা করে একদিকে থেকে টেনে ছোট ছোট বল বানিয়ে রাখেতে হবে।

৭. পিঁড়ি ও বেলনে এই বল হতে রুটি বানিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।

৮. চাপাতি বানানোর জন্য রুটিকে যতদূর সম্ভব বেলে তারপর টেনে টেনে গোল করে বড় করতে হবে। অনেক সময় হাতে নিয়ে বিশেষ কায়দায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বড় করে গরম তাওয়ায় সেঁকে চাপাতি বানানো হয়।

৯. চাপাতি হলে ডিম ও সবজি ভাজি সহযোগে পরিবেশন করা যায়।

১০. রুটি ও চাপাতি অনেকটা একই রকম, তবে চাপাতি রুটি হতে বড় এবং পাতলা ও নরম হয়। রুটি ছোট ও ভালো করে স্যাঁকা হয়।

সতর্কতা :

১. ময়াদার পানি সতর্কতার সাথে দিতে হবে।

২. চাপাতি বড় করতে গিয়ে ছিঁড়ে যেতে পারে সেদিকে সতর্ক হতে হবে।

১১. সুজি ও নেশেস্তার হালুয়া তৈরি অনুশীলন :

চিত্র : সুজির হালুয়া

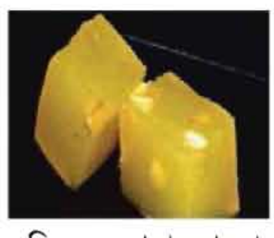

চিত্র : নেশেস্তার হালুয়া

প্রসঙ্গিক তথ্য ঃ গমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচলিত উপাদন হচ্ছে সুজি। ছোট বাচ্চা, কিশোর-কিশোরীদের বাড়ন্ত শরীরের জন্য সুজির বিভিন্ন মিষ্টান্ন খাবার খুবই পুষ্টিকর। সুজিরই একটি উপাদান হচ্ছে নেশেস্তা। অবশ্য গম ও আটা হতেও নেশেস্তা আহরণ করা যায়। সুজি ৬-৭ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিলে যে সাদা মাড়ের মতো দ্রবণ পাওয়া যায় তাহাই নেশেস্তা। গম হতে নেশেস্তা নিতে হলে গম পানিতে ভিজিয়ে প্রত্যেক দিনে পানি বদলাতে হবে। পঞ্চম দিনে গম বেটে দুধ নিতে হবে। গম, আটা বা সুজি হতে যে বিশুদ্ধ শ্বেতসার পাওয়া যায় তাই নেশেস্তা এবং অবশিষ্ট পদার্থ গ্লুটেন বা আমিষ। সুজির হালুয়া ও নেশেস্তার হালুয়া খুবই উপাদেয় এবং পুষ্টিকর। নেশেস্তার হালুয়া দেখতে স্বচ্ছ জেলির ন্যায়। বড় বড় মিষ্টির দোকানে নেশেস্তার হালুয়া বিক্রি হয়। বিশেষ করে নেশেস্তার হালুয়া পরিবেশন করে একটু বৈচিত্র্য আনা যায়।

সুজির হালুয়া তৈরি :

উপকরণ :

১. চিনি	১ কাপ	৫. কিশমিশ	১ কাপ
২. ঘন দুধ	১ কাপ	৬. এলাচ গুঁড়া	আধা কাপ
৩ . ঘি	আধা কাপ	৭. পেস্তা বাদাম	পরিমাণমতো
৪. সুজি	১ কাপ		

সুজির হালুয়া তৈরিতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. একটি কড়াইতে আধা কাপ ঘি ও ১ কাপ সুজি ভালো করে ভাজতে হবে।

২. অন্য পাত্রে চিনি ২ কাপ ও দুধ ১ কাপ ঘন করে জ্বাল দিতে হবে।

৩. দুধ ও চিনির মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে সুজির কড়াইতে ঢেলে দিতে হবে।

৪. ঘন হয়ে আসলে কিসমিস, এলাচ গুঁড়া ও বাদাম দিয়ে নাড়তে হবে।

৫. হালুয়া হয়ে গেলে ঘিয়ে মাখা একটি ডিশে তুলতে হবে। চামচে ঘি মেখে হালুয়ার উপরে সমান করে সাজানো যায়।

৬. ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বেই বরফি করে কেটে দিতে হবে। একে সুজির মোহনভোগও বলে। ঘি-এর পরিবর্তে সয়াবিন তেল দিয়েও রান্না করা যায়।

নেশেস্তার হালুয়া :

উপকরণ :

১. চিনি - ২৫০ গ্রাম ২. সুজি - ১৫০ গ্রাম

৩. ঘি - ১০০ গ্রাম ৪. ফুড কালার - সামান্য

৫. কিশমিশ - পরিমাণমতো ৬. বাদাম - পরিমাণমতো

৭. গোলাপজল - পরিমাণমতো নেশেস্তার হালুয়া তৈরিতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

সুজির হালুয়া তৈরিতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. একটি পাত্রে সুজি এক রাত ডুবো পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২. পরদিন সুজির উপরের পানি ফেলে নতুন পানি নিতে হবে। হাত দিয়ে সুজি কচলে সাদা মাড় বের করতে হবে। পাতলা কাপড় দিয়ে মাড় ছেঁকে নিতে হবে।

৩. সুজির অবশিষ্টাংশ মাড় গ্লুটেন হাতে যতদূর সম্ভব কচলে বের করে নিতে হবে।

৪. সমস্ত সুজির মাড় বা নেশেস্তা একটি বড় পাত্রে নিতে হাবে। এর সাথে ঘি, চিনি, সামান্য ফুড কালার দিয়ে চুলায় দিতে হবে। একটু পর দারুচিনি, এলাচ ও গোলাপজল দিতে হবে।

৫. মিনিট দশেকের মধ্যে নেশেস্তা ঘন হয়ে স্বচ্ছ হালুয়ায় পরিণত হবে। নামানোর পূর্বে কিশমিশ দিতে হবে।

৬. ঘি মাখানো ডিশে হালুয়া তুলে চামচ দিয়ে সমান করতে হবে।

৭. পেস্তা বাদাম কুচি দিয়ে সাজিয়ে বরফি কাটতে হবে।

৮. এরপর পরিবেশন করতে হবে।

৯. হালুয়া রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করলে ৩-৪ দিন রাখা যায়।

১২. ময়দা থেকে ডোনাট তৈরি অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ডোনাট ময়দা থেকে তৈরি এক ধরনের আকর্ষণীয় নাস্তা জাতীয় খাবার। অতিথি আপ্যায়নের জন্য এটি বৈচিত্র্যময় নতুন খাবার। এটি বানানো সহজ এবং ব্যয়বহুল নয়। বিকেলে চা-এর সাথে খেলে খুবই ভালো লাগে।

উপাদান	উপকরণ
১. ইস্ট ড্রাই ১ প্যাকেট	১. ডোনাট কাটার
২. দুধ ১ কাপ	২. পিঁড়ি ও বেলন
৩. ডালডা ১৫০ গ্রাম	৩. চুলা
৪. চিনি আধা কাপ	৪. কড়াই
৫. ময়দা সাড়ে তিন কাপ	৫. হাতওয়ালা লম্বা চামচ
৬. ডিম ১টি	
৭. লবণ ১ টেবিল চামচ	
৮. সয়াবিন তেল পরিমাণমতো	

চিত্র : ডোনাট কাটার

ময়দা থেকে ডোনাট তৈরিতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. মৃদু গরম পানিতে ইস্ট ভিজিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

২. দুধ, ডালডা, চিনি এবং লবণ একটি বড় পাত্রে একসাথে মিশাতে হবে।

৩. ইস্ট ও ডিম মিশাতে হবে। এখন এমনভাবে ময়দা মিশাতে হবে যেন খামির নরম হয়। ১০ মিনিট ভালো করে খামির ডলতে হবে।

৪. এরপর ডালডা মিশানো পাত্রে খামির ঢেকে রাখতে হবে।

৫. ১ ঘণ্টা পর খামির ফুলে উঠলে ২-৩ বার খামির ভালো করে মিশিয়ে আবার ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখতে হবে।

৬. পিঁড়িতে ময়দা ছিটিয়ে খামির ৮ মি.মি. পুরু করে বেলতে হবে। ডোনাট কাটার দিয়ে কেটে আরও ৩০-৪০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে।

৭. ডোনাট ফুলে উঠলে চুলায় ডুবো তেলে ভাজতে হবে।

৮. গরম ডোনাট গুঁড়া চিনি ছিটিয়ে পরিবেশন করা যায়।

৯. ডোনাটের উপকরণে চকলেট দিয়ে চকলেট ডোনাট তৈরি করা যায়।

সতর্কতা : ১. ইস্ট যেন পুরাতন না হয়।
২. খামির ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে যাতে ফুলে ওঠে।

১৩. আখ থেকে রস ও গুড় তৈরি অনুশীলন :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : পানির অপর নাম জীবন। তাই খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে পানি। তবে সব সময় শুধু পানি খেতে হবে তাই নয়। পানীয় হিসেবে অনেক ধরনের খাদ্য রয়েছে। যেমন- ফল ও সবজি, ডাব, তরমুজ, আখ, লাউ ইত্যাদি শাক সবজিও পানির বড় উৎস। এর মধ্যে আখের রস পানীয় হিসেবে খুবই উৎকৃষ্ট। শরীরের রোগ নিরাময়ে এর গুরুত্ব অনেক। বিশেষ করে জন্ডিস রোগে আখের রস খুব উপকারে আসে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা চাকচিক্যময় বিজ্ঞাপনের কারণে

চিত্র : আখের রস নিষ্কাশন যন্ত্র

কৃত্রিম জুসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু এর চাইতে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি ঘরের বানানো লেবুর শরবত, কোয়াশ, ডাবের পানি, আখের শরবত-এর তুলনা নেই।

উপকরণ : ১. বাছাইকৃত পরিপুষ্ট রোগমুক্ত আখ।
২. পরিষ্কার ছাঁকনি।
৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাড়াই যন্ত্র।
৪. রস সংগ্রহের পরিষ্কার পাত্র।
৫. পরিষ্কার গ্লাস।
৬. ট্রে। ৭. মগ।

আখের রস নিষ্কাশন ও পরিবেশনে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. পরিপুষ্ট সতেজ ও রোগ ও ত্রুটিমুক্ত আখ বাছাই করে নিতে হবে।
২. আখ সংগ্রহ করার পরপরই মাড়াই করার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা আখ রোদে ফেলে রাখলে বা দেরিতে মাড়াই করলে রসের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।
৩. আখ ভালো করে পরিষ্কার করে ছিলে নিতে হবে।
৪. ছিলা আখ নিষ্কাশন যন্ত্রেও দুই চলন্ত রোলারের মাঝ দিয়ে প্রবেশ করালে আখ থেকে রস বের হতে নিচে পড়বে। নিচে একটি টিনের প্লেট এমনভাবে বসানো থাকে যাতে সব রস মগের মধ্যে জমে সংগৃহীত হবে।
৫. মাড়াই করার পর রস সংগ্রহ করে পরিষ্কার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তাড়াতাড়ি পরিবেশন করতে হবে।

সতর্কতা : ১. রস হিসেবে খাওয়া আখ পরিপুষ্ট ও নির্দোষ হতে হবে।
২. আখ কাটার পর রোদে ফেলে রাখা যাবে না।
৩. আখের রস বেশি দেরি করে পরিবেশন করলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।
৪. আখের রস গরম স্থানে রাখলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

আখের গুড় তৈরি : প্রাসঙ্গিক তথ্য : আখ হতে চিনি ও গুড় হয়ে থাকে। গ্রামের কৃষকেরা নিজেরাই আখ থেকে অতি সহজেই গুড় তৈরি করে থাকে। চিনি মিলে তৈরি হয়। পুষ্টিমানের দিক দিয়ে গুড় চিনি হতে উন্নত কারণ গুড়ে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ক্যারোটিন অত্যন্ত বেশি যা চিনিতে নেই বললেই চলে। তবে চিনিতে ক্যালরির পরিমাণ গুড় থেকে অনেক বেশি যা আমাদের প্রতিনিয়ত শরীরের ক্ষয়পূরণের জন্য খুবই প্রয়োজন।

চিত্র : প্রস্তুকৃত গুড়ের ব্লক

উপকরণ : ১. সতেজ ও পুরিপুষ্ট আখ।
২. রস পরিষ্কারক (উদ্ভিজ্জাত বা রাসায়নিক)
৩. রস নিষ্কাশন যন্ত্র।
৪. কড়াই
৫. ছাঁকনি
৬. গুড় তৈরির উপযোগী চুলা।
৭. ঘনীভূত সিরাপ ঘষার হাতা।
৮. সিরাপ ঘষার উপযোগী মাটির পাত্র বা তাওয়া।
৯. গুড় ঢালার কাঠের পাত্র বা মাটিতে গর্তে তৈরি করা ফর্মা বা ছাঁচ।

১০. পানি
১১. চামচ
১২. কাপড় বা ন্যাকড়া
১৩. নারিকেল তেল

আখ থাকে গুড় তৈরির জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করলে হবে :

১. প্রথমে মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সতেজ ও পরিপুষ্ট আখ মাড়াই করে রস বের করে নিতে হবে।

২. কাপড়ের সাহায্যে রস ছেঁকে নিলে বাহ্যিক ময়লা পরিষ্কারক হয়।

৩. ছাকার পর এ রস কড়াইতে নিয়ে জ্বাল দিতে হবে।

৪. রসের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য রসের সাথে রস পরিষ্কারক মিশাতে হবে।

৫. রস কড়া জ্বালে জ্বাল দিয়ে ঘন সিরাপের ন্যায় করতে হবে। তবে জ্বাল দেওয়ার সময় মাঝে মাঝেই রসের ময়লা বা গাদ ছেকে উঠাতে হবে। এর ফলে গুড়ের রং পরিষ্কার হবে।

৬. রস জ্বাল দিয়ে ঘন হতে থাকলে প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট ফুট হবে।

৭. রস যখন ঘন সিরাপের ন্যায় হতে থাকবে তখন বড় বড় ফুট হবে।

৮. রস জ্বাল দেয়ার সময় যাতে উতলে পড়তে না পারে সেজন্য কয়েক ফোঁটা নারিকেল তেল ব্যবহার করা যাবে।

৯. রস বা সিরাপ ঘন হয়ে গুড় তৈরির উপযোগী হয়েছে কিনা তা পানিতে ফোঁটা আকারের ঢেলে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

১০. এক ফোঁটা সিরাপ যদি পাত্রের পানির মধ্যে ফেলা হয় যদি তা পাত্রের তলায় বসে যায় বা জমে যায় তাহলে বুঝতে হবে সিরাপ গুড় তৈরির উপযোগী হয়েছে।

১১. সিরাপ ঘন হওয়ার সময় বার বার কড়াইতে নাড়াচাড়া করতে হবে। তা না হলে পাত্রের তলদেশে বা গায়ে সিরাপ পুড়ে লেগে যেতে পারে।

১২. সিরাপ গুড় তৈরির উপযোগী হলে নাড়াচাড়া করে প্রায় ঠাণ্ডা করে নির্দিষ্ট টিনে বা মটকায় ঢালতে হয়। তবে অনেক সময় কড়াই হতে অন্য কোন পাত্রে সিরাপ ঢেলে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ পাত্রে ঢালা হয়।

১৩. এছাড়া গুড় জমিয়ে আকৃতি দিতে হলে ঘন সিরাপ মাটির পাত্রে বা তাওয়ায় নিতে হয়। কাঠের বা লোহার হাতার সাহায্যে তাওয়ায় মণ্ডের মতো তৈরি হবে। এ মণ্ড সম্পূর্ণ সিরাপের সাথে নেড়ে মিশানো হলে সম্পূর্ণ সিরাপ সহজেই জমাট বাঁধবে।

১৪. মাটিতে গর্ত করে চতুর্ভুজাকার, ত্রিভুজাকার বা গোলাকার গর্তের তলদেশে ছাই বা তুষ বিছিয়ে দিয়ে তার উপর কাপড় বিছাতে হবে।

১৫. মণ্ড মিশানো ঘন সিরাপ ও কাপড়ের উপর ঢেলে দিয়ে ঠান্ডা করে নিলে গুড় শক্ত হয়ে কাঙ্খিত আকার ধারণ করবে।

সতর্কতা :

২০২২

১. রস জ্বাল দেয়ার সময় বারবার গাদ ওঠাতে হয়। তা না হলে গুড়ের রং খারাপ হয়।

২. রস বা সিরাপ ঘন ঘন নাড়াচাড়া করতে হয়। অন্যথায় সিরাপ পুড়ে পাত্রের গায়ে লেগে যেতে পারে।

৩. সিরাপ খুব গরম থাকা অবস্থায় পাত্রে ঢালা উচিত নয়।

(গ্রন্থপঞ্জি)

১. এগ্রোবেসড ফুড, ট্রেড-০১ (ভোকেশনাল)- মোঃ মোসারফ হোসেন

২. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ- মোঃ আবদুর রাজ্জাক

৩. সয়াবিন থেকে খাবার তৈরি- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

৪. বাংলাদেশে মুগ ডাল চাষ- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

৫. বাংলাদেশে মাষকলাইয়ের চাষ- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

৬. বাংলাদেশে তেলবীজ ফসলের চাষাবাদ- মানিকলাল দাশ

৭. খাদ্য ও পুষ্টি- দে এবং বসু, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ভারত

৮. বাংলাদেশে খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল- মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস

৯. মাশরুম প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল- মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী, ঢাকা

১০. আখ চাষ প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা- অর্থকরী ফসল, ডিএই

১১. মসলা জাতীয় ফসল- কৃষিবিদ মোসারফ হোসেন

১২. মসলার চাষ- মৃত্যুঞ্জয় রায়

১৩. খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল-বারটান, ঢাকা

১৪. রান্না খাদ্য ও পুষ্টি-অধ্যাপিকা সিদ্দিকা কবীর

১৫. বাংলাদেশে ভুট্টা উৎপাদন ও ব্যবহার- বারি (বি.এ.আর.আই), গাজীপুর

১৬. ভুট্টা মানে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ- মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

১৭. বিধাতার দান আলু-কামাল উদ্দিন আহমেদ ও বেগম মমতাজ কামাল

১৮. বাঙ্গালীর সেরা রান্না-সুবর্ণা চৌধুরী

১৯. নারিকেল উৎপাদন ও ব্যবহার- কৃষিবিদ গিয়াস উদ্দিন

২০. বাংলাদেশের গুদামজাত শস্যের অনিস্টকর কীটপতঙ্গ- মোহাম্মদ হোসেন

২১. গম বীজ ও উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা-বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

২২. কৃষিকথা, কার্তিক-১৪১৬ সংখ্যা

২৩. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ-১ (কৃষি ডিপ্লোমা)- মোঃ মোসারফ হোসেন, হক পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

২৪. খাদ্য রান্না ও স্বাদ রহস্য- এইচ.এম. সোলায়মান

২৫. Oil Seeds in Bangladesh- A.K.Kaul and M. L. Das

(সমাপ্ত)

২০১২

কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেল কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে ৪ লেন বিশিষ্ট সড়ক টানেল। টানেলটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত করবে। এই টানেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। নির্মাণ কাজ শেষ হলে এটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম সুরঙ্গ পথ। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে টানেলটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ, আধুনিকায়ন, শিল্প কারখানার বিকাশ সাধন এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের ফলে কর্ণফুলী টানেল বেকারত্ব দূরীকরণসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

২০২২শিক্ষাবর্ষ

এগ্রোবেসড ফুড-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য